NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

ESO

PAPER 1
MODULES I - IV

ELECTIVE SOCIOLOGY
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৪তম পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক সমাজতত্ত্ব

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
ESO 01 : 01

রচনা
অধ্যাপক পরিমলভূষণ কর

সম্পাদনা
অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তা

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
ESO 01 : 02

ডঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক পরিমলভূষণ কর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
ESO 01 : 03

ডঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ

অধ্যাপক স্বপন প্রামাণিক

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
ESO 01 : 04

অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ দেবযানী দেব

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ESO – 01

সমাজতত্ত্বের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায় 1

একক 1	বিষয়বস্তুর পরিচিতি	7 – 25
একক 2	সমাজতত্ত্ব এবং অন্যান্য সমাজবিদ্যা	26 – 32
একক 3	সমাজতত্ত্বের ক্রমবিকাশ	33 – 45
একক 4	সমাজতত্ত্বের কয়েকটি মৌল বিচার্য বিষয়	46 – 56

পর্যায় 2

একক 5	সামাজিক কাঠামো	57 – 69
একক 6	মর্যাদা ও ভূমিকা	70 – 80
একক 7	সামাজিক স্তরবিন্যাস	81 – 96

পর্যায়
3

একক 8	সংস্কৃতি	97 – 111
একক 9	সংস্কৃতির উপাদানসমূহ	112 – 120
একক 10	সামাজিকীকরণ	121 – 135
একক 11	সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বিচ্যুতি	136 – 149

পর্যায়
4

একক 12	সমাজ এক বিরামহীন প্রক্রিয়া-প্রবাহ	150 – 159
একক 13	সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ	160 – 170
একক 14	সামাজিক গতিময়তা	171 – 184
একক 15	সামাজিক পরিবর্তন	185 – 192

একক ১ □ বিষয়বস্তুর পরিচিতি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা
১.৪ সমাজতত্ত্বের পরিধি
১.৪.১ সমাজ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
১.৪.২ সমাজ সম্পর্কে সংশ্লেষণাত্মক আলোচনা
১.৪.৩ উপরোক্ত আলোচনার সারাংশ
১.৫ সমাজতত্ত্ব পাঠের পদ্ধতি
১.৫.১ ঐতিহাসিক বা অভিব্যক্তিমূলক পদ্ধতি
১.৫.২ তুলনামূলক পদ্ধতি
১.৫.৩ পরিসাংখ্যিক বা গাণিতিক পদ্ধতি
১.৫.৪ সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কার্যনির্বাহী তত্ত্ব
১.৫.৫ উপসংহার
১.৬ সমাজতত্ত্ব কি বিজ্ঞান পদবাচ্য?
১.৭ অনুশীলনী
১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

প্রথম এককের এই অংশ পাঠ করলে আপনি—

- সমাজ বলতে কি বোঝায় সেই সম্বন্ধে একটা ধারা করতে পারবেন।
- সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয় কি সেটা বুঝতে পারবেন।
- অপরাপর সমাজবিদ্যা (Social Science) থেকে সমাজতত্ত্ব কোন্ দিক থেকে স্বতন্ত্র সেটা জানতে পারবেন।
- কি পদ্ধতিতে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন হয়ে থাকে, সেই সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন।
- মূল্যমান-নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সমাজতত্ত্ব কি বিজ্ঞান বলে গণ্য হতে পারে, এই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন।

১.২ প্রস্তাবনা

সব রকম সমাজবিদ্যার মধ্যে সমাজতত্ত্ব হ'ল সবচেয়ে নবীন। সুতরাং স্বতন্ত্র সমাজবিদ্যা হিসেবে সমাজতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। সমাজ বলতে কি বোঝায়, সমাজে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া

বলতে কি বোঝায়, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া অবস্থা বিশেষে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয় এইসব বিষয় সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা এই এককে দেওয়া হয়েছে। সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু বুঝতে হলে সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার প্রকৃতি জানা প্রয়োজন।

সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা আলোচনা করার সময় সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে তবে মনে রাখতে হ'বে, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বলতে মূল বিষয় সম্পর্কে মতপার্থক্য বোঝায় না। সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও প্রকৃতি বুঝতে হ'লে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এই নিয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। সমাজকে বুঝতে হ'লে এই সব ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

সমাজতত্ত্ব অনুশীলনের পদ্ধতি নিয়েও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। সমাজ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য এই মতভেদের প্রধান কারণ। এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই পাঠে আরেকটি বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোন সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণ করার সময় সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ কি ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তুলবেন? অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব কি মূল্যমান-নিরপেক্ষ হবে, না মূল্যমান-নির্দেশক হবে? সমাজতত্ত্ব কি বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় বলে বিবেচিত হতে পারে—এই নিয়ে অতীতে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং এখনও এই আলোচনা চলছে।

১.৩ সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা

মানুষ সামাজিক জীব। সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে পারে না। কেবলমাত্র স্বভাবের তাড়নায় নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও তাকে 'সমাজ' গড়ে তুলতে হয়। 'সমাজ' বলতে নানারকম সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ জালে জড়িত জনসমষ্টিকে বোঝায়। যে কোন সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, সমাজ বসবাসকারী লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। কে কার সঙ্গে কি অবস্থায় কি রকমের আচরণ করবে এটা মোটামুটি নির্ধারিত থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি তার মা-বাবার সঙ্গে যেভাবে আচরণ করেন, তার বন্ধুদের সঙ্গে সেইভাবে করেন না। বয়সের তারতম্যে ব্যবহারে পার্থক্য হয়। অগ্রজের সঙ্গে আচরণ এক রকম, অনুজের সঙ্গে আচরণ অন্য রকম। পেশার দিক থেকেও পার্থক্য হয়। একজন ডাক্তার বা শিক্ষকের কাছ থেকে যে ধরনের আচরণ প্রত্যাশিত, একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঠিক সেই ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করা হয় না। কোন ডাক্তারের আচরণে যদি প্রকাশ পায়, তিনি রোগীর রোগ নিরাময়ের চেয়ে অর্থ উপার্জনে অধিক আগ্রহী, তাহলে সমাজে তিনি ধিক্কৃত হন। লিঙ্গ ভেদেও আচার-আচরণে পার্থক্য হয়। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। তবুও যথেচ্ছ আচরণ করা সমাজের রীতিবিরুদ্ধ। কারণ, যথেচ্ছ আচরণ স্বীকৃত হ'লে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সুতরাং সামাজিক মানুষ বলতে সমাজের নানারকম অনুশাসনের অধীন মানুষকে বোঝায়।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন, সমাজে বসবাসকারী লোকদের অর্থনৈতিক কাজকর্ম অর্থনীতিক আলোচ্য বিষয়। অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্র এবং সরকার সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করে। এইভাবে দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রসমাজে বসবাসকারী লোকদের জীবনযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে। এই কারণে উপরোক্ত শাস্ত্রগুলোকে সাধারণভাবে Social Science বা সমাজবিজ্ঞান বলা হয়। সুতরাং একটা সঙ্গত প্রশ্ন হ'ল ঃ সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত অন্যান্য শাস্ত্র থেকে সমাজতত্ত্ব কোন্ দিক থেকে স্বতন্ত্র?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের সমাজজীবনের একটা দিক বিশেষভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। সমাজস্থ লোকের আচার-আচরণে আমরা দু'টি জিনিস লক্ষ্য করি। প্রথমত, মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের স্বভাবই এমন

যে, সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন করতে পারে না। রবিনসন ক্রুশোর জীবন স্বাভাবিক মানুষের জীবন নয়। নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। সে অপরের সাহচর্য, ভালবাসা ও প্রীতি প্রত্যাশা করে। সুতরাং মানুষ বলতে যূথবদ্ধ মানুষকেই বোঝায়।

দ্বিতীয়ত, মানুষের অধিকাংশ আচরণই পুনঃসঙ্কটনশীল। পুনঃসঙ্কটনশীল বলেই সামাজিক আন্তঃক্রিয়ায় একটা সুনির্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, একজন অপর একজনকে অভিবাদন জানালে দ্বিতীয় জন প্রত্যভিবাদন জানাবে এটাই সমাজস্বীকৃত রীতি। একজন হাত তুলে অপর জনকে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করলে দ্বিতীয় জন সাড়া দেবেন এটাই প্রত্যাশিত আচরণ। সমাজস্থ লোকের আচার-আচরণ বলতে আমরা তাদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়াকেই বুঝি। সমাজের গণ্ডীর বাইরে থাকলে একতরফা কাজকর্ম চলতে পারে। যেমন, রবিনসন ক্রুশো নিঃসঙ্গ অবস্থায় কারোর কাছ থেকে কোন কিছু প্রত্যাশা না করে যেমন খুশি আচরণ করেছেন। সমাজে থাকলে তিনি অপরের দ্বারা প্রভাবিত হতেন এবং তাঁর আচরণ অপরকেও প্রভাবিত করত। অর্থাৎ পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্য। সমাজে লোকদের মধ্যে অবিরাম পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া চলতে থাকে। পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া হরেক রকম রূপ নেয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সমাজে অনেক মানুষকে অপর কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ বা কথাবার্তার ধরন অনুকরণ করতে দেখা যায়। শৈশবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণ, কথা বলার ধরন এবং হাতের লেখা অনুকরণ করতে দেখা যায়। বয়স বাড়লেই অনুকরণ করার প্রবণতা সব ক্ষেত্রে হ্রাস পায় না। যুবক-যুবতীদের মধ্যে চিত্রতারকাদের পোষাক, চাল-চলন, কথা বলার ভঙ্গি অনুকরণ করার ঘটনা বিরল নয়। সব বয়সেই এইরূপ প্রবণতা অল্প-বিস্তর দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের আন্তঃক্রিয়াকে ইংরাজীতে, imitative interaction বলে। আবার অনেক সময় অপরের সম্ভাব্য আচরণ অথবা কোন সম্ভাবনা অনুমান করে নিজেদের আচরণ নির্ণয় করতে দেখা যায়। যেমন, কোন জিনিসের দাম বেড়ে যেতে পারে অনুমান করে সেই জিনিসটি অতিরিক্ত পরিমাণে কেনার অভিজ্ঞতা অনেকের আছে। আবার আমাদের অনেক আচার-আচরণ প্রকৃতি অনুমান-নির্ভর। কে বা কারা কি মনে করবে অথবা কি ধরনের আচরণ করবে সেটা ভেবে নিয়ে আমরা আমাদের কি করণীয় তা ঠিক করি। এই ধরনের আচরণকে anticipatory interaction বলা হয়। আবার অনেক সময় কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বা কারও প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য বিশেষ ধরনের প্রশ্ন বা মন্তব্য করা হয়। সময় বিশেষে একজনকে উসকে দিয়ে সত্যাসত্য নিরূপণের চেষ্টা করার ঘটনাও বিরল নয়। এই ধরনের আচরণকে Provocative interaction বলা হয়। সামাজিক আচরণ বিশ্লেষণ করলে আরও নানারকম আন্তঃক্রিয়া নজরে পড়বে।

এইরূপ আন্তঃক্রিয়া সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কোন জিনিস কিনতে গেলে আমরা বিক্রেতার সঙ্গে দর-কষাকষি করি। ক্রেতা হিসেবে আমরা দাম কমাতে চেষ্টা করি। বিক্রেতা দাম চড়াতে চেষ্টা করে। এইরূপ আন্তঃক্রিয়া অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। কেনাকাটা হয়ে যাবার পর যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পরের কুশল সংবাদ নেন, এইরূপ আন্তঃক্রিয়া সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য। অর্থাৎ নিছক মানুষ হিসেবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বা সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে সেটা হবে সমাজতত্ত্বের উপজীব্য। অনুরূপভাবে, একজন নির্বাচন-প্রার্থী যখন ভোটদাতাদের নিকট ভোট যাচ্‌ঞা করেন, তখন তার সঙ্গে ভোটদাতাদের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেটা হ'ল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এইরূপ আন্তঃক্রিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়। এই দু'টি উদাহরণের প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত অপরাপর শাস্ত্রের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের পার্থক্য সহজেই বোঝা যাবে।

আরেক দিক থেকে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। সমাজতত্ত্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেবল সেই অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে মানবিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক কাজকর্ম যতটুকু সামাজিক আন্তঃক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, সমাজতত্ত্ববিদ কেবল সেই অংশ অনুশীলন

করেন। অর্থনৈতিক সমস্যা তাঁর বিবেচ্য বিষয় নয়। যেমন, শ্রমবিভাগের অর্থনৈতিক দিক তাঁর বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার উপর শ্রমবিভাগ যে ছাপ ফেলে সেটা সমাজতাত্ত্বিকের বিবেচনার বিষয়। অনুরূপভাবে, ধর্মীয় তত্ত্ব, ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়। কিন্তু সমাজ-জীবনের উপর ধর্ম যে প্রভাব বিস্তার করে, সেটা সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের বিষয়। এই দিক থেকে অপরাপর সমাজবিজ্ঞান থেকে সমাজতত্ত্ব স্বতন্ত্র। গোটা সমাজের উপর সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, সমাজের কোন বিশেষ অংশের উপর নয়।

১.৪ সমাজতত্ত্বের পরিধি (Scope)

উপরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে আমরা সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু এবং স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেছি। এই অংশে আমরা সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু ও অনুশীলন পদ্ধতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রথমাবস্থায় সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপকভাবে নির্ণীত হ'ত। সমাজস্থ মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম এবং সবরকম সামাজিক সম্পর্ক সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য করা হ'ত। মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের ইতিহাসও এই আলোচনা থেকে বাদ যেত না। কিন্তু এইরকম ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসর সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। এই কারণে আপত্তি ওঠে যে সমাজতত্ত্ব স্বতন্ত্র সমাজবিদ্যা হিসেবে গণ্য হ'তে পারে না।

এই ধরনের সমালোচনার ফলে দু'দিক থেকে সমাজতত্ত্বের পরিধি নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত, কিছু সংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মতে সমাজ-জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু (conception of sociology as a clearly defined specialism)। দ্বিতীয়ত, কিছু সংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদের মতে, বিভিন্ন সমাজবিদ্যা (যেমন— রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-দর্শন, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি) যে সব বিষয় আলোচনা করে, তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত (conception of sociology as a synthesis of all social sciences)।

১.৪.১ সমাজ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা (Conception of Sociology as a clearly defined specialism)

প্রথমোক্ত মতবাদের (School of Formal Sociology) সমর্থনে নিম্নোক্ত যুক্তি ও ব্যাখ্যা উত্থাপন করা হয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে, সমাজে বসবাসকারীর ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এবং সমাজ-জীবনে বিভিন্ন রকম সম্পর্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

ফার্ডিনেণ্ড টনিজ (Tonics) সমাজস্থ লোকের পারস্পরিক সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুসারে সমাজকে সম্প্রদায় (gemeinschaft or community) এবং সমিতি (gesellschaft of association) এই জাতিরূপে ভাগ করে বিশ্লেষণ করেছেন। যখন কোন জন-সমষ্টি কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত না হয়ে সমাজবদ্ধ জীবনের সার্বিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে একত্র বাস করে, তখন সেই সমাজকে gemeinschaft বা সম্প্রদায় আখ্যা দেওয়া হয়। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ হিসেবে টনিজ পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা গ্রাম-সমাজে প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করেছেন। প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজে জীবনযাত্রা মূলত সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। টনিজের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর

শেষার্ধে য়ুরোপীয় সমাজ ক্রমশঃ gemeinschaft থেকে gesellschaft-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শিল্পযুগীয় সমাজ মূলত সমিতিভিত্তিক। যখন কোন জনসমষ্টি সার্বিক প্রয়োজনের বদলে নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, তখন সেই জন-সমষ্টিকে যৌথভাবে সমিতি আখ্যা দেওয়া হয়।[১]

আরেকজন জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ সিমেলের (Simmel) মতে, সমাজস্থ মানুষের আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করে আন্তঃক্রিয়াগুলোকে বিভিন্ন জাতিরূপে ভাগ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তাঁর বক্তব্য একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তিনি প্রকাশ করেছেন। আমরা আমাদের মনের নানা ভাব ভাষায় প্রকাশ করি। কিন্তু ভাষায় প্রকাশিত বিষয়বস্তু ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নয়। বিষয়বস্তু বিচার না করে বৈয়াকরণ ভাষার গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ করে শব্দ-গঠন, শব্দ-প্রয়োগ সম্পর্কিত নিয়মাবলী আলোচনা করেন। অনুরূপভাবে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তদনুযায়ী বিশেষ বিশেষ আন্তঃক্রিয়া প্রকাশ পায়। যেমন, প্রভুত্ব ও অধীনতা, প্রতিযোগিতা, শ্রমবিভাগ ইত্যাদি নানারকম পারস্পরিক সম্পর্কের প্যাটার্ন বা ফর্ম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, পরিবারে এবং সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। অতএব বৈয়াকরণের ন্যায় সমাজতত্ত্ববিদেরও কাজ হ'ল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করে নানাপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক বা আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ফর্মে বা জাতিরূপে ভাগ করা।[২]

আরও দু'জন জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ আলফ্রেড ফিরকাণ্ড (Alfred Virkand) এবং লিওপোল্ড ফন্ হ্বীজে (Leopold Von Wiese) সামাজিক সম্পর্কের আরও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা এবং আরও জটিল শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

ফিরকাণ্ড সিমেলের চেয়ে আরও সংকীর্ণভাবে সমাজতত্ত্বের পরিধি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের সামাজিক জীবন যে-সব মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভরশীল, সেই বৃত্তিগুলো বিশ্লেষণ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। যেমন, পারস্পরিক সম্পর্ক কয়েকটি মৌল বৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পছন্দ করা বা না করা, বাধ্য থাকা বা অবাধ্য হওয়া, মান্য করা বা অমান্য করার প্রবণতা—এই জাতীয় অনেক মৌল বৃত্তি সামাজিক সম্পর্কের অন্তরালে কাজ করে। এই বৃত্তিগুলো বিশ্লেষণ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তাঁর মতে, সমাজতত্ত্বে ভারতীয় সমাজ বা জাপানী সমাজের একমাত্র তাৎপর্য হ'ল সমাজে বসবাসকারী লোকের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বতন্ত্র উদাহরণ হিসেবে। এই দু'টি সমাজের সমাজ-বন্ধন কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভরশীল অথবা এই দু'টি সমাজের স্থিতি এবং গতি কি ধরনের মানসিকতার উপর নির্ভরশীল— এই জাতীয় বিষয়গুলোই হ'ল সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।[৩]

ডক্টর ফন্ হ্বীজের মতে, সমাজস্থ লোকের পারস্পকি সম্পর্কে দু'টি মৌল ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি সংযোগকারী (associative) এবং অপরটি বিযুক্তকারী (dissociative)। সংযোগকারী ধারার উদাহরণ হ'ল যোগাযোগ স্থাপন, অভিযোজন (accommodation) বা খাপ খাওয়ানো, সমতা আনয়ন করা ইত্যাদি। বিয়োগকারী প্রবণতার উদাহরণ হ'ল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া, বিরুদ্ধাচরণ করা ইত্যাদি। তৃতীয় ধারাটি সংযোগকারী এবং বিযুক্তকারী ধারার সংমিশ্রণ। তিনি সমষ্টি এবং ব্যষ্টির আচার-আচরণ এবং কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করার সময় এই শ্রেণীবিভাগ প্রয়োগ করেন। প্রত্যেকটি ধারাকে তিনি আবার অনেক উপধারায় ভাগ করেছেন। এভাবে তিনি সমাজস্থ মানুষের ৬৫০ প্রকারের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করেন।[৪]

যাঁরা উপরোক্ত উপায়ে সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ দিক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলে মত পোষণ করেন, তাঁদের মতবাদকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, গোটা সমাজকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থহীন হবে। যেমন, অর্থনৈতিক জীবন বাদ দিয়ে প্রতিযোগিতার আলোচনা করা নিরর্থক। আবার, একই ধরনের আন্তঃক্রিয়ার স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। যেমন, পরিবারে অধীনতা বলতে যা বোঝায় রাজনীতিক ক্ষেত্রে বা ধর্মীয়

সম্পর্কে অধীনতা সম্পূর্ণ অন্য অর্থ বহন করে। সুতরাং, সমালোচকদের মতে, বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক না করলে আলোচনা অর্থবহ বা ফলপ্রসূ না হওয়ারই কথা। প্রকৃত সামাজিক পরিবেশ বা অবস্থা উপেক্ষা করে কয়েকটি বিমূর্ত চিন্তা ও ধারণার মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা নিরর্থক হবে। যেমন, সিমেল যেভাবে প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতা আলোচনা করতে চান, সেই আলোচনার বাস্তব মূল্য কতটুকু? শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতা যদি আকৃতি-প্রকৃতিতে পৃথক হয়, তাহলে প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতা সম্পর্কে বিমূর্ত আলোচনা করার মূল্য কি? দ্বিতীয়ত, বিশ্লেষণাত্মক সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে সরোকিন একটি মৌল প্রশ্ন তুলেছেন।[৪] একটি গ্লাস মদ জল বা চিনি যে কোন একটা দিয়ে ভর্তি করা হোক না কেন, গ্লাসের আকৃতি বা ফর্মের কোন পরিবর্তন হবে না। এই ক্ষেত্রে ফর্ম নিয়ে আলোচনা করলে অবাস্তব কিছু হবে না। কিন্তু সামাজিক সম্বন্ধাদির ক্ষেত্রে সমাজ নির্বিশেষে আচার-আচরণের ফর্ম নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন প্রয়াস। মার্কিন সমাজে প্রতিযোগিতা বা অধীনতা যে অর্থ বহন করে, জাপানী সমাজে ঠিক সেই অর্থ বহন করে না। তাহলে সমাজ-নির্বিশেষে পারস্পরিক সম্পর্কের ফর্ম নিয়ে আলোচনা করার অর্থ কি? তৃতীয়ত, সমাজতত্ত্বের সর্বব্যাপী পরিধি (encyclopaedic Scope) নির্ণয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষাত্মক সমাজতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছিল। সরোকিন প্রশ্ন তুলছেন, গোটা সমাজকে উপেক্ষা করে কেবল কয়েকটি নির্বাচিত আন্তঃক্রিয়ার (Social interaction) মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলে কি সে আলোচনা অর্থবহ হবে? বিভিন্ন সমাজবিদ্যা (যেমন—নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি) থেকে তথ্য সংগ্রহ বা বিবেচনা না করে কি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব? এই বিষয়ে সরোকিনের মন্তব্য হল ঃ "The sin of encyclopaedism is as common within the formal sociology as within the nonformal sociology it criticises."

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি, বিশ্লেষণাত্মক সমাজতত্ত্বের প্রবক্তাগণ সমাজতত্ত্বকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে একটি বিষয়ে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজে বসবাসকারী লোকের পারস্পরিক সম্পর্কে এবং আন্তঃক্রিয়ায় এত বেশি বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য রয়েছে যে, সামাজিক সম্বন্ধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা শক্ত। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক আন্তঃক্রিয়াকে কয়েকটি মুখ্য জাতিরূপে (type) ভাগ করলে সামাজিক সম্পর্ক বোঝা এবং বিশ্লেষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।[৫]

১.৪.২ সমাজ সম্পর্কে সংশ্লেষাত্মক আলোচনা (Synthetic approach to Sociology)

এইজন্য অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ সংশ্লেষাত্মক (synthetic) আলোচনা করার পক্ষপাতী। তাঁদের মূল বক্তব্য হ'ল ঃ সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং কাজকর্ম পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও নির্ভরশীল। সমাজ জিনিসটি নিশ্চয়ই জৈব নয়, তবে পুরোপুরি যান্ত্রিকও নয়। নানারকম মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক বন্ধনের দ্বারা সমাজ সংশ্লিষ্ট। সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন শাস্ত্র সমাজ-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা করেন। অর্থনীতিবিদের আলোচ্য বিষয় হ'ল সমাজের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও ঘটনাসমূহ। আবার সমাজ-জীবনের অতীত নিয়ে ইতিহাসের কারবার। সমাজস্থ লোকের সামাজিক কাজকর্মের পেছনে যে মন কাজ করে, এই মনোভূমির অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ মনস্তত্ত্ববিদের উপজীব্য। মানুষের জীবন ও জগৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন ও কৌতূহল। কোন্‌টা প্রেয় এবং কোন্‌টা শ্রেয়, কোন্‌টা উচিত এবং কোন্‌টা অনুচিত, জীবনের লক্ষ্য কি—এই জাতীয় বিষয় দর্শনশাস্ত্রের বিবেচ্য। যেহেতু সমাজ এক এবং অবিভাজ্য সমাজ-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিক পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যা ঘটে, তার প্রতিফলন দেখা যায় সমাজ-জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সমাজ-সম্পর্কিত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। সুতরাং গোটা সমাজকে চোখের সামনে রেখে এই যোগসূত্রগুলি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার জন্য একটি পৃথক শাস্ত্রের

প্রয়োজন রয়েছে। এইরূপ সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করে সমাজের এই সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরা সমাজতত্ত্বের উপজীব্য বলে অনেকে মনে করেন।[১] এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন ডুর্কহাইম (Durkheim) ও হবহাউস (Hobhouse)। এদের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

ডুর্কহাইম সমাজতত্ত্বকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর নাম দিয়েছেন Social Morphology বা সমাজের গঠন-সম্পর্কিত বিদ্যা। দ্বিতীয় ভাগের নাম Social Physiology বা সমাজের শারীরবৃত্ত। তৃতীয় ভাগের নাম General Sociology বা সাধারণ সমাজতত্ত্ব।

পরিবেশ সমাজ জীবনের উপর নানাপ্রকার প্রভাব বিস্তার করে। যেমন— ভৌগোলিক অবস্থান, লোক-সংখ্যার ঘনত্ব, বৃষ্টিপাতের আধিক্য বা স্বল্পতা প্রভৃতি। এইরূপ প্রভাবের প্রকৃতি, ব্যাপকতা এবং গভীরতা বিশ্লেষণ করা Social Morphology বা সমাজের গঠন-সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব।

সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থার (institution) প্রকৃতি এবং উৎস (অর্থাৎ আচার-ব্যবস্থাসমূহ কেন এবং কিভাবে গড়ে উঠল) আলোচনা করা Social Physiology বা সমাজের শারীরবৃত্তের বিবেচ্য। যেমন—ধর্ম, নীতি, আইন বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিক পটভূমিকা নির্দেশ করাই এই ভাগের আলোচ্য বিষয়।

সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থার মধ্যে যে যোগসূত্র বিরাজ করে, তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ General Sociology বা সাধারণ সমাজতত্ত্বের উপজীব্য। ডুর্কহাইম এই প্রকার সংশ্লেষাত্মক আলোচনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করলে সমাজের অখণ্ড রূপ ধরা পড়বে এবং সমাজ সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। সমাজে যা কিছু ঘটে তার এক বা একাধিক সামাজিক কারণ থাকে বলে ডুর্কহাইম মনে করেন। এইসব সামাজিক কারণকে তিনি Social facts বলে আখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, আত্মহত্যা ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, আত্মহত্যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিবিশেষের কাজ। কিন্তু এক বা একাধিক সামাজিক কারণ বা ঘটনা ব্যক্তিবিশেষকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ডুর্কহাইম পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক মন্দা ব্যক্তিগত জীবনে সাংঘাতিক আর্থিক বিপর্যয় টেনে আনে এবং আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি করে।

হবহাউসের লেখায় সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার দার্শনিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতে, মানুষের সামগ্রিক সামাজিক জীবন সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য। অপরাপর সমাজবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক হল পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক উদ্দীপন। ("one of mutual exchange and mutual stimulation") অপরাপর সমাজবিদ্যায় সমাজের বিভিন্ন অংশ নিয়ে যেসব আলোচনা ও গবেষণা হবে, সেসব গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের একত্রীকরণ সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। হবহাউস সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তিনি কোন কৃত্রিম একত্রীকরণের (mechanical juxtaposition) কথা বলছেন না। এক বা একাধিক মৌল ভাবধারা (central conceptions) সমাজকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। এই ভাবধারা সমাজের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করে। সুতরাং সমাজতত্ত্ববিদের যথার্থ কাজ হ'ল এই মৌল ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করা। পৃথক পৃথক অংশের এই ধরনের আলোচনা সমগ্র সমাজকে বোঝার পক্ষে সহায়ক হবে।

১.৪.৩ উপরোক্ত আলোচনার সারাংশ

উপরোক্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদ সমাজ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক আলোচনার সারাংশ দেওয়া হ'ল। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আলোচনার এই দু'টো ধারার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সমাজের বিভিন্ন অংশ এত গভীরভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে, একটি অংশকে অপরাপর অংশ থেকে আলাদা করে পৃথকভাবে আলোচনা করা যায় না। আবার সমাজের বিভিন্ন অংশকে উপেক্ষা করে সমাজের সামগ্রিক রূপ বিশ্লেষণ করাও সম্ভব নয়। সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের গণ্ডী টানবার সময় এই বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন।

উপরে যে আলোচনা করা হ'ল তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্বের পরিধি বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথমত, মানুষের সামাজিক সম্পর্ক যেসব আচার-ব্যবস্থা (institution), সমিতি বা সঙ্ঘে প্রকাশ পেয়েছে, তাদের বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন জাতিরূপে (type) ভাগ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এইভবে ভাগ করলে সামাজিক আন্তঃক্রিয়া সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে। দ্বিতীয়ত, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে যোগসূত্র আছে, সেই যোগসূত্রটি ফুটিয়ে তোলা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। যেমন—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আইনসম্পর্কিত আচার-ব্যবস্থা (institution) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এই কারণে যে কোন একটি ব্যবস্থা অপরাপর ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ সমাজকে একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো বলে ভাবা যায়। বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থাকে এই কাঠামোর অংশ বলে গণ্য করা যায়। বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থা কিভাবে সামাজিক কাঠামোকে ধরে রেখেছে, সেটা বিশ্লেষণ করা সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয়। অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব গোটা সমাজের উপর আলোকসম্পাত করে, কোন বিশেষ অংশের উপর নয়?[৮] তৃতীয়ত, সমাজের স্থিরত্ব (Stability) এবং গতিশীলতা (dynamism) যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, সেইসব বিষয় চিহ্নিত করা সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, সব সমাজেই এই দুটি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। সমাজ যুগপৎ গতিশীল এবং স্থিতিশীল। স্থিতিশীলতা বলতে অচল অনড় অবস্থা বোঝায় না। স্থিতিশীলতা বলতে সুশৃঙ্খল সমাজ বোঝায়। নানা কারণে সুশৃঙ্খল সমাজে পরিবর্তন ঘটে। যেমন, জন্মমৃত্যুর হারের পরিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। তবে ধারাবাহিকতা নষ্ট করে দিয়ে নয়, ধারাবাহিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এরই নাম সমাজের গতিশীলতা। বর্তমান যুগের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে কি কি কারণে সমাজের গতিশীলতা ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত হয়, এই বিষয়টির বিশ্লেষণ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রাধান্য পায়। চতুর্থত, সমাজতত্ত্ববিদ্ ভবিষ্যতের দিকেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। গবেষণামূলক কাজে যে-সব তথ্য সংগৃহীত হয়, তার সাহায্যে সমাজের সম্ভাব্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। কোন সামাজিক সমস্যা দেখা দিলে অথবা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তার প্রতিকারের বিকল্প পন্থাসমূহ বিশ্লেষণ করেন। সমাজতত্ত্ববিদ্ অবশ্য নীতি নির্ধারণ করেন না। তিনি নীতি-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা নীতি-নির্ধারককে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা সরবরাহ করেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেতাবী গজদন্ত ও মিনারে বাস করেন। অথবা বাস্তবতা-বর্জিত বস্তু-নিরপেক্ষ তত্ত্ব উদ্ভাবন করা তাঁর উপজীব্য। বাস্তব ক্ষেত্রে সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ, প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য পরিণতি বিশ্লেষণ করা তাঁর লক্ষ্য।

১.৫ সমাজতত্ত্ব পাঠের পদ্ধতি

সমাজতত্ত্বের পরিধি নিয়ে যেমন সমাজতত্ত্ববিদ্দের মধ্যে মতভেদ আছে, সমাজতত্ত্ব অনুশীলনের পদ্ধতি নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতৈক্য নেই। এই মতভেদের প্রধান কারণ সমাজ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। কেউ কেউ জীববিদ্যার অনুসরণে সমাজের গতি ও প্রকৃতি প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মনে করেন। তাঁরা বিবর্তনবাদের ধারা অনুযায়ী সমাজতত্ত্বের অনুশীলন করার পক্ষপাতী। আবার কেউ কেউ তথ্যের যাথার্থ্য বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করার পক্ষে। কেউ কেউ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার স্পষ্টতা (precision) আনার জন্য গাণিতিক ও পরিসাংখ্যিক পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত বলে মনে করেন। অনেকে আবার জীব-বিজ্ঞানের অনুসরণে সমাজকে জীবদেহের ন্যায় একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো (structure) কল্পনা করে সমাজদেহের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিশ্লেষণ করেন। এই ধরনের চিন্তাকে Structural-Functionalism বা সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কার্যনির্বাহী তত্ত্ব বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এই কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করে প্রত্যেকটি পদ্ধতির মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করব।

১.৫.১ ঐতিহাসিক বা অভিব্যক্তিমূলক পদ্ধতি

কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ্ মনে করেন, মনুষ্য-সমাজ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। এই কারণে সহজ সরল সমাজ ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে অপেক্ষাকৃত জটিল সমাজে পরিণত হয়। তাঁদের মতে, সমাজ বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কোথাও ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়নি। একটি পর্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে। যাঁরা মোটামুটিভাবে এই মতবাদ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে আবার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে।

প্রথমেই অগষ্ট কোঁৎ-এর Law of The Three Stages বা চিন্তার জগতে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তির উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে, প্রথম দিকে মানুষ যাবতীয় ঘটনাবলীর উৎস ঐশ্বরিক শক্তিতে আরোপ করত। এই পর্যায়ে তাঁদের ধারণা ছিল, ঈশ্বরের বিধানে সব কিছু হয়। কালক্রমে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা অধিবিদ্যাগত (Metaphysical) চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। ঈশ্বরের বিধানে সব কিছু হয়, এই চিন্তা পরিত্যক্ত হয়। তার পরিবর্তে বিমূর্ত নীতি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়, এই ধারণা প্রাধান্য পায়। শেষ পর্যন্ত অধিবিদ্যাগত চিন্তা পরিত্যক্ত হয় এবং দৃষ্টবাদমূলক (Positivist) চিন্তা প্রাধান্য পায়। এই পর্যায়ে সামাজিক ঘটনাবলীকে বিষয়গত (objective) উপায়ে বিশ্লেষণ করার উপর জোর দেওয়া হয়। যুক্তির কষ্টিপাথরে সব কিছু যাচাই করা দৃষ্টবাদমূলক চিন্তার বৈশিষ্ট্য। কোঁৎ-এর মতে, এই তিন পর্যায়ে চিন্তার পরিবর্তন সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। দৈবশক্তির প্রাধান্য মেনে নেওয়ার অর্থ হ'ল, সব কিছু তর্কাতীত এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহনির্ভর বলে মেনে নেওয়া। এইরূপ মানসিকতা সামরিক মেজাজবিশিষ্ট রাজতন্ত্রের (militaristic monarchy) পথ সুগম করে। পরবর্তী পর্যায়ে শিল্প-সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। প্রকৃতিদত্ত অধিকার, প্রাকৃতিক আইন প্রভৃতি ধারণার সৃষ্টি হয়। এইরূপ মনোভাবের ফলে সুসংগঠিত এবং আইনসম্মত শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এই পর্যায়কে কোঁৎ legalistic ও formal বলে আখ্যা দিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ে দৃষ্টবাদমূলক চিন্তার প্রভাবে আধুনিক শিল্প-যুগের সূচনা হয়। তাঁর মতে, মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে সব সমাজই এই তিনটি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে।

কার্ল মার্ক্সের মধ্যেও আমরা অভিব্যক্তিমূলক চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁর মতে, উৎপাদন শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদন সম্পর্কের (relatin of production) মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিলে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্ব এক ধরনের সমাজ থেকে অন্য ধরনের সমাজ সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, সমাজের অভিব্যক্তির প্রত্যেকটি পর্যায় পরবর্তী পর্যায়ের অভ্যুদয়ের পথ সুগম করে। সমাজ-বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে মার্ক্স পর্যায়ক্রমে পাঁচ ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠে বলে উল্লেখ করেছেন। পর্যায়গুলো হ'ল ঃ আদিম সাম্যবাদী সমাজ দাসত্ব প্রথার ভেতর দিয়ে সামন্তপ্রথায় পর্যবসিত হয়। সামন্তপ্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ধনতন্ত্রে রূপায়িত হয়। ধনতন্ত্রের মধ্যেই এর ধ্বংসের বীজ উপ্ত থাকায় শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্র লোপ পেয়ে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজে পরিণত হবে। অপরাপর অভিব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে মার্ক্সের মতপার্থক্য আছে। তাঁর মতে, এক পর্যায় দ্বন্দ্বজনিত হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে অন্য পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়।

হবহাউস, ডুর্কহেইম, টনিজ—এঁরা সবাই সমাজের বিবর্তনমূলক পরিবর্তন লেখ করেছেন। হবহাউস প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে সমাজের বিকাশের সঙ্গে সমাজস্থ লোকের মানসিক বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ একটি অপরটির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

সমাজের বিকাশধারা বিশ্লেষণ করে ডুর্কহেইম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, খুব সাধারণ বা নীচু স্তরের বিশেষীকরণ (low degree of specialisation) থেকে সমাজ খুব উঁচু স্তরের বিশেষীকরণ (high degree of specialisation) অর্জন করে। এই ভিত্তিতে তিনি সমাজকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমাবস্থায় যে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম দিয়েছেন যান্ত্রিক সংহতি (mechanical solidarity) এবং পরবর্তী অবস্থায় যে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম দিয়েছেন জৈব সংহতি (organic solidarity)। ডুর্কহেইম্-এর মতে, প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে।

টনিজও সমাজের অভিব্যক্তিমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজ ধীরে ধীরে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (gemeinschaft) থেকে সমিতিপ্রধান (gesellschaft) সমাজ-ব্যবস্থায় পৌঁছেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্যুমনার (Sumner) সব রকম সামাজিক পরিকল্পনা এবং সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন. কারণ, তাঁর মতে এই জাতীয় প্রয়াস সমাজের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির পথে অন্তরায়। এইজন্য তাঁকে Social Darwinist আখ্যা দেওয়া হয়।

বর্তমানকালে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সামাজিক বিবর্তন না অভিব্যক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। কারণ, ক্রমানুযায়ী নির্দিষ্ট পর্যায়ের ভেতর দিয়ে সামাজিক বিবর্তন ঘটে, এই জাতীয় ধারণার কোন সমর্থন পাওয়া যায়নি।

ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সমাজ-বিশ্লেষণের একটি স্বতন্ত্র ধারা আমরা ম্যাক্স হেবার (Max Weber) প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের লেখায় পাই। ম্যাক্স হেবারের মতে, ঐতিহাসিক প্রবাহকে মাত্র একটি সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা নিরর্থক এবং অবাস্তব। বরং উল্লেখ্যযোগ্য সামাজিক ঘটনা বা পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করে কার্য কারণ স্থাপন করা অনেক বেশি মূল্যবান ও সার্থক প্রয়াস। তিনি ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি এবং অর্থনীতির উপর ধর্মের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। ম্যাক্স হেবারের পদ্ধতি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিকাশশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্পায়নের পথে যে সব অন্তরায় উপস্থিত হচ্ছে, সেই অন্তরায়গুলোকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

১.৫.২ তুলনামূলক পদ্ধতি

কি কারণে সমাজতত্ত্বে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, এই বিষয়ে ডুর্কহেইম নিম্নোক্ত যুক্তি দেখিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্যে গবেষণালব্ধ ফলের যাথার্থ্য নানাভাবে যাচাই করা সম্ভব। সংগৃহীত তথ্যকে বিভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষা করে প্রাপ্ত ফলাফল তুলনা করলে নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করা সহজ। কিন্তু সামাজিক বিষয় নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ নেই। এই কারণে পরোক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয়। কোন সামাজিক ঘটনার প্রকৃতি বা কারণ জানতে হ'লে বিভিন্ন সূত্র বা অঞ্চল থেকে বা বিভিন্ন সময় সংগৃহীত তথ্য তুলনা করলে ঘটনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব। যেমন, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মহত্যার আনুপাতিক হার তুলনা করে ডুর্কহেইম আত্মত্যার সামাজিক কারণগুলো নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন, সন্তান-সন্ততি আছে এইরকম বিবাহিত লোকের তুলনায় নিঃসন্তান বিবাহিত লোকের মধ্যে আত্মহত্যার হার আত্মহত্যার হার অপেক্ষাকৃত বেশি। তিনি পরিসংখ্যানের সাহায্যে আরও দেখিয়েছেন, অন্য সময়ের তুলনায় অর্থনৈতিক মন্দার সময় আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পায়। আন্তর্দেশীয় অনুসন্ধানের (cross cultural studies) ফলে মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করলে সমাজ

জীবনের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে ম্যাক্স হেবারের গবেষণা-পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। তিনি ক্যালভিনের ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় এবং চৈনিক ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাঁর মতে, ক্যালভিনের ধর্মমত ও তৎসম্পর্কিত ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান (Practical ethics) অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম য়ুরোপে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের পথ সুগম করেছিল। ক্যালভিনের পূর্ব-বিধানবাদ (doctrine of pre-destination) তাঁর, অনুগামীদের মধ্যে একটি নূতন ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একে তিনি পার্থিব তপশ্চর্য্যা (worldy asceticism) বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই পৃথিবী মানুষের পাপে কলুষিত। কিন্তু তাই বলে এই মলিন পৃথিবী ছেড়ে মাঠে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পাবার উপায় নেই। পাপের সঙ্গে আপস করাও অন্যায়। নিষ্ঠার সঙ্গে পার্থিব কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে এবং নিরলস প্রয়াসের দ্বারা এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলাই প্রকৃত ধর্মীয় কর্তব্য। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, এই পৃথিবীতে সুকাজ করার ফলে মানুষ যে পুণ্য অর্জন করে মোক্ষলাভ করবে তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ, ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত। সুতরাং নিষ্ঠা সহকারে পার্থিব কাজকর্ম করা এবং কঠিন পরিশ্রম করার আদর্শ ধর্মীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, মুক্তি পাবার উপায় হিসেবে নয়। ম্যাক্স হেবারের মতে, ক্যালভিনের ধর্মমত তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এমন একটি মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, যা ধনতন্ত্রের বিকাশ সুগম করে।

তাঁর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে হেবার পোপ-বিরোধী ধর্মবিপ্লবের (Reformation) সময় পশ্চিম য়ুরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে চীন ও ভারতবর্ষের তদানীন্তন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন। এই দু'টি দেশেও পশ্চিম য়ুরোপের মতো ধনতন্ত্র প্রবর্তিত হবার অনুকূল পরিবেশ ছিল। কিন্তু এই দু'টি দেশে ধর্মীয় ভাবাদর্শ ছিল other-worldly। অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় হ'ল পার্থিব সুখ-ভোগ উপেক্ষা করা পৃথিবীতে 'মায়া' বলে গণ্য করা। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশের অনুকূল মানসিকতা এবং মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি।

ম্যাক্স হেবারের চিন্তা অবলম্বন করে পরবর্তীকলে অনেক গবেষা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

ইদানীং যানবাহনের উন্নতি হওয়ায় আন্তর্দেশীয় গবেষণা (cross cultural) পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। এর ফলে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবে। আন্তর্দেশীয় গবেষণার গুরুত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে মরিস্ গিন্স্বার্গ (Morris Ginsberg) বলেন ঃ "as soon as sociology passes from the descriptive to the analytic level, the comparative method is essential alike for genetic connections and for establishing any other mode of casual relationship". তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে কি করে genetic connection বা উদ্ভবসম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, গিন্স্বার্গ তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা যদি জানতে চাই কি করে দাস প্রথা বা ক্রীতদাসের মত দায়বদ্ধ, কৃষকগোষ্ঠীর (Serfdom) উদ্ভব হল, তাহলে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত অনুরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে গেলেও আন্তর্দেশীয় গবেষণা বিশেষ সহায়ক হয়।

তুলনামূলক গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, কেবলমাত্র তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প (hypothesis) যাচাই করা যেতে পারে, কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায় না ("The comparative method alone gives you nothing. Nothing will grow out of the ground unless you put seeds into it. The comparative method is one way of testing hypothesis." Radcliffe Brown)। খুব সুচিন্তিত প্রকল্প না থাকলে সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক পদ্ধতির আরেকটা অসুবিধে হল পার্থক্য বা সাদৃশ্য নির্ধারণ করার জন্য কোন্ কোন্ বিষয় তুলনা করা হবে? গোটা সমাজ নিয়ে ত' তুলনা করা সম্ভব নয়। যেমন, গোটা ভারতীয় সমাজ এবং গোটা ইংরেজ সমাজের মধ্যে কি কোন অর্থবহ তুলনা

চলে? কারণ, সমাজ বলতে একটি ব্যাপক জিনিসকে বোঝায়। কাজেই দুই বা ততোধিক গোটা সমাজের মধ্যে তুলনা করা সাধ্যাতীত। এইজন্য কেউ কেউ প্রস্তাব দেন, দুই বা ততোধিক সমাজের নির্দিষ্ট আচার-ব্যবস্থার (institution) মধ্যে তুলনা করা। কিন্তু এতেও অসুবিধে আছে। সমাজ-জীবনের সঙ্গে আচার-ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গোটা সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আচার-ব্যবস্থার তাৎপর্য বোঝা যায় না। কোন একটি সমাজে বিশেষ প্রয়োজনে এক ধরনের আচার-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। অপর একটি সমাজে প্রয়োজন ভিন্ন হতে পারে এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আচার-ব্যবস্থারও অন্য রূপ হতে পারে। এই অবস্থায় দু'টি সমাজের আচার-ব্যবস্থার তুলনা করলে কোন মূল্যবান বা অর্থবহ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাবে না। সুতরাং আন্তর্দেশীয় বা আন্তঃসামাজিক (cross cultural) অনুসন্ধান চালাতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

১.৫.৩ পরিসাংখ্যিক বা গাণিতিক পদ্ধতি

এই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে জেনে নেওয়া ভালো, সমাজবিদ্যার formal বা বহিরঙ্গমূলক বিশ্লেষণে জার্মান পণ্ডিতগণ যতোটা জোর দিয়েছেন, ফারসী সমাজতাত্ত্বিকগণ ততোটা নয়। বরং তাঁরা ডুর্কহেইমের অনুসরণে সরাসরি সমাজবাস্তবকে চাক্ষুষ দর্শন করে তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। এভাবে সমাজতাত্ত্বিক প্রায়োগিক দিকটি উন্মোচিত হয়। সেই পথ ধরেই সামাজিক অনুসন্ধান পরিচালিত করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করা যায়।

সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। সামাজিক গবেষণা যেভাবে অনুসৃত হয়, তার রূপরেখা বা 'মডেল' হ'ল মোটামুটি এইরূপ ঃ গবেষকের প্রথম ধাপ হ'ল একটি প্রকল্প (hypothesis) গ্রহণ করা। তারপর এই প্রকল্প থেকে তিনি কয়েকটি অনুমিতি (inferences) বের করেন। পরবর্তী ধাপে গবেষক এই অনুমিতিগুলোকে প্রয়োগের দিক থেকে যাচাই (enpirical test) করেন। প্রায়োগিক পরীক্ষায় অনুমিতিগুলো সঠিক বলে বিবেচিত হ'লে, গবেষকের মূল প্রকল্পটি সমর্থিত হল। অপরপক্ষে, অনুমিতিগুলো সঠিক বলে বিবেচিত না হলে মূল প্রকল্পটি খণ্ডিত (refuted) হ'ল বলে ধরে নেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন হ'ল ঃ একজন গবেষক কি উপায়ে প্রকল্প গ্রহণ করেন? কোন্ সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রকল্প তিনি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে গ্রহণ করেন অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমাজের অন্যান্য দিকের সঙ্গে বিবেচনাধীন দিকটির কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করে সাময়িকভাবে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার উপায় হ'ল দুটো।

প্রথমত, সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা। কোন সামাজিক ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় কি ধরনের আচরণ বা ঘটনা পুনঃসঙ্ঘটনশীল বা আবৃত্তিশীল (recurrent)। যদি একই ধরনের আচরণ বা ঘটনা নিয়মিতভাবে বারবার ঘটে বলে লক্ষ্য করা যায়, তখন বুঝতে হবে এক বা একাধিক কারণ এর জন্য দায়ী। এই কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে গবেষকের মনে বিবেচ্য ঘটনা বা আচরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণার (concept) সৃষ্টি হয়। এইভাবে সমাজ ও সামাজিক আচরণ বা ঘটনা সম্পর্কে বিশৃঙ্খল চিন্তা ক্রমশ সুশৃঙ্খল রূপ নেয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একজন গবেষক তরুণদের দুষ্ক্রিয়তার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, যেসব দুষ্ক্রিয়তার ঘটনা তাঁর নজরে এসেছে, তার অধিকাংশ ঘটনা এমন পরিবারে ঘটেছে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব নেই অথবা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি সাময়িকভাবে এই প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন যে, পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল বা সুস্থ না হলে তরুণদের বিপথগামী

হবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকল্প থেকে তিনি এই অনুমিতি বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ হলে তরুণদের বিপথগামী হবার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। পরবর্তী ধাপে গবেষকের কাজ হ'ল, আরও ব্যাপক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপরোক্ত প্রকল্প এবং অনুমিতির যাথার্থ্য যাচাই করা।

সমাজ-বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার দ্বিতীয় উপায় সংশ্লিষ্ট, বিষয় সম্পর্কে গাণিতিক প্রতীকগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা। কোন সামাজিক ঘটনা বা বিষয়ের নানা দিক সম্পর্কে রাশিবিজ্ঞানীগণ পরিসংখ্যানের সাহায্যে নানা রকম তথ্য পরিবেশ করেন। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে গাণিতিক নক্‌সা বা তালিকা তৈরি করা হয়। এই গাণিতিক প্রতীকগুলো সমাজ-বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সাহায্য করে। যেমন, তিন-চার দশকের জন্মহার ও মৃত্যুহারের ভিত্তিতে যখন কোন নক্‌শা বা তালিকা তৈরি করা হয়, সেটা পর্যালোচনা করার ফলে গবেষকের মনে সেই সমাজের লোকসংখ্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। এইরূপ ধারণাকে কেন্দ্র করে নানারকম গবেষণার সূত্রপাত হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, সব রকম সামাজিক বিষয় (যেমন লোকসংখ্যার গতি-প্রকৃতি) প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কোন সামাজিক বিষয় বা ঘটনার ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পথে প্রধান অন্তরায়।

সমাজ-বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার দু'টি উপায়ের উল্লেখ করা হল। তবে যে-কোন পদ্ধতিতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার চেষ্টা করা হোক না কেন, সংবেদনশীল মন না থাকলে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করার শক্তি (empathy বা sympathetic penetration)। অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সাহায্য করে। এই শক্তি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার পক্ষে অপরিহার্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ; যিনি আচার-আচরণ নিরীক্ষণ করেন অথবা যিনি পরিসাংখ্যিক বা গাণিতিক প্রতীক পর্যালোচনা করেন, তাকেও নিজের সত্তা অপরের সত্তায় লীন করে অপরের অভিজ্ঞতা কল্পনায় অনুভব করতে হয়। এটা না করলে সমাজ-বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা মোটেই সম্ভব নয়। সংবেদনশীল মন নিয়ে কোন কিছু পর্যবেক্ষণ করলে অথবা কোন গাণিতিক প্রতীক চোখের সামনে রাখলে নানারকম চিন্তাপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে ধীরে ধীরে বিবেচ্য বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলে মন নিঃসীম অন্ধকারে আলোকবর্তিকার ন্যায় কাজ করে ("the mind of man is a tiny pencl of light exploring the illimitable dark."—Waller)।

সমাজতত্ত্ব অনুশীলন করার পরিসাখ্যিক পদ্ধতি নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, গবেষণার বিষয় ব্যাপক ও বিস্তৃত হলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। সুতরাং পরিসংখ্যানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন, কোন সমাজের লোকসংখ্যার গতি-প্রকৃতি বা বেকার সমস্যার ব্যাপকতা এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হলে পরিসংখ্যানের সাহায্য নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেবলমাত্র পরিসংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন, পাঁচসালা পরিকল্পনার গত চার দশকে আয় এবং ধনবণ্টনে অসমতা হ্রাস পেল কিনা এবং পেলে কি পরিমাণে, এই বিষয়ে ধারণা করতে হলে পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্য কোন উপায়ে এই বিষয়ে আলোকপাত করা অসম্ভব। তৃতীয়ত, পরিসংখ্যান এবং গাণিতিক প্রতীক সমাজবিজ্ঞানীকে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সাহায্য করে। ভৌতবিজ্ঞানীর মত সমাজবিজ্ঞানী তাঁর বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে নানা কারণে নিরপেক্ষ এবং বিষয়মুখ (objective) থাকতে পারেন না। গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে ভৌতবিজ্ঞানীর ভাল লাগা বা না-লাগার প্রশ্ন জড়িত থাকে না। এই কারণে তিনি নির্লিপ্তভাবে গবেষণা করতে পারেন। কিন্তু সামাজিক ঘটনার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীর ভাল লাগা না-লাগার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শৈশবাবস্থা থেকে নানাপ্রকার মূল্যবোধ তার মনে অনুপ্রবেশ করে এবং এর দ্বারা তার মনন এবং চিন্তন গভীরভাবে প্রভাবিত

হয়। সুতরাং সামাজিক বিষয় বিশ্লেষণ করার সময় সম্পূর্ণ অজান্তে মূল্যবোধ তাঁর বিচারকে প্রভাবিত করে। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিসংখ্যানের মাধ্যমে পরিবেশিত হ'লে নিজস্ব ভাল লাগা বা না-লাগার প্রশ্ন অনেকাংশে গৌণ হয়ে পড়ে। এইভাবে বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের পথ সুগম হয়। চতুর্থত, পরিসংখ্যান এবং গাণিতিক প্রতীক আমাদের সমাজ-বিষয়ক ধারণাকে সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করে। যেমন, দাশরথি রায় যখন বলেন "অতিশয় প্রজার ভারে ধরণী হরে শস্য" তখন অত্যধিক লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে আমাদের যে খাদ্যশস্যে ঘাটতি পড়ে, এই বিষয় আমাদের মনে তেমন গভীরভাবে রেখাপাত করে না। কিন্তু যখন বলা হয় যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত স্থলভাগের পরিমাণ সারা পৃথিবীর স্থলভাগের ২.৪ শতাংশ মাত্র, অথচ ভারতবর্ষের সীমিত স্থলভাগে পৃথিবীর ১৫ শতাংশ মানুষ বাস করে, তখন এই দেশে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। সুতরাং সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার স্পষ্টতা আনার জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

পরিসাংখ্যিক পদ্ধতির গুরুত্ব বিবেচনা করার সময় এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

প্রথমত, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যমে একটা বিষয় যতটা অর্থবহ হয়, পরিসংখ্যান বা নির্লেখ (chart) বা সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত তত অর্থবহ হয় না। অর্থবহ হ'তে গেলে পরিসংখ্যান নির্লেখ বা সারণী (table) ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। এই দিক থেকে দেখতে গেলে পরিসংখ্যান প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। সাধারণ ব্যঙ্গচিত্র অর্থবহ নয়। ব্যাখ্যা করে ব্যঙ্গচিত্রে অর্থ আরোপ করতে হয়। আবার দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদ্দেশ্যভেদে ব্যঙ্গচিত্রের ব্যাখ্যার প্রভেদ হয় অনুরূপভাবে, একই পরিসংখ্যান বা সারণী বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। সাধারণত, ব্যাখ্যাকর্তার উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আরোপিত অর্থের পার্থক্য নির্ভর করে। এমনও দেখা যায়, একই পরিসংখ্যানের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পৃথক পৃথক পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়। সুতরাং যে-কোন সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করতে হ'লে ঐ বিষয়-সম্পর্কিত পৃথক পৃথক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করতে হয়। বিশ্লেষণ করার সময় সবরকম পরিসংখ্যানের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গুরুত্ব আরোপ করার তারতম্যের উপর বিষয় সম্পর্কে ধারণারও তারতম্য হয়। যেমন, যে কোন সরকারের শাসনকালে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়েছে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য শাসকদলের তরফ থেকে নানারকম পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়। অপরপক্ষে, বিরোধী দলের তরফ থেকে এইসব পরিসংখ্যানের উপর ভিন্ন গুরুত্ব আরোপ করে সরকারের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ পরিসংখ্যান উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং বিশেষভাবে সতর্ক না থাকলে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

তৃতীয়ত, সমাজ-জীবনের প্রকৃতি এমন যে, সবরকম সামাজিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সবরকম তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। যেমন, কোন সমাজের পারিবারিক জীবন বিশ্লেষণ করার সময় দেখা যাবে, পরিবারের লোকদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক কতটা গভীর অথবা পারিবারিক বন্ধন কতটা সুদৃঢ় এইসব বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত। যে-সব সম্পর্ক নানাপ্রকার আবেগমিশ্রিত, সে-সব সম্পর্কের গুণগত মান কি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে পরিমাপসাধ্য? তাছাড়া, মানুষ কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করে, সেটা পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় না। সংগৃহীত পরিসংখ্যান সমাজ বিষয়ে যে সামগ্রিক চিত্র সবসময় তুলে ধরতে পারে না। এটা মনে রেখে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন।

১.৫.৪ সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ্ সমাজকে পরস্পরনির্ভরশীল অংশের সমবায়ে গঠিত একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো বা সিস্টেম বলে মনে করেন। সেই অনুযায়ী সমাজ এবং সমাজের বিভিন্ন অংশকে বিশ্লেষণ করেন। যাঁরা এই জাতীয় মত পোষণ করেন, তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে।

এই মতবাদে গোটা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থার (institution) পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়। তাঁদের আলোচনায় ব্যক্তি বা সঙ্ঘ বা কোন বিশেষ আচার-ব্যবস্থা স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রাধান্য পায় না। সমাজের অংশ হিসেবেই এদের গুরুত্ব এবং সার্থকতা। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ একটি মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রত্যেক প্রজন্মে (generation) জন্ম এবং মৃত্যুর ফলে সমাজের লোকসংখ্যার আমূল পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কিসের জোরে সমাজ টিকে থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন, সুসংবদ্ধ সমাজ মানুষের প্রয়োজন মেটায়। এটাই হ'ল সমাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট না হওয়ার একমাত্র কারণ। যদি এই প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা সমাজে না থাকত, তাহলে সমাজের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে বিশ্লেষণ করার প্রথম ধাপ হ'ল সমাজস্থ মানুষের প্রয়োজন এবং চাহিদা নির্ণয় করা এবং সমাজে এই চাহিদা মেটাবার কি ব্যবস্থা আছে সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। যেমন, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরিবার এবং পরিবার সম্পর্কিত অনেক রকম আচার-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। অতএব পরিবার সমাজের প্রয়োজন ভালভাবে মেটাতে সমর্থ কিনা, এই বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে দেখা সমাজতত্ত্ববিদের কাজ। এইভাবে প্রত্যেকটি আচার-ব্যবস্থাকে সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

১.৫.৫ উপসংহার

সমাজতত্ত্ব অনুশীলন করার কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হ'ল। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণ বর্জনীয় বলে ভাবার সঙ্গত কারণ নেই। প্রত্যেকটি পদ্ধতিই কোন-না-কোন সময় সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছে এবং গবেষণার নূতন নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কোন কোন সামাজিক বিষয় বিশ্লেষণ কার সময় একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সমাজ-চর্চায় যখন যেমন প্রয়োজন হবে, সেইভাবে পদ্ধতি নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। সমাজতত্ত্বে আদর্শ পদ্ধতি বলে কিছু নেই।

১.৬ সমাজতত্ত্ব কি বিজ্ঞান পদবাচ্য?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদ (positivism) এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাবে সমাজতত্ত্বে মূল্যমান নিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত পেয়েছে। এই আদর্শ অনুযায়ী সমাজতত্ত্বের অন্যতম পথ-নির্দেশক নীতি হল ভাল-মন্দ বা উচিত অনুচিতের প্রশ্নে না গিয়ে সমাজ-বিষয়ে বিষয়গত আলোচনা করা। নিজ নিজ মূল্যবোধ যাতে গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে কোনভাবে প্রভাবিত না করতে পারে, সমাজতত্ত্ববিদ্‌কে এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। মানসিক আবেগ বা চাঞ্চল্য জাগায় এমন বিষয়েরও নিরাবেগ আলোচনা সমাজতত্ত্ববিদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যাঁরা এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁদের মতে, ভাল-মন্দ বা বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের বিচার নীতিশাস্ত্রের বিষয়, সমাজতত্ত্বের নয়। তাঁদের আশঙ্কা, এই ধরনের বিচারে লিপ্ত হ'লে সমাজতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবে। তাঁদের মতে, সামাজিক পরিবর্তনের গতি বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার সময় যথাসম্ভব ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বাঞ্ছিত-

অবাঞ্ছিতের প্রশ্ন এড়িয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার ও বিশ্লেষণের উপর জোর দিতে হবে। এখনও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মোটামুটিভাবে এই মত পোষণ করেন।

আদর্শগতভাবে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করার এই ধারা নিঃসন্দেহে তর্কাতীত। নিরপেক্ষ বিষয়গত বিশ্লেষণ সব দিক থেকে কাম্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই আদর্শ কতটুকু অনুসরণসাধ্য বলা শক্ত। কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, একজন বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু বাহ্যিক। এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর মনন, চিন্তন বা অনুভবের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয় সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে পারেন। একজন সমাজতত্ত্ববিদ্‌ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ "The stars have no sentiments, the atoms no anxieties that have to be taken into account, observation is objective with little effort on the part of the scientist to make it so." অপরপক্ষে, একজন সমাজতত্ত্ববিদ্‌ তাঁর গবেষণার বিষয় সম্পর্কে উদাসীন বা নির্মোহ থাকতে পারেন না। সমাজ-জীবনের সঙ্গে গবেষক ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় তাঁর ভাবাবেগ, তাঁর ভাল লাগা বা না-লাগা অথবা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন গবেষণা-কার্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন গবেষকের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং তাঁর গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্তের মিল থাকা অনেক ক্ষেত্রে নিছক কাকতালীয় ব্যাপার নয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজ-বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা বিধি-শাসিত সমাজে বাস করেন। শৈশবাবস্থা থেকে নানাভাবে তাঁদের সামাজিকীকরণ ঘটে। তাঁদের শেখানো হয় যাতে তাঁরা সামাজিক বিধির অনুগামী হন। দীর্ঘকাল এইভাবে মানুষ হওয়ার ফলে সামাজিক বিধি তাঁদের অস্থিমজ্জায় মিশে যায়। সামাজিকীকরণ সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বিষয়গত (objective) বিচার-বিশ্লেষণের অন্তরায়। একজন বিজ্ঞানীকে এই জাতীয় অসুবিধে ভোগ করতে হয় না।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন, সমাজতত্ত্ববিদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। একজন রাসায়নিক তাঁর বীক্ষণাগারে বারার একই পরীক্ষা চালাতে পারেন। সমাজতত্ত্ববিদের বিষয়বস্তু এমন নয় যে তাঁর গবেষণার মালমশলা বারার সাজিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন। যা ঘটে গিয়েছে সেই বিষয়ে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ ঘটে। কারণ, বারার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তে সত্যতা যাচাই করা যায় না।

চতুর্থত, সমাজতত্ত্ববিদের আরেকটা হ'ল ভাষা নিয়ে মতভেদ। তাঁরা যেসব শব্দ বা বাচ্য ব্যবহার করেন, স্থানকালভেদে সেই শব্দ বা বাচ্যে অর্থ অনেক সময় পাল্টায়। যেমন, অর্থনৈতিক শ্রেণী বলতে মার্ক্স যা বলতে চেয়েছিলেন, শিল্পোন্নত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাক্স হেবার একই শব্দে ভিন্ন অর্থ আরোপ করেছেন। হেবার শ্রেণী বলতে status group বা মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। 'ফিউডাল' ও 'ফিউডালিজম' এক সময় আইনের পরিভাষা ছিল। বর্তমান যুগে এই দু'টো শব্দ একটা বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার দ্যোতক। বিজ্ঞানীর একটা সুবিধে এই যে, ভাষা নিয়ে মতভেদ হয় না। দশ বছর আগে অক্সিজেনের যা অর্থ ছিল, বর্তমান কালেও তাই। তাছাড়া, বিজ্ঞানের আরেকটা সুবিধে (যা সমাজতত্ত্বে নেই), অধিকাংশ আলোচনা গাণিতিক প্রতীকের মাধ্যমে হয়। সুতরাং পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যার বিশেষ অবকাশ নেই।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য বিজ্ঞানীর মত সমাজতত্ত্ববিদ্‌ মূল্যমান-নিরপেক্ষ থেকে বিষয়গত আলোচনা করতে অপারগ। অতএব রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা বা অঙ্কশাস্ত্রের মত সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান বলে বিবেচিত হতে পারে না।

যদিও পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের মত সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান বলে গণ্য হতে পারে না, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, সমাজতত্ত্ববিদ্ যথাসম্ভব মূল্যবোধ বা মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রভাব কাটিয়ে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন। হয়ত সামাজিকীকরণের প্রভাবে এই কাজে পুরোপুরি সফল হন না। তবে সচেতন থাকার ফলে বেশ কিছুটা সাফল্য যে অর্জন করেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হলে কোন উক্তি বা তথ্য সমাজতত্ত্বে গৃহীত হয় না। তৃতীয়ত, সমাজতত্ত্বে সমাজকে বিভিন্ন অংশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভাগ করে বিভিন্ন অংশের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। চতুর্থত, সমাজতত্ত্ববিদ্ সামাজিক ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দেওয়া ছাড়াও কার্যকলাপ সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেষ্টা করেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, সমাজতত্ত্ববিদের অনুসন্ধিৎসা, অনুশীলন-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত। এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের সমগোত্রীয়, কিন্তু বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়।

১.৭ অনুশীলনী

(ক) নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(১) সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বলতে কি বোঝায়? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিন।

(২) মানুষ সামাজিক জীব—এই কথাটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(৩) কি অর্থে সমাজ যুগপৎ স্থিতিশীল এবং গতিশীল?

(খ) নিম্নোক্ত চারটি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন ঃ

(১) সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং পরিধি আলোচনা করুন।

(২) অগষ্ট কোঁৎ-এর অনুসরণে মানুষের চিন্তাধারার ও সমাজের পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তির বিবরণ দিন।

(৩) সমাজতত্ত্বে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করার গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(৪) সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পরিসাংখ্যিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় কি কি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?

(গ) বন্ধনীতে লিখিত শব্দগুলো থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(১) বিজ্ঞানীর মত সমাজতত্ত্ববিদ্ মূল্যমান-নিরপেক্ষ থেকে বিষয়গত আলোচনা করতে—(পারেন, পারেন না।)

(২) —সমাজতত্ত্বকে Social Morphology, Social Physiology এবং General Sociology এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন (হবহাউস, দুর্কহেইম, টনিজ)।

(৩) সমাজের অভিব্যক্তি আলোচনা করতে গিয়ে—gemeinschaft ও gesellschaft এই দুটো বাচ্য ব্যবহার করেন। (ম্যাক্স হেবার, টনিজ, সরোকিন)।

(ঘ) নিম্নোক্ত বাক্যযুগল থেকে সঠিক বাক্যটি বেছে নিন ঃ

(১) সমাজ সম্পর্কে সংশ্লেষাত্মক আলোচনার মূল বক্তব্য হ'ল সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা।

সমাজ সম্পর্কে সংশ্লেষাত্মক আলোচনার মূল বক্তব্য হ'ল সমাজের বিভিন্ন অংশ ও কাজকর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা আলোচনা করে সমাজের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরা।

(২) বিষয় নির্বিশেষে সমাজতাত্ত্বিক বিষয় অনুশীলন করার জন্য যে-কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

সমাজতাত্ত্বিক বিষয় অনুশীলন করার জন্য বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকৃতি অনুযায়ী পদ্ধতি বেছে নিতে হয়।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Alex Inkeles : What is Sociology? Prentice-Hall of India (Pvt.) Ltd., New Delhi, 1965.

(২) T. B. Bottomore : Sociology Unwin University Books, George Allen & Unwin Ltd., London, 1969.

(৩) পরিমল ভূষণ কর : সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, সপ্তম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৫

(৪) Parimal B. Kar : Society : A Study of Social Interaction. Jawahar Publishers & Distributors, 62/2, Ber Sarai (opposite J.N.U. Old Campus), New Delhi 110 016, 1994

১ "Gemeinschaft (community) is old; Gesellschaft (society) is new as a name as well as a phenomenon...wheever urban culture blossoms and bears fruits. Gesellschaft appears as its indispensable organ. The rural people know little of it." Ferdinand Tonnies : Fundamental concepts of sociology. Translated and supplemented by Charles P. Loomis (1940)-pages 37 to 39.

২ "We express our thoughts through language. A grammarian is not concerned with the contents of the language, but with the structural forms of the language through which the contents come to life and become meaningful. Similarly, Social interactions assume various forms. But some forms of behaviour amongst the members of a society toward one another may be identified, such as superiority and subordination, competition and co-operation, division of labour, etc. However, diverse the interests are that give rise to these socialisation, the **forms** in which the interests are realised may yet be identical. We should abstract from human relationships those **forms** of interaction which are common to diverse situations....It was a cardinal principle in simmel's view of sociology that it should not be encyclopaedia, but rather be strictly limited in its scope." G. Duncan Mitckell : A Hundred years of Sociology (1968)-pages 6 & 7.

৩ Vierkandt held that sociology should be concerned, not with actual societies, but with forces which knit the people together in a society. A particular society is of interest to sociologists only as illustrations of particular types of social relationship. What is of deeper interest to them is to try to understand and analyse the mental processes which shape

particular types of social relationships. His purpose was to arrive at basic elements of a social kind. He held that these are found in such social entities as liking, obeying, submitting, etc.—তদেব, পৃষ্ঠা ১১১।

[৪] "Dr. Von Wiese tried to establish sociology as an independent science. According to him there are two fundamental social processes in human society, namely, associative and disassociative. The examples of the former are contact, approach, adaptation, combination and union and those of the latter are competition, opposition and conflict. There is yet a third category—a mixed form sharing both associative and dissociative social processes. He applied this classification not only to groups and collectivities but also to individuals. Each of these social processes, in its turn, is subdivided into many sub-classes which, in their totality, give about 650 forms human relationship.

Sorokin : Contemporary Sociological Theories (1928), page 495.

[৫] It is not fallacious to isolate the 'social form' from its content...and then to state that social forms can remain identical while their members change?...we may fill a glass of wine, water, or sugar without changing its form; but I cannot conceive of a social institution whose 'form' would not change its members, for instance, Americans, were superseded by quite a new and heterogeneous people, e.g., by Chinese or Bushmen?—তাদের পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০০।

[৬] "The multitude of concrete human relationships and the complexity of social processes make it necessary to classify them into a few large classes, with further sub-divisions, in this way preventing us from becoming lost in a wild forest of inter-relations."—তদেব, পৃষ্ঠা ৫০৬।

[৭] "There is the need for a discipline which would focus attention on the 'whole' of society. It purpose then would be to discover how the institutions which make up a society are related to one another in different social systems."—Alex Inkeles : What is Sociology? prentice...Hall of India Edition (1964)—page 14.

[৮] "The basic conception, or directing idea, of Sociology is, therefore, that of **social structure :** the systematic inter-relation of forms of behaviour or action in particular societies. From this follows the sociologist's interest in those aspects of social life which have previously been studied only in a desultory manner, or which had been the object of philosophical reflection rather than empirical enquey : The family and kinship, religion and morals, stratification, urban life...T.D. Bottomore : sociology (1971)—Page 25.

একক ২ □ সমাজতত্ত্ব এবং অন্যান্য সমাজবিদ্যা

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ স্বতন্ত্র সমাজবিদ্যা হিসেবে সমাজতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য
২.৪ সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব
২.৫ সমাজতত্ত্ব ও সমাজ মনোবিদ্যা
২.৬ সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস
২.৭ সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
২.৮ অনুশীলনী
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

প্রথম এককের এই অংশ পাঠ করলে আপনি—

- সমাজতত্ত্বের অভ্যন্তরীণ দিক এবং এই শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।
- সমাজতত্ত্বের বহিঃসীমানা অর্থাৎ অন্যান্য কয়েকটি সমাজবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- এই সম্পর্ক বুঝতে পারলে সমাজতত্ত্বের পরিধি বা আলোচনার গণ্ডী সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিষ্কার হবে।

২.২ প্রস্তাবনা

এই অংশে প্রধানত দু'টি জিনিস তুলে ধরা হয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিকগণ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, প্লেটো এবং এরিষ্টটলের রাজনীতিক চিন্তায় এই আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন সমাজবিদ্যার (Social Science) উদ্ভব হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ কালস্রোতে সমাজের বিবর্তন, গতি ও প্রকৃতি নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের উদ্ভব, সরকারের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক এবং অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক সমস্যা-সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। অর্থনীতিবিদ্ সমাজে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য সমাবেশ করে সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করার বিষয় আলোচনা করেছেন। এইভাবে সমাজের অন্যান্য দিক আলোচনার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি স্বতন্ত্র সমাজবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। সমাজতত্ত্ব এদের মধ্যে অন্যতম ও কনিষ্ঠতম। সুতরাং সমাজতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য এবং অপরাপর সমাজবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক জানা বিশেষ প্রয়োজন। এই অংশে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২.৩ স্বতন্ত্র সমাজদ্যা হিসেবে সমাজতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

পরবর্তী পাঠে আমরা অপরাপর সমাজবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে সমাজতত্ত্বের বহিঃসীমানা নির্দেশ করতে চেষ্টা করব। আলোচ্য পাঠে আমরা সমাজতত্ত্বের অভ্যন্তরীণ দিকে দৃষ্টি দেব এবং এই শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

প্রথমত, সমাজতত্ত্ববিদ্ বিষয়গত (objective) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজে বসবাসকারী লোকদের নানারকম সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন। দর্শনশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রের মত কি বাঞ্ছনীয় বা কি হওয়া উচিত এই নিয়ে সমাজতত্ত্ব বিচার করে না। সমাজের গতিপথ কোন্ দিকে হতে পারে বা সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাব্য পরিণতি কি, এইসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেই সমাজতত্ত্ববিদ্ ক্ষান্ত হন।

দ্বিতীয়ত, সমাজতত্ত্ব একটি প্রায়োগিক শাস্ত্র (empirical discipline)। সামাজিক ঘটনাসমূহকে যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা এই শাস্ত্রের লক্ষ্য। বিমূর্ত বা ভাবপ্রধান অবাস্তব চিন্তা সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় স্থান পায় না।

তৃতীয়ত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র বা অঙ্কশাস্ত্রের মত সমাজতত্ত্বের একটি তাত্ত্বিক শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং স্থপতিবিদ্যা বা কম্পিউটরের মত এটি ব্যবহারিক (applied) শাস্ত্র নয়। সমাজতত্ত্ববিদ্ সমাজ এবং বিভিন্ন রকম সামাজিক আন্তঃক্রিয়াকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করে জ্ঞানভাণ্ডার পরিপুষ্ট করেন। প্রশাসক এবং সমাজসেবীগণ এই সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করে সামাজিক পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করেন। পদার্থবিদ্ বা গণিতবেত্তা সেতু তৈরি করেন না। কিন্তু তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার সেতু নির্মাণ করেন। এই দিক থেকে বিচার করলে সমাজতত্ত্ব পদার্থবিদ্যা বা অঙ্কশাস্ত্রের সমগোত্রীয়।

চতুর্থত, সমাজতত্ত্ব একটি সাধারণ বা সর্বজনীন সমাজবিদ্যা (General Social Science)। বিশে, উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বা নিয়োজিত সমাজবিদ্যা (Special Social Science) নয়। একজন অর্থনীতিবিদ্ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব আন্তঃক্রিয়া ঘটে, তার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কিত আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন। পক্ষান্তরে, সমাজতত্ত্ববিদ্ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাপিয়ে যে মানবিক সম্পর্ক হয়, তার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।

২.৪ সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব

নৃতত্ত্ব বলতে মনুষ্যসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানকে বোঝায়। এই শাস্ত্রের বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology), ভাষাতত্ত্ব (Linguistics), মানুষের শারীকি গঠন ও আকৃতি সম্পর্কিত চর্চা (physical Anthropology), মানুষের জীবন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা (Cultural or Social Anthropology) ইত্যাদি সব বিষয়ই নৃতত্ত্বের বিবেচনার অন্তর্গত। সুতরাং সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের (বিশেষ করে নৃতত্ত্বের শেষোক্ত শাখার) আলোচ্য বিষয় প্রায় অভিন্ন বলা যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে দু'টি শাস্ত্রের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও, বিষয় অনুশীলন করার দিক থেকে পার্থক্য আছে। এই কারণে এই দু'টি শাস্ত্রকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করা হয়। এই পার্থক্যগুলো আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, নৃতত্ত্বের সব শাখার আলোচনা এবং গবেষণা, সাধারণত, অক্ষরপরিচয়হীন আদিম মনুষ্য-সমাজের

মধ্যে আবদ্ধ। অপরপক্ষে, শিক্ষিত ও সুসভ্য সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করা সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের দায়িত্ব। আলোচ্য বিষয়ের এই মৌল পার্থক্য থেকে অন্যান্য পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু অক্ষরপরিচয়হীন আদিম মনুষ্য-সমাজ ভৌগোলিক দিক থেকে আয়তনে অল্প-পরিসর এবং লোকসংখ্যার দিক থেকেও ক্ষুদ্রায়তন, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ (বিশেষ করে social anthropologists বা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ) গোটা সমাজকেই বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। ধর্ম, সামাজিক রীতি নীতি, তুকতাক, মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, বিনোদনের ব্যবস্থা, খেলাধূলা ইত্যাদি কোন কিছুই তাদের বিবেচ্য বিষয়ের বাইরে নয়। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন (Radcliffe-Brown), ম্যালিনওস্‌কি (Malinowski), মার্গারেট মিড্ (Margaret Mead) প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁদের নির্বাচিত আদিম মনুষ্য-সমাজকে তাদের মধ্যে কিছুদিন বাস করে সব দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং গোটা সমাজের ছবি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। অপরপক্ষে, সমাজতত্ত্ববিদের পক্ষে তাঁর আলোচ্য সমাজের সব দিক বিবেচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা যে আধুনিক সুসভ্য সমাজ নিয়ে গবেষণা করেন, সেই সমাজ জনবহুল এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বৃহদায়তন। সুতরাং তাঁরা নির্বাচিত সমাজের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন, শিক্ষা-ব্যবস্থা, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি, আধুনিক সমাজ-জীবন এত জটিল ও ব্যাপক সম্বন্ধজালে জড়িত যে, সমাজতত্ত্ববিদের পক্ষে গোটা সমাজ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, অনুশীলন পদ্ধতিতেও দুই শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে-সমাজ নৃতত্ত্ববিদের আলোচ্য বিষয়, তিনি সেই সমাজে বাস করেন, লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন এবং তদের ধ্যান-ধারা, মূল্যবোধ এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ একজন নৃতত্ত্ববিদ্ প্রত্যক্ষ-পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার কাজ করেন। সুতরাং নৃতত্ত্ববিদের গবেষণা-পদ্ধতিতে Clinicla বা সাক্ষাৎ পরিচয়ভিত্তিক বলে গণ্য করা যায়। অপরপক্ষে, সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক। যে বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণায় রত, সেই বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নমালা তৈরি করে উত্তর সংগ্রহ করেন। এইভাবে প্রাসঙ্গিক সবরকম পরিসংখ্যান একত্রিত করে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অর্থাৎ নৃতত্ত্ববিদ্ ভিতরে থেকে এবং সমাজতত্ত্ববিদ্ বাইরে থেকে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেন। তবে, সমাজতত্ত্ববিদেরাও অনেক সময় ভিতর থেকে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে একটি পরিবর্তনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগে যানবাহনের দ্রুত উন্নতি এবং গণ প্রচার মাধ্যমগুলির সম্প্রসারণের ফলে আদিম অধিবাসীরা সভ্য সমাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংস্পর্শে আসছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে তারা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহে হারাবে। অক্ষরপরিচয়হীন আদিম সমাজ বলে আদৌ কিছু টিকে থাকবে বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের মধ্যে বর্তমানের ভেদরেখা মুছে যাবার সম্ভাবনা আছে। তার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এমন সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, যা কিছুদিন আগেও সমাজতত্ত্বের একান্ত উপজীব্য ছিল। উদাহরণ হিসেবে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণার উল্লেখ করা যায়। তাঁরা সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন। সুতরাং আর কতদিন এই দু'টি শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে বলা কঠিন।

২.৫ সমাজতত্ত্ব ও সমাজ মনোবিদ্যা

মনোবিদ্যা ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে এই নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। এই বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং এমিল ডুর্কহেইম সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন।

মিল্-এর বক্তব্য হ'ল মানুষ যা কিছু করে তার পিছনে তার মন ক্রিয়াশীল। সুতরাং তার সামাজিক সম্পর্ক এবং

সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ভালোভাবে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে হ'লে তার মানসিক বৃত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, মানুষের মনের গতি-প্রকৃতি বিবেচনা না করে সমাজ সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক চর্চা সম্ভব নয়।

অপরপক্ষে, ডুর্কহেইম মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করার বিরোধী। তাঁর মতে, নানারকম সামাজিক ঘটনা মানুষের চিন্তা ও কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। তিনি এইসব সামাজিক ঘটনাকে social fact বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'আত্মহত্যার' বিষয়টি উত্থাপন করেন। নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা ব্যক্তিবিশেষের কাজ। কিন্তু তিনি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, নানা সামাজিক ঘটনা মানুষকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে প্ররোচিত করে। যেমন, ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিলে বা বেকারি বাড়লে আত্মহত্যার হার অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। এটা ঠিক যে, কিছু লোকের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা থাকতে পারে। কিন্তু অনুকূল পরিবেশে এই প্রবণতা হ্রাস পায়। আবার পরিবেশ প্রতিকূল হলে প্রবণতা বাড়ে। এইভাবে তিনি মনোবিদ্যার বিষয় এবং সমাজতত্ত্বের বিষয়ের মধ্যে ভেদরেখা টেনেছেন. সামাজিক ঘটনাকে সামাজিক বিধি (sociological laws) দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, কোন সামাজিক ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলে সেই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে ভুল হবে। ("Whenever a social phenomenon is directly explained by a psychological phenomenon, one can be sure the explanation is invalid", —Durkheim.)।

আজও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে উভয় মতের সমর্থক পাওয়া যাবে। অধিকাংশ সমাজতত্ত্ববিদ্‌ই মধ্যপন্থা গ্রহণ করার পক্ষে। মরিস গিন্‌স্‌বার্গ মনে করেন, কিছু কিছু আচার-আচরণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে সমাজতত্ত্বের সাহায্য নিতে হয়। আবার কিছু কিছু আচার-আচরণ মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ম্যাক্স হেবার বলেন, সামাজিক কাজকর্ম বা ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক কাজকর্ম বা আচার-আচরণের অর্থবহ ব্যাখ্যা পেতে হলে মনস্তাত্ত্বিক দিক উপেক্ষা করা যায় না। এঁদের মতে, সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পরস্পরের পরিপূরক।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, একটি অপরটির পরিপূরক বলে বিবেচিত হ'লেও দু'টি শাস্ত্র নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে মিলেমিশে যাবে না। উভয় শাস্ত্রের বিচরণ ভূমি স্বতন্ত্র। মনোবিদ্যার লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিবিশেষ—তার মনের গতি-প্রকৃতি, মানসিক ধাত এবং নার্ভতন্ত্র (nervous system), তার আশা এবং ভয়, তার মানসিক স্থৈর্য এবং বিচলন। অপরপক্ষে, সমাজতত্ত্বের লক্ষ্যবস্তু সামাজিক আন্তঃক্রিয়া এবং সামাজিক সম্পর্ক, ব্যক্তিবিশেষ নয়। এই কারণে যুদ্ধের ব্যাখ্যা দু'টি শাস্ত্র দু'রকমভাবে করে। একটি ব্যক্তির ভূমিকার উপর জোর দেয় এবং অপরটি সামাজিক ঘটনাবলীকে প্রাধান্য দেয়।

এই প্রসঙ্গে সমাজ-মনোবিদ্যার (social psychology) উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকের মতে, সমাজ-মনোবিদ্যা সমাজতত্ত্ব এবং মনোবিদ্যার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। যদিও সমাজ-মনোবিদ্যার মুখ্য লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তি, কিন্তু সমাজ-মনোবিদ্যা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। সামাজিক পরিবেশ কিভাবে ব্যক্তির কাজকর্ম ও আচার-আচরণ প্রভাবিত করে, এই বিষয়টি সমাজ-মনোবিদ্যার উপজীব্য। সুতরাং সমাজ-মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই দু'টি শাস্ত্রের গবেষণা পরস্পরের পরিপূরক এবং এবং একটির গবেষণালব্ধ ফল অপরটিকে সমৃদ্ধ করে।

২.৬ সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস

ইতিহাস-চর্চার তিনটি দিক আছে। প্রথমটি বর্ণনাত্মক। ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দেন। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হন না। অনেক সময় তিনি ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। কেন এবং

কিভাবে ঘটনাটি ঘটল, এই হ'ল তার আলোচ্য বিষয়। তৃতীয়ত, ঘটনাটির কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশ করার পরই তাঁর কাজ নিঃশেষ হয়ে যায় না। ঘটনাটি ভবিষ্যতে পরিণতির কি নির্দেশ দেয়, তা-ও তাঁর আলোচনার বিষয়। সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ইতিহাস-চর্চার উপরোক্ত তিনটি দিককেই সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। অতীতের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হন। ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দিতে গেলে ঘটনার সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের আবেগ, অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়ারও উল্লেখ করতে হয়। কি পরিবেশে ঘটনা ঘটেছিল তার আভাস বর্ণনায় থাকা প্রয়োজন। এক সময় ঐতিহাসিকগণ ঘটনা সম্পর্কে কেবলমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বলা হত, প্রতিভাধর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনীই হ'ল ইতিহাস ('history is the biography of great men')। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিভাধর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও যে বিশেষ সামাজিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হন, এই দিকটি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ফুটে ওঠে। এই কারণে, বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ প্রাসঙ্গিক সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার বর্ণনা দেন। না হলে ঘটনা সম্পূর্ণ অর্থবহ হয় না।

অতীতের ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার সময় ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিককে প্রভূত সাহায্য করে। যেমন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল, সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্স হেবার এই বিপ্লবের কারণ বিশ্লেষণ করে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্ভব যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, পরবর্তীকালের ইতিহাস-চর্চা এর দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। ম্যাক্স হেবার পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ব্যবহারিক নীতিবোধ (practical ethics) অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ম্যাক্স হেবারের অনুসৃত গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অতীত কিভাবে বর্তমান রূপান্তরিত হ'ল, এই বিষয়টি চর্চা করতে হ'লে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এই দু'টি শাস্ত্রের যোগাযোগ আলোচনা করা যায়। ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব (Historical Sociology) বলে সমাজতত্ত্ব-চর্চার একটি ধারা আছে। যাঁরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। ম্যাক্স হেবারের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনা ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত। ঐতিহাসিকগণ যেসব ঐতিহাসিক সামাজিক ইতিহাস লেখেন, তাঁরা সমাজতত্ত্বের মৌল ধারণা (concept) ও পদ্ধতির সাহায্য নেন। ফলে, তাঁদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। সামাজিক ইতিহাস রচনা করার সময় তাঁরা সমাজতত্ত্ববিদের মত সামাজিক সম্পর্ক, সমাজের গঠন, শ্রেণীবিন্যাস, প্রচলিত আচার-ব্যবস্থা, প্রথাগত অনুশাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চর্চা করেন।

উপসংহারে বলা যায়, এই দু'টি শাস্ত্রের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র যত বেশি প্রসারিত হবে, ততই উভয় শাস্ত্রের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হবে। সমাজতত্ত্ব যত বেশি ইতিহাস-ঘেঁষা হবে এবং ইতিহাস যত বেশি সমাজতত্ত্ব-ঘেঁষা হবে, উভয় শাস্ত্র ততই পরস্পরের অবদানে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হবে।

২.৭ সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা। এই বিষয়গুলোকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নানারকম তত্ত্বগত আলোচনা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি। সরকার ও সরকারকে কেন্দ্র করে নানারকম সমস্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাবে। প্রথমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজস্থ মানুষের কেবলমাত্র রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। অপরপক্ষে, সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় অনেক বেশি ব্যাপক। সমাজে লোকদের মধ্যে যে সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ঘটে, সেই আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করা সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ সমাজতত্ত্বে সমাজ-জীবনের সব দিকই আলোচনার অন্তর্গত। দ্বিতীয়ত, সরকারের গঠন ও সরকারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপজীব্য। অপরপক্ষে, সমাজতত্ত্বে সমাজে প্রচলিত অনেক রকমের আচার-ব্যবস্থার মধ্যে (যেমন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, পরিবার ইত্যাদি) সরকারকে অন্যতম আচার-ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হয় এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার করা হয়। অর্থাৎ সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিধি অপেক্ষাকৃত অনেক ব্যাপক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঐতিহ্য, জনসাধারণের মূল্যবোধ এবং ধ্যানধারণা বিবেচনা না করে কেবলমাত্র সাংবিধানিক ব্যবস্থা (constigtutional system) এবং আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখলে সত্যিকারের অর্থবহ সিদ্ধান্তে আসা আদৌ সম্ভব কিনা। মানুষ যা ভাবে এবং বিশ্বাস করে, তাই প্রতিফলিত হয় তার রাজনৈতিক কাজকর্মে। কোন দেশের সংবিধান এবং শাসনব্যবস্থা বুঝতে হলে সংবিধান রচয়িতাদের আদর্শ, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যা বুঝতে হবে। সংবিধান কেবলমাত্র কয়েকটি ধারা-উপধারার সমষ্টি নয়। দেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাস, দেশের সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় এবং জনগণের স্বপ্ন সংবিধান এবং বিভিন্ন আইনে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বৃহত্তম সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করলে আসলকে উপেক্ষা করে ছায়াকে অনুসরণ করা হবে ("the shadow rather than the substance of politics")।

এই কারণে সাম্প্রতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আচরণবাদ (behaviourism) প্রাধান্য পেয়েছে। আচরণবাদের মূল বক্তব্য হল কেবলমাত্র শাসনব্যবস্থার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, মনোভাব এবং রাজনৈতিক আচরণের উপর আলোকপাত করা। মানুষের রাজনৈতিক আচার উপেক্ষা করে শাসনব্যবস্থা বা আইনের ব্যাখ্যা করলে সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতে পারে না। অর্থাৎ ইদানীং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনৈতিক কাঠামোর বাহ্যিক আকারগত (formal political system) বিশ্লেষণ ছাড়াও প্রকৃতিগত বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। তাছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে Political Sociology নামে একটি নূতন শাখা গড়ে উঠেছে। এই শাখার বিষয়বস্তু ও গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে সমাজতত্ত্বের বিশেষ পার্থক্য নেই বললেই হয়। এইভাবে সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

তবে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, এইরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব কোন শাস্ত্রই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাবে না। সমাজতত্ত্ব মূলত সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবে। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক কাঠামো বাহ্যিক আকারগত বিশ্লেষণ ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগ সম্পর্কিত নানারকমের সমস্যা এবং নানাজাতীয় রাজনৈতিক আদর্শের চর্চা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একান্ত আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য হবে।

২.৮ অনুশীলনী

(ক) নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(১) নৃতত্ত্ববিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদের অনুশীলন-পদ্ধতির পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(২) মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ডুর্কহেইম্-এর মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) সংবিধানকে কি কেবলমাত্র কয়েকটি ধারা-উপধারার সমষ্টি বলে গণ্য করা যায়? সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করুন।

(খ) নিম্নোক্ত দু'টি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন ঃ

(১) সমাজশাস্ত্র হিসেবে সমাজতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করুন।

(২) ইতিহাস-চর্চার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(গ) বন্ধনীতে লিখিত শব্দগুলো থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(১) সমাজতত্ত্ব একটি ব্যবহারিক শাস্ত্র হিসেবে গণ্য হাতে— (পারে, পারে না)।

(২) অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে ভেদরেখা সম্পূর্ণ বিলীন হবার সম্ভাবনা— (আছে, নেই)।

(৩) — মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করার বিরোধী (গিন্‌স্‌বার্গ, ডুর্কহেইম)।

(ঘ) নিম্নোক্ত বাক্যযুগল থেকে সঠিক বাক্যটি বেছে নিন ঃ

(১) সমাজ-মনোবিদ্যা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে।
সামাজিক পরিবেশ কিভাবে ব্যক্তির কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার প্রভাবিত করে, এই বিষয়টি সমাজ-মনোবিদ্যার উপজীব্য।

(২) ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের বিচরণভূমি স্বতন্ত্র। কাজেই এই দুই বিদ্যার মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকতে পারে না।
ইতিহাস-চর্চা ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কারণ, উভয় শাস্ত্রই সমাজস্থ মানুষের জীবন-প্রণালী নিয়ে আলোচনা করে—অনেক সময় একই দৃষ্টিকোণ থেকে, আবার অনেক সময় ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) T. B. Bottomore : Sociology Unwin University Books, George Allen & Unwin Ltd., London 1969.

(২) পরিমল ভূষণ কর : সমাজতত্ত্ব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, সপ্তম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

একক ৩ □ সমাজতত্ত্বের ক্রমবিকাশ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ শিল্প-বিপ্লব
৩.৪ ফরাসী বিপ্লব
৩.৫ **The Enlightenment**-এর যুগ ও যুগ-ভাবনা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন
৩.৫.১ মার্কিন চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সমাজসেবীদের অবদান
৩.৬ ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার সূচনা ও বিকাশ
৩.৬.১ প্রথম পর্যায়
৩.৬.২ দ্বিতীয় পর্যায়
৩.৬.৩ তৃতীয় পর্যায়
৩.৭ অনুশীলনী
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

প্রথম এককের এই অংশ পাঠ করলে আপনি—

- স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সমাজতত্ত্বের আত্মপ্রকাশ বিষয়ে ধারণা করতে পারবেন।
- সমাজতত্ত্বের অভ্যুদয়ে শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা জানতে পারবেন।
- ফরাসী বিপ্লব কিভাবে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমাজ-সচেতন করে তোলে এবং সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত করে, এই বিষয়ে ধারণা করতে পারবেন।
- শিল্প-বিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লবের ফলে চিন্তার জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তার প্রভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা কিভাবে সমৃদ্ধ হয়, এই বিষয়ে ধারণা করতে পারবেন।
- ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনার আভাস পাবেন।

৩.২ প্রস্তাবনা

আমরা আগেই জেনেছি যে, সবরকম সমাজবিদ্যার মধ্যে সমাজতত্ত্ব অনতম ও কনিষ্ঠতম। আমরা আরও জেনেছি যে, সমাজতত্ত্বে বিষয়বস্তু কি এবং এর স্বাতন্ত্র কোথায় এইসব প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিতর্ক অতীতে হয়েছে এবং বর্তমান কালেও চলছে। সমাজতত্ত্বের স্বরূপ ভালভাবে জানতে হলে সমাজতত্ত্ব কিভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, এই বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার। আলোচ্য পাঠে এই দিকে আলোকপাত করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল নানা ধরনের সামাজিক আন্তঃক্রিয়া এবং সামাজিক সম্পর্ক। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা গড়ে উঠেছে। এই ধরনের চিন্তা ও আলোচনার সূত্রপাত হয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। অগষ্ট কোঁৎ (August Comte, ১৭৯৮-১৮৫৭) নামক একজন ফরাসী দার্শনিক 'সোসিওলজি' নাম দিয়ে এই শাস্ত্রের সূচনা করেন। একটি ল্যাটিন ও একটি গ্রীক শব্দ জুড়ে দিয়ে তিনি 'সোসিওলজি' শব্দটি ব্যবহার করেন। ল্যাটিন Sociatus শব্দের অর্থ সহযোগী বা সঙ্গী। গ্রীক logos শব্দের অর্থ আলাপ-আলোচনা। সুতরাং সহযোগী বা সঙ্গী সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, সেই শাস্ত্রের নাম 'সোসিওলজি' বা সমাজতত্ত্ব। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিবিধ সম্বন্ধজাল স্থাপিত হয়। সেই সম্বন্ধজালের বিশ্লেষণ করার তাগিদ থেকে এই নবতম সমাজশাস্ত্রের সূত্রপাত। এই তাগিদ কেন বা কিভাবে এল, তা এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

সভ্যতার ঊষাকাল থেকে যূথবদ্ধ মানুষ একত্র থাকার সুযোগ-সুবিধে এবং সমস্যা নিয়ে ভেবেছে। সমাজ-জীবনে অর্থবহ করার নানা উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এইভাবে বিভিন্ন সমাজবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। প্রথম দিকে জন্ম নিল 'দর্শন' শাস্ত্র। মানুষের সবরকম চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দর্শনের বিচার্য বিষয় ছিল। আস্তে আস্তে সমাজজীবনে যত জটিল হতে থাকল, দেখা গেল দার্শনিক বিচারে সবরকম সমস্যার মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নানা সমাজবিজ্ঞান গড়ে উঠল। সব শেষে আত্মপ্রকাশ করল সমাজতত্ত্ব। সমাজতত্ত্বের অভ্যুদয়ের কাহিনী পরবর্তী তিনটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৩ শিল্প-বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিম য়ুরোপে কয়েকটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। এইসব পরিবর্তন সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষ সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের চিন্তাজগতেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

সর্বাগ্রে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের উল্লেখ করতে হয়। শিল্প-বিপ্লব কেবল উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূচনা করেনি। সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনেরও সূচনা করে। কয়েকটি সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-মালিক বিরোধের সূত্রপাত হয়। প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজে এইরূপ বিরোধ প্রায় ছিল না বললেই হয়। শিল্প প্রসারলাভ করার ফলে এই বিরোধ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

শিল্প সম্প্রসারণের ফলে কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রশ্ন ওঠে। শ্রমিকদের বাসস্থানের সমস্যাও দেখা দেয়।

তাছাড়া, এদিকে প্রাক্-শিল্পযুগীয় শান্ত এবং স্বয়ম্ভর গ্রাম-সমাজের অবক্ষয় ঘটতে থাকে। অপরদিকে ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চলের উদ্ভব এবং প্রসার যুগপৎ চলতে থাকে। জনসাধারণ হঠাৎ এমন সব সমস্যা ও অবস্থার মুখোমুখি হ'ল, যা তাদের পূর্বপুরুষদের আমলে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। এইসব সমস্যা ও যুগান্তকারী পরিবর্তন মানুষের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

কি উপায়ে এই সব সমস্যার সমাধান করা যায় এই নিয়ে চিন্তা এবং নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে সমাজের নানা ক্ষেত্রে সামাজিক সমীক্ষা (social survey) চালানোর চেষ্টা করা হয়। সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য ঘটতে থাকে। চির পরিচিত সমাজ হঠাৎ নানা দিক থেকে পরিবর্তিত হতে থাকে। এইসব সমস্যা ও পরিবর্তন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তোলে। তাঁরা সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করতে উদ্যোগী হন। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করার পথে এটাই প্রথম উল্লেখযোগ্য ধাপ।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে য়ুরোপীয় নাবিকগণ দলে দলে দেশ-দেশান্তরে যেতে আরম্ভ করে। বিদেশ থেকে তারা বাণিজ্য-সম্ভার ছাড়াও

বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে আসত। এইভাবে নাবিকদের মারফৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত সমাজের স্বতন্ত্র আদব-কায়দা, আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গে য়ুরোপীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ও সাধারণ লোকের পরিচয় হতে থাকে। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বিচিত্র জীবনযাত্রার পরিচয় পেয়ে সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে তাদের মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে। বর্বর অবস্থা থেকে সমাজ কিভাবে ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজে পরিণত হয়, এই বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে তাঁরা সচেষ্ট হন। সমাজের অভিব্যক্তি অনুসরণ করতে গিয়ে যেখানে ধারাবাহিকতা নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি, সেখানে ঐতিহাসিকগণ অনুমানের উপর নির্ভর করে ধারাবাহিকতা টানতে চেষ্টা করেছেন। এই অনুমানের ভিত্তি ছিল মানুষের স্বাভাবিক আচরণ-বিধি। কোন বিশেষ অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক আচরণ বা প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, এটা অনুমান করে ইতিহাসের অজ্ঞাত অংশসমূহের উপর আলোকসম্পাত করার চেষ্ট করেছেন। এই ধরনের অনুমান-নির্ভর ইতিহাস-চর্চা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথমত, সমাজের বিবর্তন ও প্রগতির ধারণা পরবর্তীকালের সমাজচিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, নূতন ধারায় ইতিহাস-চর্চার ফলে গবেষকদের সমাজের অখণ্ড রূপটি চিনে নিতে সাহায্য করল। সমাজ বলতে যে কেবলমাত্র রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সংগঠন বোঝায় না। এই ধারণা গড়ে ওঠে। সমাজ যে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং আরও ব্যাপক, এই ধারণা পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সমাজতত্ত্বের অভ্যুদয়ের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হ'ল, তাতে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, শিল্প-বিপ্লবের ফলে সামাজিক পরিবেশে আমূল পরিবর্তন ঘটে। নিত্য-নূতন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। এই কারণে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। মানুষকে প্রতিকারের পথ খুঁজতে প্ররোচিত করে। দ্বিতীয়ত, বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনা সমাজতত্ত্বকে স্বাতন্ত্র্য দিতে সাহায্য করে।

৩.৪ ফরাসী বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজে আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিকে শ্রমিকদের শোষণ, অপরদিকে মালিকদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন। একদিকে প্রাচুর্য এবং অপরদিকে দারিদ্র্য পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকে। এইসব সমস্যা ও পরিবর্তন মানুষের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তারা ভাবতে থাকে এইসব সমস্যার মোকাবিলা কিভাবে করা যায়।

এই কারণে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম জোয়ারের মুখেই নানারকম রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে। নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ার গুঞ্জন ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকল। চিন্তার জগতে এই আলোড়ন পরিণতি লাভ করে ফরাসী বিপ্লবে। ফরাসী বিপ্লব স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ ঘোষণা করে। এই ঘোষণাকে চিন্তার জগতে একটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বললে অত্যুক্তি হয় না। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে-সব সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়, ফরাসী বিপ্লবে উচ্চারিত আদর্শের অনুপ্রেরণায় সেইসব সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী বিপ্লবের আগে দারিদ্র্যকে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের কপালের ফের বলে গণ্য করা হত। মুখ বুজে মানুষকে দারিদ্র্যের সঙ্গে আপস করে চলতে হ'ত। ভগবানের আশীর্বাদ এবং অহৈতুকী কৃপা দারিদ্র্য মোচনের একমাত্র উপায় বলে ভাবা হ'ত। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ফলে মানুষের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। দারিদ্র্য সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের কপালের ফের না ভেবে দারিদ্র্যকে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে স্বীকার করা হয়। কিভাবে এই সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যায়, এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং নানাপ্রকার পরীক্ষা-

নিরীক্ষা শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে অনেক রকম সামাজিক সমীক্ষা চালানো হয়। এইভাবে সমাজ ও সামাজিক বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবেষণার শুরু। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা বিকাশলাভ করার পথে এটি হ'ল উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ধাপ।

৩.৫ The Enlightenment-এর যুগ ও যুগ-ভাবনা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপে একটি নূতন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। চিন্তার জগতে এই যুগ Enlightenment নামে পরিচিত। কারণ, যাঁরা এই যুগের চিন্তার ধারক ও বাহক ছিলেন, তাঁরা নিজেদের বিগত যুগের চিন্তানায়কদের তুলনায় অনেক বেশি আলোকপ্রাপ্ত ও অগ্রসর বলে গণ্য করতেন। তাঁরা সমকালীন যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও যুক্তির সাহায্যে মানুষের আচার-আচরণ ও কাজকর্মকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা কোন কিছুকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ না করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার উপর জোর দেন। পূর্ববর্তী যুগের আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও ধর্মের অনুশাসনও তাঁদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। একমাত্র যুক্তিনির্ভর এবং যুক্তিসিদ্ধ সত্যকেই তাঁরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। অতিপ্রাকৃত উপায়ে লব্ধ জ্ঞান বা প্রত্যাদেশ অথবা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত কোন বিশ্বাস বা আচারকে সত্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, সত্যকে যাচাই করার কষ্টিপাথর হ'ল যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ।

এই যুগের চিন্তানায়করা এইরূপ ভাবধারার অনুসরণে সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে যেমন বর্তমান অবস্থা ছাড়া তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা জন্মে, সেইভাবে তাঁরা তখনকার সমাজের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা নির্দেশ করতে চেষ্টা করেন।

তাঁরা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। কারণ, তাঁদের মতে তখনকার বাস্তব অবস্থায় সমাজস্থ লোকের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। কুসংস্কার, নানা বিষয়ে গোড়ামি ও অসহিষ্ণু মনোভাবে জনমানসের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখে। সুতরাং এই যুগের চিন্তানায়করা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজস্থ লোকের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করার উপায় নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেন।

বিশ্বময় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রাকৃতিক জগতে যেমন কয়েকটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম আছে, মনুষ্য-সমাজেও এই ধরনের নিয়ম আছে বলে এই যুগের চিন্তানায়কদের ধারণা ছিল। যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের সাহায্যে এইসব নিয়মের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথা, নানাপ্রকার কু-সংস্কার প্রভাবিত চিন্তা এবং জীবন-দর্শনকে তাঁরা তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁদের ভাবনায় কেবলমাত্র যুক্তি-নির্ভর উপায়ে সমাজকে গঠন করতে চেষ্টা করলে সমাজস্থ লোকেরা পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ লাভ করবে।

সনাতন চিন্তাধারায় যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা এই ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে নানাভাবে এবং নানা দিক থেকে বাধা দিতে উদ্যোগী হন। এই অবস্থায় প্রগতিবাদীদের চেষ্টা হল রাষ্ট্রনীতি ধর্ম এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটা উদার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রয়োজন।

এই তাগিদ থেকে জার্মানীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রাশিয়া এবং অন্যত্র অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হ'ল। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। পরবর্তী ধাপে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। কেবল তাই নয়, উচ্চ-শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচীরও পরিবর্তন হতে থাকে। আগে গির্জায় পদ লাভ করার জন্য প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিতে আসতেন। সুতরাং পাঠ্যসূচীও এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য তৈরি হ'ত। কিন্তু

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ১৭৮০ সাল থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে দর্শনের পাঠ্যসূচিতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে। আগে দর্শনের পাঠ্যসূচীতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও আইনের অধ্যয়ন প্রাধান্য পেত। কিন্তু ১৭৮০ সালের পর থেকে কাণ্ট (Immanual Kant), ফিক্‌টে (Johann Fichte), শেলিং (Friedrich Schelling), হেগেল (Georg Hegel), শোপেনহাওয়ার (Arthur Schopenhaure) প্রভৃতি দার্শনিকদের চর্চার ফলে দর্শশাস্ত্রে নূতন মাত্রা যোগ হ'ল। আইন, ঈশ্বরতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে কলা বিভাগ একই পংক্তিতে স্থান পেল। শেষোক্ত বিষয়ে শিক্ষিত ছাত্ররা সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেন। প্রথমে প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিবর্তন ঘটে এবং কিছুদিনের মধ্যেই জার্মানীর আর কুড়ি বাইশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিবর্তনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। (এখানে মনে রাখতে হবে, ১৮৭১ সালের আগে জার্মানী বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল প্রাশিয়া)। বিভিন্ন মানবিক বিদ্যা (humanistic subjects) চর্চা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নূতন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তায়। এটা হ'ল, বিদ্যালয়ে পড়াবার যোগ্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। মানবিক বিদ্যার অন্তর্গত বিষয়সমূহের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য ঘটতে থাকে। আইন, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের তুলনায় মানবিক বিদ্যার বিষয়গুলো প্রাধান্য পেতে থাকে। এইভাবে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজশাস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। কালক্রমে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে কয়েকজন দিকপাল চিন্তাশীল ব্যক্তির সারস্বত সাধনার ফলে সমাজতত্ত্ব নানাভাবে সমৃদ্ধি হয়েছে। যেমন, মার্ক্স, টনিজ, সিমেল (Simmel), ম্যাক্স হেবার (Max Weber), কার্ল মানহাইম (Karl Mannheim) প্রভৃতি। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'সমাজতাত্ত্বিক' হিসেবে এঁদের পরিচয় ছিল না। মার্ক্সও বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটিয়েছেন। সিমেল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ম্যাক্স হেবার হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। টনিজ কিল বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Kiel) দর্শন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ হিটলারের অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত জার্মানীতে 'সমাজতত্ত্ব' স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে স্থান পায়নি। তা সত্ত্বেও উপরোক্ত দিকপাল পণ্ডিতগণ সমাজতত্ত্বের বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'সমাজতত্ত্ব' স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে স্থান পেয়েছে।

৩.৫.১ মার্কিন চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সমাজসেবীদের অবদান

স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সমাজতত্ত্বের অভ্যুদয়ের কাহিনী কেবলমাত্র য়ুরোপীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত নয়। মার্কিনী চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সমাজসেবীদের অবদানেও সমাজতত্ত্ব নানা কি দিয়ে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা জাতির লোক মার্কিন দেশে এসে স্থায়ীভাবে বাস করে। এর ফলে বিচিত্র রকম সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে নবাগতদের নূতন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া, কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় মার্কিনীদের পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা আছে। সমাজসেবীরা সক্রিয়ভাবে এই জাতীয় সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক আন্তঃক্রিয়া যাতে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয় তার জন্য নানা সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। এর ফলে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা নানাভাবে পরিপুষ্টি ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে তাত্ত্বিক দিক এবং মার্কিনী ঐতিহ্যে ব্যবহারিক দিক প্রাধান্য পেয়েছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ গোটা সমাজকে চোখের সামনে রেখে সমাজের গতি-প্রকৃতি ও বিবর্তন সম্পর্কে অনুমানভিত্তিক আলোচনার উপর জোর দেন। আবার কিছু সংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ্ (প্রধানত মার্কিনী) তথ্যভিত্তিক আলোচনার উপর জোর দেন। তাঁরা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা

সমাধানের উপায় হিসেবে সমীক্ষার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা ও তথ্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করার উপর বিশেষ জোর দেন। বর্তমান কালেও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় তত্ত্বভিত্তিক এবং তথ্যভিত্তিক দু'টি ধারা পাশাপাশি চলতে দেখা যায়।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্বের স্বীকৃতি এই শাস্ত্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পথিকৃৎ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্ব পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮৯৩ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগে সমাজতত্ত্ব পড়াশুনা আরম্ভ হয়। Albion Small-এর নেতৃত্বে ১৯৪০ পর্যন্ত এই একাধিপত্য বর্তমান ছিল। কারণ 'The City of Chicago served as a living laboratory'। ১৯৪০ এর পরে হার্ভার্ড ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিদ্যার চর্চা হতে শুরু করে। হার্ভাড-এ ট্যালকট পারসন্স এবং কলাবিদ্যায় রবার্ট মার্টন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরবর্তী কালে অন্যান্য মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমাজতত্ত্ব' স্বতন্ত্র বিষয় বলে স্বীকৃত পায়। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে মার্কিন দেশে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে 'সমাজতত্ত্ব' স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়। ১৮৯৩ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী দেবার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়। ১৯০৫-এ American Sociological Society প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই Brown, Clark, Columbia, Yale প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে গ্রহণ করা হয়। স্বতন্ত্র বিভাগ তখনও খোলা হয়নি। ১৯১০ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে 'সমাজতত্ত্ব' পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষাস্তরে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন এত দ্রুত প্রসারলাভ করার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহিরাগত লোকদের উপস্থিতি নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, কৃষ্ণকায় এবং শ্বেতকায় মার্কিনীদের পারস্পরিক অন্তঃক্রিয়ায় অনেক রকমের সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা জরুরী হয়ে পড়ে। এই কারণে উচ্চশিক্ষাস্তরে সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে পঠন-পাঠন এবং গবেষণা অগ্রাধিকার পেতে থাকে। যদিও প্রথম দিকে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহ সমাজতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক প্রাধান্য পায়, কিন্তু ক্রমশ তাত্ত্বিক আলোচনাও গুরুত্ব পেতে থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতত্ত্বের ভাল ভাল পাঠ্য বই রচিত হয়। পাঠ্য বই থাকায় উচ্চশিক্ষাস্তরে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন প্রবর্তন করা সহজ হয়। এই প্রসঙ্গে দু'টো পাঠ্য বইয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৯৪ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপকদ্বয় Small এবং Vincent An Introduction to the study of Society নাম দিয়ে একটি পাঠ্য বই রচনা করেন। এর দু'বৎসর পর গিডিংস্ (Franklin H. Giddings) ১৮৯৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই Principles of Sociology প্রকাশ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম সমাজতত্ত্বে পাঠ্য বই রচিত হয়।

য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমাজতত্ত্ব স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় অপেক্ষাকৃত দেরিতে। এর একটি প্রধান কারণ হ'ল, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe-Brown) এবং ম্যালিনওস্কির (Malinowski) প্রভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক নৃতত্ত্ব পাঠ্যসূচীতে স্থান করে নেয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'সমাজতত্ত্ব' স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে স্থান পায়নি। ১৯০৭ সালে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলণ্ডের প্রথম সমাজতত্ত্ব বিভাগ চালু হয় Prof. Martin White-এর তত্ত্বাবধানে। পরে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস্-এ Martin White নামাঙ্কিত সমাজ-বিজ্ঞানের একটি চেয়ার প্রফেসরের পদ আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভাল ভাল পাঠ্য বইও রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

ফ্রান্সে সমাজতত্ত্বের কয়েকজন পথিকৃৎ ছিলেন যাঁরা নানাভাবে তাঁদের তাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা সমাজতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন মঁতেস্কু (Montesquien), কোঁৎ, লে প্লে (Frederic Le Play), দুর্কহেইম প্রভৃতি। কিন্তু ফ্রান্সে নৃতত্ত্ব উচ্চশিক্ষাস্তরে বহুদিন যাবৎ অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল। নৃতত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দুর্কহেইম প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নানা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রপাত করেন। সমাজের বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ধরে তাঁরা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় লিপ্ত হন। যেমন, "sociology of education, of religion, of law, and of the economy". তবে মনে রাখতে হবে, ফ্রান্সে এইসব ইনস্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চশিক্ষার অঙ্গ।

উচ্চশিক্ষাস্তরে সমাজতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটায় এই নূতন শাস্ত্রটি বহু শাখায় পল্লবিত হয়ে পরিপুষ্ট এবং বৈচিত্র্য লাভ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক পরিকল্পনায় এবং নানারকম সমাজসংস্কারমূলক কাজে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমানে 'সমাজতত্ত্ব' স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল।

৩.৬ ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার সূচনা ও বিকাশ

প্রথমাবস্থায় ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা জাতীয়তাবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতবাসী নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য, ভাষা, ধর্ম, চিরাচরিত আচার প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। নিজেদের অতীত ঐতিহ্য নিয়ে আত্মগরিমা বোধ করে। সনাতন ভারতবর্ষকে জানবার এবং বুঝবার স্পৃহা জন্মায়। প্রথম দিকে যাঁরা ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁদের লেখার এই ভাবধারা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় হ'ল ১৭৭৩ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত। এই পর্যায়ে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার সূচনা হয়। দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল ১৯০১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। এই পর্যায়ে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা পেশাদারি স্তরে (professionalised) উন্নীত হয়। পরবর্তী পর্যায় হ'ল স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ। এই যুগে ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁদের বিদেশী সহকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ভাব বিনিময়ের সুযোগ পান। গবেষণার জন্য প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান পাবার ফলে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা নানা দিক থেকে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য লাভ করে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজে যুক্ত হয়ে সমাজতাত্ত্বিক চর্চায় অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেন।

৩.৬.১ প্রথম পর্যায় (১৭৭৩-১৯০০)

ইংরেজ রাজকর্মচারীগণ সুচারুরূপে শাসনকার্য চালাবার জন্য ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, ধর্ম ও নানা ধর্মীয় অনুশাসনের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৭৬৯ সালে বাংলা ও বিহারের গভর্নর Henry Verelst তার রাজস্ব-করণিকদের প্রভাবশালী পরিবারদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। তার পর থেকে ইংরেজ রাজকর্মচারী ও মিশনারীগণ ভারতীয় প্রজাদের জীবন-প্রণালী ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। ১৮১৬ সালে মহীশূরে একজন ফরাসী মিশনারী (Abbe Dubois) 'Hindu Manners, Customs and Ceremonies' শীর্ষক একটি বই লেখেন। এই বইটি ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক চর্চার দিক থেকে আজও মূল্যবান। তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন জাতের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া বর্ণনা করে আরেকটি বই লেখেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, Sir William Jones ১৭৮৪ সালে The Asiatic Society of

Bengal প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে ধর্ম, দর্শন ছাড়াও নানারকম সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হ'ত এবং সোসাইটির মুখপত্র Asiatic Miscellany-তে এইসব আলোচনার সারাংশ প্রকাশিত হ'ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে সমাজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে নিয়মানুগ (systematic) সমাজতত্ত্ব চর্চার পথ প্রশস্ত করে।

১৮৭১ সালে ইংরেজ সরকার সারা দেশে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত লোক-গণনার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে নানা সামাজিক তথ্য সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার দিক থেকে এটা একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

৩.৬.২ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯০১—১৯৫০)

১৯০১ সালে Sir Herbert Risley জাতিগত তথ্য (ethnographic survey) সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেন। Risley, Wilson, Baines, O'Malley, Hutton প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক চর্চায় নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।

সরকারী কর্মচারীগণ প্রশাসনিক প্রয়োজনে এসব তথ্য সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হন। তাছাড়া, অনেক ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারী সরকারী প্রশাসনিক প্রয়োজনের বাইরে ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম দর্শন প্রভৃতি চর্চায় আকৃষ্ট হন। এঁদের মধ্যে Sir Henry Maine-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৬১ সালে Ancient Law এবং ১৮৭১ সালে Village Communities in the East and West শীর্ষক দু'টি পুস্তক রচনা করেন। এই সময় মার্ক্স ও ম্যাক্স হেবার লোক-গণনায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন ১৯০৬ সালে W H. R. Rivers প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে 'The Todas' শীর্ষক একটি মূল্যবান পুস্তক লেখেন। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতীয় পণ্ডিতগণ সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় লিপ্ত হন। এখানে বলে রাখা ভাল, এই পর্যায়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা মূলত সামাজিক নৃতত্ত্ব ঘেঁষা ছিল। কারণ, তখনকার দিনে আমাদের অনেক কৃতী ছাত্র ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করেছেন। কাজেই Radcliffe-Brown এবং Malinowski-র প্রভাব তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এই সময়কার ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীশরৎচন্দ্র রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি ১৯৩৪ সালে 'Caste Race and Religion in India' শীর্ষক একটি মূল্যবান বই প্রকাশ করেন। এই সময় শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Dawn Society প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার তরফ থেকে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা হ'ত। এই পত্রিকায় ভারতীয় প্রথা, চিরাচরিত জীবন-প্রণালী এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হ'ত। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ (National Council of Education) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠন করেন। সাহিত্য পরিষদ ভারতীয় সমাজের নানা দিক নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৯০০ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত হয়। এই প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করার সময় তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় তুলনামূলক সমাজতত্ত্বের ("comparative sociology") অবতারণা করেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা-সম্বলিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ এবং জাতির উৎপত্তি ("a paper on race origins") ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন সমাজের রীতি নীতি এবং আচার-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে একটিকে অপরটির তুলনায় অধিকতর ভাল বলা অনুচিত। কারণ, প্রত্যেক সমাজের সামাজিক আচার-ব্যবস্থা এবং রীতি-নীতির মূল্যায়ন করা অর্থহীন। আচার্য শীল ১৯১৭ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে 'সমাজতত্ত্ব' পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। এর কিছু পূর্বে ১৯০৮ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ.

অর্থনীতির পাঠ্যসূচীতে ২০০ নম্বরের দু'টি বিষয় (সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত) যুক্ত হয় এবং ঐ বছরের এম. এ. পরীক্ষায় সমাজতত্ত্বের প্রশ্নপত্রও করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার* সমাজতত্ত্বের বিষয়গুলো পড়াতেন। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুও পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্ব বিষয়ে পাঠ দিতেন। তিনি ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক চর্চাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। 'হিন্দু সমাজের গড়ন' তাঁর অন্যতম মৌলিক রচনা।

১৯১৪ সালে ভারত সরকার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে স্নাতকোত্তর স্তরে 'সমাজতত্ত্ব' পঠন-পাঠনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করেন। ১৯১৯ সালে Patric Geddes-এর অধীনে 'সমাজতত্ত্ব' একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে খোলা হয়। Geddes-এর ছাত্র G. S. Ghurye পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্ব-চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ১৯৩২ সালে তিনি 'Caste and Race in India' শীর্ষক একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে K. M. Kapadia, Irawati karve এবং S. V. Karandikar-এর নাম উল্লেখ্য। এঁরা প্রত্যেকে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ১৯৫২ সালে শ্রীমতী কার্ভে 'Kinship organisation in India' শীর্ষক একটি তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক প্রকাশ করেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করে। ১৯২১ সালে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের অধীনে 'সমাজতত্ত্ব' বিভাগ খোলা হয়। তার এক বৎসর পর অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বিভাগে যোগ দেন। এই দু'জনে অধ্যাপক সমাজতাত্ত্বিক চর্চাকে নানা দিক থেকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। তাছাড়া, এঁদের বেশ কয়েকজন কৃতী ছাত্র ভারতবর্ষীয় পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছেন। S. C. Dube, Yogendra Singh, A. K. Saran প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদ্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

৩.৬.৩ তৃতীয় পর্যায় ঃ স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ

স্বধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে, বিশেষ করে পঞ্চাশ এবং ষাট দশকে, 'সমাজতত্ত্ব' পঠন-পাঠন এবং গবেষণার বিষয় হিসেবে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে, সমাজতত্ত্ববিদ্দের শিক্ষক হিসেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিযুক্ত হবার সম্ভাবনা প্রসারিত হয়। সামাজিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ ও আর্থিক অনুদান সহজলভ্য হয়। অর্থাৎ অপরাপর সমাজবিদ্যার সঙ্গে থেকে সমাজতত্ত্ব একই পংক্তিতে স্থান পায়।

পঞ্চাশ দশক থেকে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য পরিকল্পনার কাজের সঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ্দের যুক্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন একটি Research Programmes Committee (RPC) গঠন করেন। এই কমিটি পরিকল্পনা-সম্পর্কিত নানা বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করার পথ উন্মোচন করে সামাজিক পরিকল্পনায় অর্থনীতিবিদ্দের মত সমাজতত্ত্ববিদ্দেরও যে প্রয়োজন আছে, এই ধারণা ক্রমশ সরকারী স্বীকৃতি পাচ্ছে। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার Indian Council of Social Science Research (I.C.S.R.) প্রভৃতি করেন। তাছাড়া, লোকগণনার কাজে নানাপ্রকার সমাজ-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করায় সমাজতত্ত্ববিদ্দের কারিগরি-বিদ্যা ও কলাকৌশলের প্রয়োজন বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৫১ সালে Indian Sociological Society প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার দ্বি-বার্ষিক পত্রিকা Sociological Bulletin সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া সমাজতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর ফলে সমাজতত্ত্ববিদ্দের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ

* বিনয়কুমার সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে দেশে ফিরে আসেন। তখন থেকে (আনুমানিক ১৯২৫ সাল) উনি সমাজতত্ত্ব পড়াতে শুরু করেন।

ঘটে। পঞ্চাশ-ষাট দশক থেকে ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্ব চর্চার একটা নূতন ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে। এই নূতন ধারাকে 'Structural-functional method' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই নূতন ধারার বৈশিষ্ট্য হ'ল, তত্ত্ব ও তথ্যের মেলবন্ধন। প্রত্যক্ষ সমীক্ষার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে সামাজিক আচার-ব্যবস্থাকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়। আগে ভারততত্ত্ববিদ্‌দের (Indologists) মত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবস্থায় তাৎপর্য বুঝবার জন্য বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদির আশ্রয় নেওয়া হ'ত। এতে আচার-ব্যবস্থার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন হ'ত। সমাজ যে একটি অখণ্ড যৌগিক বস্তু এই ধারণা ভারততত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণা-পদ্ধতিতে পরিষ্কার হ'ত না। নূতন ধারায় গোটা সমাজকে চোখের সামনে রেখে বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। এর ফলে কি অবস্থায় কি কারণে এবং কিভাবে বিশেষ আচার-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই কারণে। বর্তমান কালে ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চায় field work-এর অপরিসীম গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি বিশ্লেষণ-ধর্মী গবেষণার উল্লেখ করা যেতেপারে। ১৯৫৫ সালে ইংরেজ শাসক প্রবর্তিত হবার ফলে গ্রামীণ-সমাজে কি প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয় এই বিষয়টি নিয়ে Kathleen Gorgh তাঞ্জোরের একটি গ্রামে সমীক্ষা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন (Village India edited by Mckim Marriott)। ১৯৫৭ সালে Bailey বাজারের পণ্য হিসেবে ভূমির বেচা-কেনার সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক সচলতার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন (Caste and the Economic Frontier)। ১৯৫৮ সালে S. C. Dube উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে কয়েকটি গ্রামে পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে জনগণের সাংস্কৃতিক ও সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন (India's Changing Villages)। ১৯৬২ সালে M. N. Srinivas গ্রামাঞ্চলে কি পদ্ধতিতে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এই বিষয়ে আলোচনা করেন (The Study of Disputes in an Indian Village)। এই কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে তৃণমূল স্তরে তথ্য সংগ্রহ করে সমাজজীবনের বিশেষ বিশেষ দিক ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

এইসব আঞ্চলিক স্তরে (micro-level study) বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পাশাপাশি সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজ-জীবনকে দেখবার ও ব্যাখ্যা করবার চেষ্টাও অব্যাহত আছে। এই প্রসঙ্গে তিনটি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬৬ সালে M. N. Srinivas ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে Social change in Modern India নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৭০ সালে Mandelbaum বিভিন্ন গবেষকের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য এবং তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুই খণ্ডে Society in India শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে ধারাবাহিকতা কিভাবে মিশে আছে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৭০ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থাকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে জাতপাতের ভেদ বিবেচনা করা অপরিহার্য—এই বিষয়টি নিয়ে ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী Louis Dumont একটি বই প্রকাশ করেন (Homo Hierarchiens)। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন, পাশ্চাত্যের সমাজের মত ভারতবর্ষে সামাজিক মর্যাদা সবক্ষেত্রে কাঞ্চন কৌলিন্যের উপর নির্ভরশীল নয়। একজন ব্রাহ্মণ ক্ষমতাবান ক্ষত্রিয় কিংবা ধনী বৈশ্যের তুলনায় উন্নত পদমর্যাদার অধিকারী। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে অবশ্য এখনও বিতর্ক অব্যাহত।

সত্তর দশক থেকে ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্ব-চর্চায় মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষণীয়। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মত সমাজতত্ত্বক মার্ক্সীয় দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। একজন ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেছেন : GThe Marxist star is rising in Indian sociology." তবে ভারতীয় সামাজিক আচার-ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি কতটা প্রাসঙ্গিক এই নিয়ে বিতর্ক আছে।

ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার বিকাশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হ'ল। আমাদের দেশে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা যেভাবে এগিয়েছে এবং এখনও যেভাবে চলছে, সেই সম্বন্ধে অনেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রথমত, য়ুরোপে এবং মার্কিন দেশে যেসব বিষয় নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা হচ্ছে, আমাদের দেশেও অনেকটা সেই ধাঁচে আলোচনা এবং গবেষণার বিষয় বেছে নেওয়া হচ্ছে। অধ্যাপক দুবে সেইজন্য আমাদের সমাজতাত্ত্বিক চর্চাকে "A sociology of borrowed concepts and methods" বলে আখ্যা দিয়েছেন। অনেক আগে অধ্যাপক ধূর্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "It is not enough for the Indian sociologist to be a sociologist. He must be an Indian first, that is, he is to share in the folkways. mores, customs and traditions for the purpose of understanding his social system and what lies beneath it and beyond it. অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের উক্তির সমর্থনে Prof. Srinivas এবং Prof. M. N. panini বলেছেন ঃ "Sociology has to go native it is to be creative". অর্থাৎ স্থান-কাল পরিবেশ বিবেচনা না করলে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা ফলপ্রসূ এবং অর্থবহ হবে না। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা একটি যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের জীবন-প্রণালী, আচার-ব্যবস্থা এবং রীতি-নীতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ হয়নি। আমাদের দেশের সমমাজতত্ত্ববিদ্‌দের এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় সংহতির জন্য এই ধরনের তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ জরুরী।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। সাধারণ অর্থে প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে শিল্পাদিতে প্রয়োগ-কৌশল বোঝায়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় এই শব্দটি প্রয়োগ-কৌশল ছাড়াও আরও অতিরিক্ত অর্থ বহন করে। প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে কেবলমাত্র কলকারখানা ও বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের প্রবর্তন বোঝায় না, যথোচিত মানসিক ও সামাজিক প্রস্তুতিও নির্দেশ করে। কারণ, শেষোক্ত পরিবর্তন না ঘটলে প্রযুক্তিবিদ্যার সম্যক বিকাশ সম্ভব নয়। বিশেষ ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় প্রযুক্তিবিদ্যা গৃহীত হয়। কিন্তু উপযোগী মানসিকতা এবং সামাজিক কাঠামো গড়ে না উঠলে এই প্রত্যাশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন কোন সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে এবং কোন কোন সমাজে তা হয়নি। দুঃখের বিষয়, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা আমাদের দেশে বিশেষ হয়নি। অধ্যাপক শ্রীনিবাস এবং অধ্যাপক পাণিনি যথার্থই বলেছেন ঃ "Attempts to study the influence' of science and technology are misconveived because they are based on the wrong premise that society is only a passive recipient and not an active generator of forces as well". এই বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছিলেন ঃ "The thing changing is more real and objective than change per se." অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন যা ঘটে গিয়েছে কেবল তার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে পরিবর্তন কিভাবে কোন্‌দিকে এবং কেন সংঘটিত হচ্ছে এটা জানা সমাজতত্ত্বের দিক থেকে অনেক বেশি মূল্যবান প্রয়াস। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের প্রতি অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবেদন প্রণিধানযোগ্য ঃ "Indian sociologists should take courage in both hands and openly say that the study of the Indian social system, in so far as it has been functioning till now, requires and different approach to sociology because of its special tradition, its special symbols and its special patterns of culture and social actions. The impact of economic and technological changes on Indian traditions, culture and symbol, follows thereafter."

৩.৭ অনুশীলনী

(ক) নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(১) The Enlightenment-এর যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবনা-চিন্তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে জার্মানীতে শিক্ষাক্ষেত্রে কি ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(৩) ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা একটা যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে—এই উক্তির অর্থ কি? সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করুন।

(খ) নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন ঃ

(১) শিল্প-বিপ্লব কিভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার উন্মেষ ঘটায় এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন?

(২) ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা কি কারণে ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করল? বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(গ) বন্ধনীতে প্রদত্ত শব্দগুলো থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(১) 'হিন্দু সমাজের গড়ন' বইটির লেখক—(আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়)।

(২) সমাজ রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং আরও ব্যাপক, এই ধারণা—(ভ্রান্ত, সঠিক)

(৩) — Dawn Society প্রতিষ্ঠা করেন (শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়)।

(ঘ) নিম্নোক্ত বাক্যযুগল থেকে সঠিক বাক্যটি বেছে নিন ঃ

(১) The Enlightenment যুগের চিন্তানায়কদের মতে সত্যকে যাচাই করার একমাত্র কষ্টিপাথর হ'ল যুক্তি।

The Enlightenment যুগের চিন্তানায়করা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত বিশ্বাস ও আচারকে সত্য বলে গ্রহণ করতেন।

(২) পরিবেশ নির্বিশেষে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ করা যেতে পারে। আশানুরূপ ফল পেতে কোন অসুবিধে হয় না।

উপযুক্ত মানসিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে না উঠলে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রচলন আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ হবে।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Irvin Zeitlin : Ideology and the Development of Sociological Theory Prentice-Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1969.

(২) T. B. Bottomore : Sociology Unwin University Books, George Allen & Unwin Ltd., London, 1969.
(৩) Randall Collins : Three Sociological Traditions. Oxford University press. New York, Oxford, 1985.
(৪) T. K. Oommen & Partha Nath Mukherjee (Ed.) : Indian Sociology, Reflections and Retrospections, popular Prakashan, Bombay, 1986
(৫) G. Duncan Mitchell : A Hundred Years of sociology, Gerald Duckworth & Co.. Ltd., 3. Henrietta st., London. 1969.
(৬) পরিমল ভূষণ কর : সমাজতত্ত্ব, সপ্তম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫
(৭) Parimal B. Kar : Society : A study of Social Interaction. New Delhi, 1994.

একক ৪ ☐ সমাজতত্ত্বের কয়েকটি মৌল বিচার্য বিষয়

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ ব্যক্তি ও সমাজ
৪.৪ বিদ্যমানতা ও পরিবর্তন
৪.৫ সামাজিক সংহতি ও দ্বন্দ্ব
৪.৬ বিশ্বায়ন ও স্থানিকতা
৪.৭ অনুশীলনী
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

প্রথম এককের এই অংশ পাঠ করলে আপনি—

- ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায় এবং কি কি উপাদানে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, ব্যক্তির উপর বংশগতি এবং পরিবেশের কি প্রভাব প্রভৃতি বিষয় জানতে পারবেন।
- সমাজের গতিশীলতা এবং স্থিতিশীলতার বিশদ ব্যাখ্যা পাবেন।
- সমাজ-জীবনে সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের সহাবস্থান কিভাবে সম্ভব এবং দ্বন্দ্বের উপস্থিতি সত্ত্বেও কি করে সামাজিক সংহতি বজায় থাকে, এই বিষয়ে ধারণা করতে পারবেন।
- বর্তমান কালে বিশ্বায়ন একটি বাস্তব ঘটনা। এর গতি অপ্রতিরোধ্য। স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতে এর সম্ভাব্য প্রভাব কি হতে পারে, এই বিষয়ে চিন্তার খোরাক পাবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা নানা নূতন যাত্রা যোগ হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, নানা সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার নূতন নূতন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে। অতীতে যে সব তত্ত্ব আলোচনার অন্তর্গত ছিল, সেই বিষয়গুলো আরও গভীরতা পাচ্ছে। পাঠের এই অংশে এই ধরনের চারটি মৌল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

প্রথমটি হ'ল ব্যক্তি সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক। ব্যক্তির উপর সমাজের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে ব্যক্তি কি সমাজের ক্রীড়নক?'অথবা ব্যক্তিসত্তা কি পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত? এইসব প্রশ্ন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সমাজ হ'ল প্রবহমান নদীর মত। প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। অথচ বিশ্লেষণের জন্য সমাজকে একটি অচল অনড় কাঠামো ভেবে নিয়ে এগোতে হবে। দূরত্ব মাপার ফিতের যদি প্রতি মুহূর্তে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাহলে মাপজোখের কাজ হয় না। এই সমস্যাটি 'বিদ্যমানতা ও পরিবর্তন' অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মানুষের স্বভাব এমন যে, সে অপরের সান্নিধ্য কামনা করে, অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে চায়। অথচ, অপরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়, অপরের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত ঘটে। এইসব সত্ত্বেও সামাজিক বন্ধন শিথিল হবার উপক্রম হ'লেও শেষ পর্যন্ত স্থিতাবস্থা অটুট থাকে। এই বিষয়টি 'সংহতি ও দ্বন্দ্ব' শীর্ষক অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় নানা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয়েছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে নানা স্থানিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এই বিষয়টি 'বিশ্বায়ন ও স্থানিকতা' শীর্ষক অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

৪.৩ ব্যক্তি ও সমাজ

মানুষের মধ্যে যূথচর প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তির তাগিদেই সে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে। আবার সমাজও সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তাকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলে। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এই দু'টির মধ্যে যোগসূত্র হল জীবনধারা (culture)। মানুষ তার প্রয়োজনে জীবনধারা গড়ে। এই জীবনধারা একদিকে সমাজকে বেঁধে রাখতে সাহায্য করে এবং অপরদিকে সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণ এবং চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত, নিয়মিত এবং সময় সময় নিয়ন্ত্রিত করে। আলোচ্য পাঠে এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করব।

পাশ্চাত্য সমাজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে দু'টি ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। একটি সামাজিক চুক্তি মতবাদ। দ্বিতীয়টি জৈব মতবাদ। প্রথম মতবাদের মূল বক্তব্য হ'ল, মানুষ প্রথমাবস্থায় 'প্রকৃতি'-র রাজ্যে বাস করত। পরবর্তীকালে প্রকৃতির রাজ্যে তাদের সব প্রয়োজন চরিতার্থ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কি কারণে বা কি অবস্থায় সব প্রয়োজন চরিতার্থ করা সম্ভব হয়নি, এই বিষয়ে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তাগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে তাঁরা সবাই এই অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, মুশকিল-আসানের উপায় হিসেবে মানুষ প্রাকৃতিক রাজ্যের পরিবর্তে চুক্তি মাধ্যমে রাষ্ট্র-গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, এই মতবাদে মানুষের যূথচর প্রবৃত্তির কোন স্বীকৃতি নেই। অর্থাৎ মানুষ যে স্বভাবতঃ সামাজিক জীব, এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। এই কারণে সামাজিক চুক্তি মতবাদের কোন সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য নেই। অপরপক্ষে, জৈব মতবাদে রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে এবং ব্যক্তিকে জীবকোষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই মতবাদের প্রবকতাগণ শুধু তুলনা করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁদের মতে, জীবকোষ যেমন জীবদেহের উপর নির্ভর-শীল, ঠিক তেমনি ব্যক্তিও রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা বা অর্থবহ জীবনযাপন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই মতবাদ দু'টি কারণে সমাজতত্ত্বের দিক থেকে তাৎপর্যবিহীন। প্রথমত, রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা হয়নি। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে।

ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রথমটি হ'ল, ব্যক্তিত্ব গঠনে জীবনধারা এবং সামাজিকীকরণের ভূমিকা। দ্বিতীয় বিষয়, ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগতি এবং পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব।

এই দু'টি বিষয় আলোচনা করার আগে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

সাধারণ কথাবার্তায় ব্যক্তিত্ব বলতে সেইসব গুণের উল্লেখ করা হয়, যা লোককে সহজে আকৃষ্ট করে

বা প্রভাবিত করে। সুতরাং ব্যক্তিত্বহীন লোক বলতে এমন লোককে বোঝায় যার কথাবার্তা বা আচার-আচরণে আকর্ষণীয় কিছু লক্ষ্য করা যায় না।

কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্দের মতে, ব্যক্তিত্বহীন লোক হতে পারে না। তাঁদের মতে প্রত্যেক লোকেরই ব্যক্তিত্ব আছে। কারণ, ব্যক্তির 'অহং' ভাবকে কেন্দ্র করে যে মানসিকতা এবং আচার-আচরণ গড়ে ওঠে, সেটাই ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচিত হয়। ব্যক্তিত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বুঝতে সুবিধে হবে।

ব্যক্তিত্বের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তির আত্ম-সচেতনতা। যখন চেতনায় 'অহং' ভাব প্রকাশ পায়, তখনই একজন লোক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয়। শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। কারণ, তার চিন্তন, মনন ও বাহ্যিক আচার-আচরণ সঙ্গতি স্থাপিত হয় না। একটু বয়স হলেই 'অহং' ভাব এবং তৎসম্পর্কিত মানসিকতা ও আচরণ গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। কোন শিশু যদি কোন কারণে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বড় হয়, তাহলে তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। এই বিষয়টি নানা ভাবে পরীক্ষিত। এইজন্য ফিক্টে (Fichte) বলেছিলেন ঃ "Man becomes man only among men."

তৃতীয়ত, জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সমগ্র দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, ঠিক তেমনি ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান—যেমন, শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক উপাদানসমূহ—ব্যক্তির 'অহং' ভাবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। ব্যক্তিত্ব বলতে গোটা মানুষকে বোঝায়, তার বিশেষ কোন দিককে নয়। শৈশবাবস্থায় জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদ এবং ভাবাবেগ দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সে বুদ্ধি দ্বারা জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদ এবং ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে লোকের চিন্তাধারা ও আচার আচরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়ে ওঠে। এইভাবেই লোকের ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়।

সমাজতত্ত্ববিদ্দের মতে, ব্যক্তিত্বের গঠন এবং জীবনধারার আত্তীকরণ (cultural assimilation) দু'টো ভিন্ন প্রক্রিয়া নয়। একই শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় যুগপৎ জীবনধারার আত্তীকরণ ও ব্যক্তিত্বের গঠন চলতে থাকে।

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ্ কুলী (C. H. Colley)। তিনি তাঁর 'Social Organisation' নামক বইয়ে সমাজ এবং অহংকে যমজ বলে বর্ণনা করেছেন ("self and society are twin-born")। অর্থাৎ সমাজে বাস করার ফলে নানাপ্রকার আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ 'অহং' সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অপরের সংস্পর্শে না এলে 'অহং' বোধ জন্মায় না। তিনি আরও বলেছেন, পৃথক স্বয়ং-সম্পূর্ণ 'অহং'-এর ধারণা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, অপরের দৃষ্টিতে আমি কিভাবে প্রতিভাত হচ্ছি সেই বিষয়ে আমার যা ধারণা, সেই ধারণা অনুযায়ী আমি নিজেকে জানি এবং নিজের মূল্যায়ন করি। তাঁর ভাষায় ঃ "The Wey we imagine ourselves to appear to another person is an essential element in our conception of ourselves. Thus, I am not what I think I am and I am not what you think I am, I am What I think you think I am." কুলীর এই ব্যাখ্যা "looking glass conception of the self" বলে পরিচিত। এইভাবে কুলী প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে 'অহং' বোধ প্রকাশ পায় এবং ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে।

১৯৩৭ সালে নানা প্রকার গবেষণার ভিত্তিতে নৃতত্ত্ববিদ্ লিনটন (Linton) এবং মনোবিদ্ কার্ডিনার (Kardinar) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রত্যেকটি সমাজের স্বতন্ত্র জীবনধারা সমাজস্থ লোকের মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই কারণে ভারতীয়দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, যা তাদের নিজস্ব বা অপর কোন সমাজে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে দুর্লভ। যেমন, ইংরেজদের চিন্তাধারা আচার-

আচরণ এবং ভব্যতা ভারতীয়দের চিন্তাধারা, আচার-আচরণ এবং ভব্যতার সঙ্গে মেলে না। অর্থাৎ, প্রত্যেক সমাজের বসবাসকারী লোকদের মধ্যে একটা basic personality type বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়, যা তাঁদের একান্ত নিজস্ব জিনিস। লিনটন এবং কার্ডিনারের মতে, শৈশবাবস্থায় অনুরূপ অভিজ্ঞতার ফলে তাদের মধ্যে এইরূপ বিশেষ ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে। এই ক্ষেত্রে জন্মগত সহজ প্রবৃত্তি (instinct) বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন প্রভাব থাকে না। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগে মার্কিন পিতামাতার একটি সন্তান শৈশবাবস্থা থেকে চীন দেশে সেখানকার একটি পরিবারে অন্যান্য চীনা শিশুদের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। এই শিশুটি যখন যুবক তখন সে মার্কিন দেশে যায়। তার হালচাল, আচার-ব্যবহার কথা বলার ঢঙ্ সবকিছু পুরোপুরি চৈনিক যুবকের অনুরূপ দেখা যায়। কেবলমাত্র বহিরাকৃতি চুলের রঙ ইত্যাদি শারীরিক বৈশিষ্ট্য তার বংশ-পরিচয় বহন করে।

জীবনধারা (culture) কিভাবে কোন নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে, এই বিষয়টি অগবার্ন (Ogburn) বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি জীবনধারার প্রতীকি (non-material of Abstfract) এবং বাস্তব (meterial) উপাদানের প্রভাব পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ঘড়ির প্রচলন ছিল না। তাঁর মতে, এই কারণে সময়ানুবর্তিতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গড়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে, শ্বেতকায় মার্কিনীদের মধ্যে ঘড়ির প্রচলন থাকায় সময়মত কাজ শেষ করা, পূর্ব নির্ধারিত সময়ে কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা—এই জাতীয় বিভিন্ন কাজকর্মে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার অভ্যাস মজ্জাগত হয়েছে। মহাকালকে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধলে 'কাল নিরবধির' ধারণা আচার-আচরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

জীবনধারার বাস্তব উপাদান ছাড়াও প্রতীকী উপাদানও ব্যক্তিত্বের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক সমাজেই ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শোভন-অশোভন সম্পর্কিত নানারকমের মূল্যবোধ প্রচলিত থাকে। ভাষার মাধ্যমে আমরা এইসব মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হই। বেশ কিছুদিন প্রচলিত থাকার পর কোন বিশেষ শব্দ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে মনের নানারকম আবেগ ও আকুতি বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়। এই শব্দগুলি আমাদের নিকট নির্দিষ্ট অর্থ ছাড়া অতিরিক্ত নানারকম ভাব বহন করে আনে। শৈশবে আমরা যখন ভাষা শিখি, তখন এইসব শব্দের ব্যঞ্জনার সঙ্গে পরিচিত হই। এই তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ মনের গহনে গভীর এবং প্রায় অনপনেয় ছাপ রাখে। ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেবেলায় আমাদের মধ্যে যেসব ভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়। পরবর্তী জীবনে সেইসব ভাব কাটিয়ে ওঠা পরায় অসম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক হবে না যে, ব্যক্তিত্ব-গঠনে জীবনধারার প্রভাব অপরিসীম এবং বহুধা বিস্তৃত। মানুষের ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ এবং বাহ্যিক আচার-আচরণ তার সমাজ-প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, এমনি অনেকক্ষেত্রে নির্ণীত হয় বললেও ভুল হবে না। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষ নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ নয়। তার নিজস্ব সক্রিয় ভূমিকা আছে। সমাজ থেকে সে কতটুকু গ্রহণ করবে বা কতটুকু বর্জন করবে, এটা সম্পূর্ণরূপে তার মানসিকতার উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তিই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতে সমাজ নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে না। কোন সমাজব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত ব্যক্তির স্বকীয়ভাবকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করতে পারেনি। একই জীবনধারার প্রভাবে 'মানুষ' হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কত রকম প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। কোন ব্যক্তি অধিক সংবেদনশীল আবার কেউ বা কম, কেউ অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় স্পর্শকাতর আবার অনেকে কম, কেউ অধিক মাত্রায় কলহপ্রিয় আবার এমন অনেকে সচেতনভাবে কলহ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। এই জাতীয় নানারকম পার্থক্য দেখা যায়। জীবনধারা (culture) সবাইকে একই ছাঁচে ঢেলে গড়তে পারে না। অথচ কোন বিশে, সমাজের জীবনধারা সমাজস্থ লোকদের

ব্যক্তিত্বে এমন একটা ছাপ দেয়, যা তাদের অপরাপর সমাজের লোকদের থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে। অর্থাৎ জীবনধারা একটা বিশেষ Personality type গড়ে তোলে। চিত্রকরের উপমা দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। প্রত্যেক চিত্রকরেরই নিজস্ব ষ্টাইল বা অঙ্কনরীতি আছে। ছবির বিষয় আলাদা হ'লেও যে-কোন ছবির অঙ্কন রীতি দেখলেই ছবিটি কার আঁকা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনুরূপভাবে, জীবনধারাও একটা basic personality গড়ে বা ব্যক্তিত্বে একটা বিশেষ ছাপ দেয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নানারকম প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যক্তিত্বে এমন একটা বিশেষ ছাপ থাকে, যা তাদের অন্য সমাজের লোকদের থেকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে।

সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করার সময় দু'টি বিষয় মনে রাখা দরকার। জীবনধারা (culture) কেবল একতরফা ভাবে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে না। জীবনধারা যেমন ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা এবং কাজকর্মকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি ব্যক্তিও কোন কোন সময় জীবনধারাকে এবং নানারকম সামাজিক বিধিকে নিজের মত করে অনুসরণ করে, মেনে চলে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনের গভীরে একটা গোপন সত্তা লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে, যা অপর কোন ব্যক্তি জানে না, জানতে দেওয়া হয় না, যা একান্তভাবে তার নিজস্ব, যেখানে অপরের প্রবেশাধিকার নেই। এই দিকটি বোঝাতে গিয়ে Ernest van den Haag নামক একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেছেন ঃ "One lives in the tension between society and solitude." দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি এবং জীবনধারার মধ্যে যে আন্তঃক্রিয়া চলে সেটা ছেদবিহীন। অবিরাম এই ক্রিয়া চলতে থাকে। কোন একটা বিশেষ বয়স উত্তীর্ণ হলেই এই প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে না।

এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগতি (heredity) এবং পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করা প্রয়োজন। মনোবিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, ব্যক্তিত্ব-গঠনে বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই গুরুত্ব আছে। বেঁচে থাকার জন্য জল ও বায়ু উভয়ের প্রয়োজন আছে। কোনভাবেই প্রমাণ করার উপায় নেই যে জল অপেক্ষা বায়ুর অথবা বায়ু অপেক্ষা জলের প্রয়োজন বেশি। যে কোন একটির অভাব হলেই মৃত্যু অবধারিত। অনুরূপভাবে ব্যক্তিত্ব-গঠনে বংশগতি এবং পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটিকে উপেক্ষা করে অপরটি দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। বংশগতি এবং পরিবেশের আন্তঃক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যাকাইভার বলেছেন ঃ "Heredity...contains all the possibilities of life, but all its actualities are evoked within and under the conditions of environment." আমরা কে কি হ'তে বা করতে পারব, তা বংশগতি দ্বারা চিহ্নিত হয়ে যায়। এইজন্য বংশগতিকে limiting factor বলে গণ্য করা যায়। কেউ সঙ্গীত-প্রতিভা নিয়ে না জন্মালে তার পক্ষে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এইসব সুপ্ত ক্ষমতা কতটুকু বিকশিত করা সম্ভব হবে, তা সম্পূর্ণরূপে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ অনুকূল হ'লে বেশিরভাগ সুপ্ত ক্ষমতা বিকশিত হবার সম্ভাবনা থাকে। আবার পরিবেশ প্রতিকূল হ'লে অধিকাংশ সুপ্ত ক্ষমতা বিকশিত না-ও হতে পারে। এইজন্য পরিবেশকে unfolding factor বলে গণ্য করা যায়।

জীববিজ্ঞানী এবং মনোবিদের নিকট বংশগতির গুরুত্ব অপরিসীম, সমাজতত্ত্ববিদের নিকট নয়। কি পরিবেশে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতাসমূহ বিকশিত ও পরিপুষ্ট লাভ করতে পারে, এটাই হ'ল সমাজতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আরও দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, যে ব্যক্তি যত বেশি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, তার নিকট পরিবেশের মূল্য তত বেশি। দ্বিতীয়ত, বাল্যে এবং কৈশোরে পরিবেশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাল্যাবস্থায় সুপ্ত প্রতিভা খুব দ্রুতগতিতে বিকশিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য শৈশবাবস্থায় অনুকূল পরিবেশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৪ বিদ্যমানতা ও পরিবর্তন

সমাজকে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়।

একটি বিশ্লেষণে সমাজের স্থিতিশীলতার দিকটি বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সমাজের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, সেই বিষয়গুলো এই জাতীয় বিশ্লেষণের অন্তর্গত। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা বিধি-শাসিত সমাজে বাস করি। আমাদের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার, এমনকি চিন্তা-ভাবনাও নানাপ্রকার সামাজিক বিধি দ্বারা নিয়মিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। লোকাচার, লোকনীতি, প্রথা, আইন প্রকৃতি সামাজিক বিধিগুলো আমাদের নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। তাছাড়া, সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তার জন্য অনেক আচার-ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাগুলো সমাজের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে যে বিশ্লেষণ করা হয়, তাতে সমাজের গতিশীলতার দিকটি অধিকতর গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মানুষের প্রকৃতি এমন যে তাকে সবক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের নির্দিষ্ট বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে এবং সেটা তার আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বিষয়ে সে স্বতন্ত্র; প্রয়োজন হ'লে সে চিরাচরিত পন্থা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নূতন পন্থা অনুসরণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কাজেই সমাজ নিশ্চল অবস্থায় থাকে না। থাকতে পারে না। সমাজে সম্পূর্ণ ভারসাম্য কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় না, তবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবার দিকে একটা ঝোঁক সর্বদাই দেখা যায়। কিন্তু নানা কারণে পরিবেশে অবিরাম পরিবর্তন ঘটায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনাও প্রতিনিয়ত অন্তর্হিত হতে থাকে। সেই জন্য কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ্ সমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে moving equilibrium বা চলমান ভারসাম্য বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সমাজের স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতার দিক নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন অগষ্ট কোঁৎ। পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এই বিষয়ের উপর নানা দিক থেকে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন।

আমরা সমাজের বর্ণনা দেবার সময় যখন পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া শব্দটি ব্যবহার করি, তখন অর্থপূর্ণ বা অর্থবহ আন্তঃক্রিয়া (communicative Interaction) বুঝি। কেউ যখন কথা বলে বা কোন অঙ্গভঙ্গি করে, তখন উচ্চারিত শব্দ বা বিশেষ অঙ্গভঙ্গি আমাদের কাছে বিশেষ অর্থ বহন করে। আমরা যে অর্থে একজনের কথাবার্তা বা আচার-আচরণকে গ্রহণ করে, সেই অনুযায়ী আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি। আবার আর একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমাদের ভাব বা মতামতের পেছনে আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল। এই উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ভাবকে এবং পরোক্ষভাবে আমাদের আন্তঃক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এইভাবেই সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এটা যেমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য, ঠিক তেমনই দুই বা ততোধিক সঙ্ঘের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া-কে নানাভাবে সঙ্ঘের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়াকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। তবে তিন প্রকার পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যথা, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা। পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার এই ত্রয়ী অভিব্যক্তি সর্বজনীন বলা চলে। কারণ সর্বকালে সর্বসমাজে এবং সর্বস্তরে এই তিনপ্রকার আন্তঃক্রিয়ার সহাবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার ফলে সমাজ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে উভয় বৈশিষ্ট্যই বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। শারীরবৃত্ত (physiology) বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শারীরস্থান (anatomy) আলোচনা করলে জীবদেহ সম্বন্ধে একটা নিশ্চল ধারণা জন্মায়। একইভাবে, সমাজের গতিশীলতার দিকটি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সমাজের ভারসাম্য যেসব বিষয়ের

উপর নির্ভরশীল, তার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে দু'জন গ্রীক দার্শনিকের উক্তি উল্লেখ করা হল। Heraclitus বলেছিলেন, কোন লোকের পক্ষে একই নদীতে দু'বার পা ডোবানো সম্ভব নয়। কারণ দু'টো। প্রথমত, দ্বিতীয়বার যখন পা ডোবাবে, তখন প্রথমবার পা ডোবানোর সময় যে জল ছিল, তা সরে গিয়েছে। নদী হল প্রবহমান ধারা। এক মুহূর্ত জল থেমে থাকে না। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয়বার পা ডোবানোর সময় লোকটিরও পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। মানুষের ভেতরে অবিরাম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে—যাকে বলা হয় chemical metabolism বা রাসায়নিক রূপান্তর। সুতরাং প্রথমবার যে লোক নদীতে পা ডুবিয়েছিল, দ্বিতীয়বার পা ডোবানোর সময় সে আর সেই লোক নয়। অনুরূপভাবে, নিরন্তর পরিবর্তন সমাজের ধর্ম। আমরা যখন সমাজ-বিন্যাসের কথা বলি, তখন কিন্তু অচল অনড় স্থিতিশীল সমাজের কথা বলি না। কারণ, বাস্তবে এইরূপ সমাজের অস্তিত্ব নেই।

আরেকজন গ্রীক দার্শনিক Parmenides ঠিক বিপরীত উক্তি করেছেন। তাঁর মতে, "Change is an illusion, everything remains the same. The only reality is being." অর্থাৎ পরিবর্তনের ধারণা অলীক কল্পনা। সব কিছুই অপরিবর্তিত থাকে। অস্তিত্বই হল বাস্তব সত্য।

Permanence and change, being and becoming—এই নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে অতীতে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং এই বিতর্ক এখনও অব্যাহত আছে—Anthony Giddens এই সমস্যাকে একটি dilemma বা উভয় সঙ্কট বলে আখ্যা দিয়েছেন। উভয় সঙ্কট হ'ল ঃ সামাজিক কাঠামো ("social structure") কি আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে পারে? মানুষ কি ইচ্ছাকৃতভাবে ("human action") এই কাঠামোকে বদলাতে পারে? এই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে গিয়ে Gidedens বলেন ঃ "We are not the **creatures** of society, but its **creators**". তিনি এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ "The way forward in bridging the gap between 'structure' and 'action' approaches is to recognise that we *actively make and remake* socal structure during the course of our everyday activities." অর্থাৎ, একদিকে সামাজিক বিধি-নিষেধ আমাদের জীবনকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, আবার আমরাও প্রয়োজনমত সামাজিক কাঠামো গঠন এবং পুনর্গঠন করি।

এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ "Society exists only as a time-sequence. It is a becoming, not a being; a process, not a product. In other words, as soon as the process ceases, the product disappeas...If people no longer observe a custom, the custom no longer exists on the face of the earth. It has nobody that remains after it dies. It exists only as a mode of activity, patterned in the minds of those who follow it. A social structure cannot be placed in a museum to save it from the ravages of time." অর্থাৎ সমাজের অভিব্যক্তির ধারা বিরামহীন। বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমাজকে পাওয়া যায়, পরবর্তী সময়ে সেই সমাজের অস্তিত্ব থাকে না। সমাজ বলতে সমাজস্থ লোকের আচার-আচরণ এবং প্রচলিত নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ বোঝায়। সুতরাং তাদের আচার-আচরণে অথবা প্রচলিত বিধি-নিষেধে যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহলে এইসব আচার-আচরণ বা বিধি-নিষেধের অবলুপ্তি ঘটে। কারণ, যারা সামাজিক আচার-আচরণ এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে, তাদের জীবনে মূর্ত হয়েই এইসব আচার-আচরণ সার্থকতা লাভ করে। তাছাড়া, এদের আর কোন বাস্তব সত্তা নেই। সুতরাং পুরাতাত্ত্বিক দলিল বা শিলাখণ্ডের মতো সামাজিক কাঠামোকে জাদুঘরে রেখে কালের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

৪.৫ সামাজিক সংহতি ও দ্বন্দ্ব

যখন আমরা মানুষকে সামাজিক জীব বলে বিশেষিত করি, তখন অপরের সঙ্গে মিলেমিশে সহযোগীরূপে বাস

করার উপর অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা না থাকলে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। ডুর্কহেইম এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, বিভিন্ন পরস্পর নির্ভরশীল অংশের সমবায়ে সমাজ গঠিত হয়। এই দিক থেকে সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেহের সুষম গঠনে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি সামাজিক ঐক্যসাধনে সাহায্য করে। অভিন্ন জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধ সমাজস্থ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

সমাজে সহযোগিতার অনুকূল মনোভাবের সঙ্গে সহযোগিতা-বিরোধী মনোভাবও দেখা যায়। একদিকে মানুষ যেমন অপরের সহযোগিতা কামনা করে, অপরদিকে সে তেমনি অপরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়। একদিকে সে যেমন অপরের সহযোগিরূপে কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য সার্থক করতে ব্যগ্র, অপরদিকে সে তেমনি অপরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তাকে দাবিয়ে স্বীয় স্বার্থ-সাধনে উৎসুক। এমনকি, যারা সহযোগিরূপে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে, তদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অবদমিত অবস্থায় দ্বন্দ্বমূলক মনোভাব বিরাজ করতে পারে। মানুষের চরিত্র এমন যে, তার মধ্যে এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী মনোভাব যুগপৎ থাকতে দেখা যায়।

যাঁরা সমাজে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের উপর জোর দেন, তাঁদের মধ্যে মার্ক্স অন্যতম। মার্ক্সীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী অসম ধন-বন্টন এবং আয়ের পার্থক্য সমাজস্থ লোকদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে ভাগ করেছে। এর ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত করে, সামাজিক ঐক্যের বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়। মার্ক্সের মতে, সমাজের গঠনের মধ্যেই বিভেদের এবং বিরোধের বীজ উপ্ত থাকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে ছাপিয়ে বিরোধ প্রাধান্য পায়। যাঁরা বিরোধকেই সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেন, তাঁরা ধর্মীয় বিরোধ, জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং উপদলের মধ্যে বিরোধের উল্লেখ করেন। Anthony Giddens এঁদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ "Whatever the conflict groups on which most emphasis is put, society is seen as essentially *full of tension*—even the most stable social system represents an uneasy balance of antagonistic groupings." অর্থাৎ যাঁরা সমাজের নানারকম দ্বন্দ্বমূলক আচরণের উপর জোর দেন, তাঁদের মতে সমাজ সর্বদা একটা কঠিন 'টানা-পোড়েন'-এর অবস্থায় থাকে। এমনকি, যেসব সমাজ আপাত সুস্থিত বলে মনে হয়, সেইসব সমাজেও শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অস্থির ভারসাম্য দেখতে পাওয়া যায়।

সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করলে পারস্পরিক সম্পর্কের এই দ্বৈত অভিব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। সহযোগিতার নিবিড় বন্ধন সমাজকে নিঃসন্দেহে বেঁধে রাখে। আবার সমাজের সর্বস্তরে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি দৃষ্টি এড়ায় না। সৌরজগতে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ এই উভয় শক্তিই যুগপৎ ক্রিয়াশীল। এদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার এমন একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গ্রহ-নক্ষত্রকে নিজ নিজ কক্ষপথে থেকে আবর্তন করতে সাহায্য করে। কখনও যদি আকর্ষণ-বিকর্ষণে তারতম্য ঘটে এবং এর ফলে ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়, তাহলে সৌরজগতে প্রলয় কাণ্ড ঘটবে। অনুরূপভাবে, সমাজে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা এমনভাবে বিরাজ করে, যাতে সামাজিক ভারসাম্য কোনভাবে বিনষ্ট না হয়। সহযোগিতাই সমাজ-জীবনের মূল ভিত্তি। কোন কারণে সহযোগিতার বন্ধন শিথিল হ'লে সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। মাঝে মাঝে সমাজ বিশ্লিষ্ট হবার আশঙ্কা যে দেখা দেয় না, তা নয়। সব সমাজেই এই ধরনের বিপর্যয় কোন-না-কোন সময় আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ অগ্রাধিকার লাভ করে এবং সমাজে ঐক্যবন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আসল কথা হ'ল, অভিন্ন আদর্শবাদ, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ককে নিয়মিত করে ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে, বিবাদমান গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি এবং সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। অনেক সময় দ্বন্দ্বের ইতিবাচক ভূমিকা থাকে। দ্বন্দ্ব সমাজকে স্রোতহীন বদ্ধ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। দ্বন্দ্বের ফলে অনেক সময় নানাপ্রকার পরিবর্তন

এবং সংস্কার প্রবর্তিত হ'তে দেখা যায়। অতএব সমাজ-জীবনে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা কেবল যে পাশাপাশি বিরাজ করে, তাই নয়। বরং উভয়ের সহাবস্থান অনেক সময় বাঞ্ছনীয়।

৪.৬ বিশ্বায়ন ও স্থানিকতা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি Woodrow wilson বলেছিলেন ঃ "We (i.e. nations) are all participants, whegther we would or not, in the life of thyc world. The interests of all nations are our own also. We are partners with the rest:...citizens of the world." অর্থাৎ আমরা চাই বা না চাই নিখিল বিশ্বের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের নাড়ীর টান গড়ে উঠেছে। এই দেশের স্বার্থ অপর দেশের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। এই চিন্তা মাথায় রেখে তিনি League of nations প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে উদ্যোগী হন। তাঁর চিন্তা ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক। ব্যাপকহারে সারা বিশ্ব জুড়ে যাতে যুদ্ধ না বাধে তার সম্ভাবনা বোধ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

কিন্তু পরবর্তী চার পাঁচ দশক ধরে নানা দিক থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা এত বেশি এবং এত দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছে যে নৃতত্ত্ববিদ Worseley বললেন ঃ "Until our day human society has never existed." অর্থাৎ এতাবৎ কাল মানবসমাজ বলে কিছু ছিল না। এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে অনেকে পৃথিবীকে 'global village' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যে সারা পৃথিবীকে একটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। কোন একটি দেশের পক্ষে অপরাপর দেশের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। একটু খুঁটিয়ে দেখলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণে এই উক্তির সত্যতা বুঝতে পারা যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্রমবর্ধমান পরস্পর নির্ভরশীলতাকে 'বিশ্বায়ন' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়নের গতি এবং প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ, স্থানিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথমেই যে বিষয়টা আমাদের নজরে আসে, সেটা হ'ল 'one world' বা এক বিশ্ব বলা বিভ্রান্তিকর। কারণ, ধনদৌলত ও আয়ের পার্থক্য এবং জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভেদ-রেখা সৃষ্টি করেছে। এক বিশ্বের বদলে আমরা খণ্ডিত বিশ্ব দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর দেশসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। য়ুরোপের শিল্পোন্নত দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশসমূহকে first world আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব য়ুরোপের দেশসমূহকে Second World বলা হ'ত। এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহকে third world বলা হয়। প্রথমোক্ত দেশগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ এবং এইসব দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। অপরপক্ষে, শেষোক্ত দেশগুলো অপেক্ষাকৃত অনেক দরিদ্র এবং এইসব দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানও অনেক নিচু। কেবল তাই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর দেশের মধ্যে শোষক এবং শোষিতের সম্পর্ক বিরাজ করে। এই প্রসঙ্গে বহুজাতিক সংস্থার (Multi-national Corporation) ভূমিকা উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক রকমের বহুজাতিক সংস্থা আছে। কিন্তু এইসব পার্থক্য নির্বিশেষে বহুজাতিক সংস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এরা শিল্পোন্নত দেশসমূহের সংস্থা একটি উদাহরণের সাহায্যে এদের কাজকর্মের ধারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক্ 'ক' হ'ল একটি মার্কিন শিল্প-সংস্থা। মুনাফা বাড়াবার জন্য এই সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের এক বা একাধিক দেশে কারখানা বা আপিস খোলে।

উদ্দেশ্য, তৃতীয় বিশ্বে মজুরী অপেক্ষাকৃত কম থাকার ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সস্তা মজুরের সযোগ ছাড়াও বহুজাতিক সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের কাঁচাল অল্প মূল্যে করায়ত্ত করার সুযোগও পেয়ে থাকে। বহুজাতিক সংস্থা দারা উন্নত ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োগ করার ফলে তৃতীয় বিশ্বের শিল্প-সংস্থা বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। এইভাবেই প্রচ্ছন্নভাবে প্রথম বিশ্বের দেশসমূহের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের শোষক-শোষিতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশাধিকার সুপরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে, অনুন্নত দেশসমূহের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক দিকটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

অবারিত বিশ্বায়ন আরেক দিক থেকেও তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে ক্ষতিকর। বহুল প্রচার মাধ্যমসমূহ শিল্পোন্নত দেশমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর্থিক সচ্ছলতা থাকার ফলে এইসব দেশ শক্তিশালী ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে অনুন্নত দেশসমূহে সাংস্কৃতিক আঘাত আনতে সক্ষম। অনেকে এটাকে media imperialism আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে Anthony Giddens বলেন ঃ "A cultural empire has been established. Third World countries are held to be especially vulnerable, because they lack resources with which to maintain their own cultural independence." অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হওয়ার ফলে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশসমূহের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। শিল্পোন্নত দেশসমূহের মানুষ নানা রকম প্রচারের শিকার হয়ে পড়ে। এই বিপদের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Giddens বলেন ঃ "American television experts, coupled with advertising, propagate a commercialised culture which corrodes local forms of cultural expression" সিনেমা বা টেলিভিসনের পর্দায় যে-সব বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, অনুষ্ঠান বা ছবি দেখানো হয়, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বাণিজ্যিক প্রচারের সুবাদে আমাদের সমাজে নানাপ্রকার অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশ ঘটছে। একদিকে, সনাতন মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখা যায়। অপরদিকে, পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের অনুকরণে ভারতীয় সমাজকে ঢেলে সাজাবার এয়াস প্রায় সর্বস্তরে লক্ষণীয়। সেইজন্য আমাদের কথাবার্তায়, আচার-আচরণে এবং কাজকর্মে অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। এই দিকটি বিবেচনা করলে দেখা যাবে, অবারিত বিশ্বায়ন, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশসমূহের জীবনাদর্শের প্রচার, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংহতিনাশক এবং ক্ষতিকর।

উপসংহারে একটা কথা বলা যায় যে, বিশ্বায়নের গতি অপ্রতিরোধ্য। যানবাহনের অভাবনীয় উন্নতির ফলে দূরত্ব অকল্পনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছানো যায়। খবরাখবর আরও অনেক কম সময়ের ব্যবধানে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এই দিক থেকে পৃথিবীর দেশসমূহ খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই গতি আরও ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, পৃথিবীকে global village আখ্যা দিলেও আমরা সবার সঙ্গে সুখসমৃদ্ধি সমানভাবে ভাগ করে নেবার মানসিকতা অর্জন করতে পারিনি। ধনী দেশ এবং দরিদ্র দেশের মধ্যে ধনবণ্টনে পার্থক্যও কমেনি, বরং বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পরিবর্তে অশান্তি বাড়তে থাকবে। স্থানিক সমস্যা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে ক্রমশ জটিল হবে।

৪.৭ অনুশীলনী

(ক) নিম্নোক্ত চারটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(১) ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(২) আমরা কি অচল, অনড়, স্থিতিশীল সমাজের কথা ভাবতে পারি? বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝায়?

(৪) ব্যক্তিত্ব-গঠনে জীবন-ধারার প্রতীকী উপাদান এবং বাস্তব উপাদানের ভূমিকা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(খ) নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন ঃ

(১) সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা কি পুতুল-নাচিয়ে এবং পুতুলের সম্পর্কের অনুরূপ? বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

(২) দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা সহাবস্থান সমাজ-জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(৩) অবারিত বিশ্বায়ন কি তৃতীয় বিশ্বের নিকট বাঞ্ছনীয়? বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(গ) নিম্নোক্ত বাক্যযুগল থেকে সঠিক বাক্যটি বেছে নিন ঃ

(১) বহুজাতিক সংস্থা বলতে বিভিন্ন জাতির উদ্যোগে গঠিত সংস্থাকে বোঝায়।
যে-কোন দেশের ব্যবসায়িক সংস্থা যখন মুনাফা বাড়াবার জন্য দেশের বাইরে অপর দেশে কলকারখানা বা আপিস স্থাপন করে, তাকে বহুজাতিক সংস্থা বলে।

(২) ব্যক্তিত্ব-গঠনে বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
আমরা কে কি হতে পারব, তা বংশগতি দ্বারা চিহ্নিত হয়ে যায়। কাজেই ব্যক্তিত্ব-গঠনে পরিবেশের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Maclver and page : Society, Macmillan & co. Ltd, London. 1959.

(২) Kingsley Davis : Human Society, The Macmillan Co., New York, 1961.

(৩) Ruth Benedict : Patterns of Culture, Routledge and Kegan Paul Ltd., Broadway House, Carter Lane, Landon E. E. 4, 1961

(৪) Anthony Giddens : Sociology, Polity Press, Blackwell Publishers, Oxford, 1992.

(৫) Parimal B. Kar : Society : A study of Social Interaction, Jawahar Publishers and Distributors, New Delhi, 1994.

(৬) পরিমল ভূষণ কর ঃ সমাজতত্ত্ব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৫।

একক ৫ □ সামাজিক কাঠামো

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ সামাজিক কাঠামো
৫.৪ গোষ্ঠী ও সংগঠন
৫.৪.১ প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠী
৫.৪.২ নির্দেশক গোষ্ঠী
৫.৫ আমলাতন্ত্র
৫.৫.১ আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
৫.৫.২ আমলাতন্ত্রের সমালোচনা
৫.৬ স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী
৫.৭ অনুশীলনী
৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- সামাজিক কাঠামো কাকে বলে .
- সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক সংগঠনের পার্থক্য কি
- বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী
- আমলাতন্ত্র ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি

৫.২ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করব। সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রত্যেক বস্তু বা আদর্শের একটি কাঠামো থাকে। কাঠামোর মাধ্যমেই আমরা তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারি। সেইভাবে প্রত্যেক সমাজেরই একটি কাঠামো থাকে, যাকে আমরা সামাজিক কাঠামো বলতে পারি এবং যার চিরস্থায়ী এবং চিরায়ত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে আমরা সেই সমাজকে বুঝতে পারি। এইদিক দিয়ে দেখলে সামাজিক কাঠামো বলতে একটি ব্যাপক অথচ সরল ধারণা বলে মনে হয়। কিন্তু বিভিন্ন সমাজের সামাজিক কাঠামোর ব্যাখ্যায় সমাজতাত্ত্বিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিভিন্নতা সামাজিক কাঠামোর আলোচনাকে জটিল করে তুলেছে।

৫.৩ সামাজিক কাঠামো

সমাজবিদ্যা হ'ল এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের সমগ্র সামাজিক জীবন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে। অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমাজ নামক যে জটিল বিন্যাস গড়ে ওঠে তাই হ'ল সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু। আর "সামাজিক কাঠামোই হ'ল সমাজবিদ্যার মৌলিক ধারণা বা চালিকা ভাব।" ("The fundamental conception, or directing idea in sociology is that of social structure.")

সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা দেওয়া কিন্তু সহজ নয়। কারণ, এই কাঠামোকে আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। সমাজ যেহেতু মানবিক সম্পর্কসমূহের সংগঠন এবং মানুষই যেহেতু তাকে ভাঙ্গে, গড়ে এবং আমূল বদলে ফেলে সেহেতু আমরা কেবল তার বাহ্যিক দিকটাই দেখতে পাই। অথবা আমরা তার ফলাফলটাই শুধু অনুভব করতে পারি।

সমাজ কাঠামোকে তাই নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কার্ল ম্যান্‌হাইমের মতে, সমাজকাঠামো হ'ল পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ সামাজিক শক্তিসমূহের জাল, যা থেকেই জন্ম হয় আমাদের চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির। মানুষ হ'ল এই কাঠামোর কাঁচামালের মত। তাই র‍্যাডক্লিফ্ ব্রাউন (Radcliffe Brown) প্রতিষ্ঠান-সমূহের দ্বারা নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ মনুষ্যকুলকেই সামাজিক কাঠামো বলে মনে করেন। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ট্যাল্‌কট্ পারসন্স (Talcott parsons) আরও বিশদ করে বলেছেন, সামাজিক কাঠামো হ'ল একটি বিশেষ ব্যবস্থা যার মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কে লিপ্ত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক বিন্যাস, সামাজিক কর্মের ধারকসমূহ এবং গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিটি মানুষের মর্যাদা (Status) ও ভূমিকা (Role)।

সুতরাং, সামাজিক কাঠামো হ'ল বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সমাহার। আবার, প্রতিটি ব্যক্তি যে মর্যাদার অধিকারী এবং যে ভূমিকা পালন করে তাও সামাজিক কাঠামোর অন্যতম উপাদান। এই মর্যাদার তারতম্য বা বৈষম্যকে কেন্দ্র করে সমাজে যে স্তরবিন্যাস ও শ্রেণীকাঠামোর জন্ম হয় তাকে বাদ দিয়েও সামাজিক কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ, সমাজকে একটি সুসংহত ও সুষম ব্যবস্তা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকের অবদানই উল্লেখযোগ্য।

তাই সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা গোষ্ঠী ও সংগঠন নিয়েই আলোচনা করব।

৫.৪ গোষ্ঠী ও সংগঠন

মানুষের জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীজীবনে অতিবাহিত হয়। কোনও না কোনও গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবেই শুধু বেঁচে থাকে না। প্রতিনিয়ত অন্যান্য সহযোগী মানুষের সাথে সে নতুন নতুন গোষ্ঠী সৃষ্টি করে এবং বিচিত্র ধরনের মৌখিক প্রতীকের মাধ্যমে সেইসব গোষ্ঠীর সাথে নিজের একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করে। এরই ফলে প্রতিটি সমাজের ভাষাতেই আমরা এমন কতকগুলি গোষ্ঠীর নাম পাই যেগুলি দৈনন্দিন আন্তর্মানবিক যোগাযোগের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। এইভাবেই আমরা পরিবার, জনতা বা সামাজিক শ্রেণী থেকে শুরু করে বন্ধু-বান্ধবের আড্ডা, দুষ্টচক্র বা বিভিন্ন জাতি, ধর্ম অথবা পেশার ভিত্তিতে গঠিত সংস্থা পর্যন্ত যাবতীয় যৌথ সংস্থাকেই গোষ্ঠী আখ্যা দিয়ে থাকি। এই কারণেই সমাজতাত্ত্বিকেরা গোষ্ঠীজীবন বিশ্লেষণের জন্য গোষ্ঠীর সংজ্ঞা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করার চেষ্টা করে এসেছেন।

পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ যে কোনও মানবিক জোটকেই গোষ্ঠী বলা যায় ("...by group we

mean any collection of human beings who are brought into social relationships with one another.") প্রধানত দুটি শর্ত পূরণ হ'লে যে কোনও জনসমষ্টি সামাজিক গোষ্ঠী বলে পরিগণিত হ'তে পারে। প্রথমত, জনসমষ্টির অন্তর্গত মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার, কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে যেন অবহিত থাকে। দ্বিতীয়ত, সংঘের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কেও প্রত্যেকের সচেতন থাকা প্রয়োজন। সুতরাং, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যসাধনে সচেতনভাবে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া জানার এবং তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাকলেই সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হ'ল বলা যায়।

অতএব সব গোষ্ঠীরই অন্তত একটি কাঠামো বা সংগঠন (বিধিনিয়ম ও আচার-ব্যবহার এর অন্তর্গত) এবং সদস্যদের চেতনায় একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। এই অর্থে, পরিবার, গ্রাম, জাতি (Nation), শ্রমিক-সঙঘ বা রাজনৈতিক দল সামাজিক গোষ্ঠী। পক্ষান্তরে, যে জনসমষ্টির সংগঠন নেই এবং যার সদস্যরাও গোষ্ঠীজীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন তা হ'ল আধা-গোষ্ঠী (quasi-group)। সামাজিক শ্রেণী, মর্যাদা-গোষ্ঠী, বয়োগোষ্ঠী, জনতা ইত্যাদি আধা-গোষ্ঠীর উদাহরণ। তবে কোন একটি আধা-গোষ্ঠীর পক্ষে নিজেকে একটি সুসংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত করা সম্ভব।

৫.৪.১ প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠী

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীতে জনসংখ্যার বণ্টন এবং ঐসব গোষ্ঠীর আয়তন, সংখ্যা ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য সমাজ-কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মরিস্ গিনজবার্গের (M. Ginsberg) মতে, সমাজ-কাঠামো পর্যালোচনার অর্থই হ'ল "সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখ্য রূপগুলির বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগ করা।"

সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা হয়ে থাকে। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনুসারে প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগটিই সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯০১ সালে প্রকাশিত 'সোশ্যাল অর্গানাইজেশান্' (Social Organisation) গ্রন্থে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী চার্লস্ কুলী (C. H. Cooley) সর্বপ্রথম 'প্রাথমিক গোষ্ঠী' ও 'অন্যান্য গোষ্ঠী'র মধ্যে পার্থক্য দেখান। পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিকেরা এই অন্যান্য গোষ্ঠীকেই 'গৌণ-গোষ্ঠী' আখ্যা দিয়েছেন।

কুলীর মতে, প্রাথমিক গোষ্ঠী বলতে সেইসব গোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল মুখোমুখি সম্পর্ক ও সমবায়। একাধিক অর্থে তারা প্রাথমিক হ'লেও প্রধানত এই অর্থেই তারা প্রাথমিক যে তারা মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ও আদর্শ গঠন করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। তিনি লিখেছেন, "প্রাথমিক বলতে আমি সেইসব গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে চেয়েছি ঘনিষ্ঠ, মুখোমুখি পরিচয়ভিত্তিক সঙঘবদ্ধতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা যার বৈশিষ্ট্য। ঘনিষ্ঠ সযোগের একটি মনস্তাত্ত্বিক ফল হ'ল ঃ সমগ্রের মধ্যে ব্যক্তি মিশে যায়, যাতে অন্তত বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থ এবং গোষ্ঠীর সমষ্টিগত জীবন ও লক্ষ্য এক হয়ে যায়...এতে জড়িত থাকে একধরনের সংবেদ ও পারস্পরিক একাত্মতা, 'আমরা' এই শব্দটির মাধ্যমে যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়।" ("By primary groups I mean those characterized by intimate face-to-face association and co-operation. The result of intimate association, psychologically, is a certain fusion of individualities in a common whole, so that one's very self, for many purposes at least, is the common life and purpose of the group... it involves the sort of sympathy and mutual indentification for which "we" is the natural expression.")

কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) বিশ্লেষণ করে কুলীর প্রাথমিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি শর্তের ইঙ্গিত খুঁজি পেয়েছেন, যথা—সদস্যদের মধ্যে দৈহিক বা বাসস্থানগত নৈকট্য, গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতা এবং সম্পর্কের স্থায়ী চরিত্র। এই শর্তানুসারে সমাজে অসংখ্য প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যেমন—পরিবার, খেলার দল, বন্ধুবান্ধবের

দল, আড্ডার দল, পাঠচক্র, পাড়ার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী, দুষ্টচক্র, গ্রাম বা পল্লী, উপজাতীয় পরিষদ ইত্যাদি। মাকাইভার ও পেজের মতে এই গোষ্ঠীগুলিই হ'ল সবচেয়ে বেশি সর্বজনীন চরিত্রের, কারণ যে কোনও সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রে রয়েছে এই ধরনের মুখোমুখি প্রাথমিক গোষ্ঠী। পরিবাররূপে এই গোষ্ঠী আমাদের কাছে সমাজের রহস্য উন্মোচন করে, আবার খেলার সাথীদের সঙ্গে থেকেই আমরা সামাজিকতার প্রথম টান অনুভব করি।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে মানবিক সম্পর্কের যে নিবিড়তা বা অন্তরঙ্গতা আছে, বৃহদায়তন গোষ্ঠীতে বা যে সমস্ত গোষ্ঠীতে আনুষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক দিক প্রাধান্য লাভ করে তাতে সেরূপ অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায় না। এগুলিকেই বলা হয় গৌণ গোষ্ঠী। এরা আকৃতিতে বৃহৎ, এদের উদ্দেশ্যেরও বিশিষ্টতা আছে এবং সভ্যদের ভূমিকাও মোটামুটি সীমিত ও নৈর্ব্যক্তিক। মুখোমুখি গোষ্ঠীতে মানুষ যেমন একটা সামগ্রিক তৃপ্তি পায়, গৌণ গোষ্ঠীগুলিতে তা সম্ভব হয় না। এখানে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রও উদ্দেশ্যর দ্বারা নির্দিষ্ট, তার বাইরে সভ্যদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকে না উদাহরণস্বরূপ, ক্রেতা ও বিক্রেতা, ছাত্র ও শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী ও নাগরিক, নির্বাচন প্রার্থী ও নির্বাচকদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা যায়।

আধুনিক সভ্য সমাজে গৌণ গোষ্ঠীগুলিরই আধিক্য ও প্রাধান্য দেখা যায়। সভ্য সমাজের মানুষের নানাবিধ উদ্দেশ্যে ও আগ্রহ নানারূপ গৌণ গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। যেমন, বণিকসভা, শ্রমিক সংঘ, সরকারী দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, নৃত্যশালা, রঙ্গমঞ্চ, বৃত্তিমূলক সমিতি, কর্পোরেশন বা বিধিবদ্ধ সংগঠিত সমিতি ইত্যাদি। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, যে সকল গোষ্ঠীতে তাদের সভ্যরা ব্যক্তি হিসেবে নয়, শ্রেণীগতভাবে, পরোক্ষ সহযোগিতা ও চুক্তির ভিত্তিতে মিলিত হয় এবং যেখানে নৈর্ব্যক্তিকতা প্রাধান্য লাভ করে তাদের গৌণ গোষ্ঠী বলা যায়। আর যে সম্পর্কের ভিত্তিতে এইসব গোষ্ঠী তৈরি হয় তাদের বলা হয় গৌণ-সম্পর্ক।

অবশ্য, প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সর্বদা সুস্পষ্ট নয়। কখনও কখনও দূরবর্তী মানুষের সাথেও নেপথ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। যেমন, বিভিন্ন দেশের গুণীজনদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন হয়। কিংসলে ডেভিসের মতে শুধু প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যেই নয়, অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও একটা "আমরা" মনোভাব কিছু না কিছু পরিমাণেই থাকে। কারণ, এই মনোভাব না থাকলে বৃহৎ গৌণ গোষ্ঠীগুলিও তাদের সংহতি বজায় রাখতে পারত না। তাছাড়া, যে প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক গোষ্ঠীর জন্ম হয় তা শুধু পরিবার বা খেলার সাথীদের মধ্যেই কার্যকর থাকে না; অত্যন্ত সংগঠিত ও জটিল বৃহদায়তন গোষ্ঠীসমূহের মধ্যেও সমানভাবে কার্যকর থাকে। আনুষ্ঠানিক সমাজকাঠামোর মধ্যে যে ছোট ছোট প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তা আধুনিক শিল্প-সমাজতত্ত্ব (Industrial Sociology) গবেষণার মধ্যে প্রমাণ করেছে। সুতরাং, দৈহিক দূরত্ব নয়, সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা ও মানসিক একাত্মতাই গোষ্ঠীর চরিত্র বিচারের প্রধান মাপকাঠি হওয়া উচিত।

এই সমস্যা সত্ত্বেও প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলিকে নির্দেশ করা যায়।

প্রথমত, দৈহিক নৈকট্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট্য। দৈহিক নৈকট্য থাকলে ভাবের আদান-প্রদান সহজতর হয়, যদিও তা প্রধানত নির্ভর করে গোষ্ঠীর সংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। অন্যদিকে গৌণ গোষ্ঠীগুলির সভ্যদের অধিকাংশই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ তাদের দৈহিক নৈকট্য নেই।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক গোষ্ঠীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্ষুদ্র আয়তন। গোষ্ঠী ক্ষুদ্র হ'লে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা সুবিধা হয় এবং গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু, প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় গৌণ গোষ্ঠীতে সদস্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। যেমন, জাতি (Nation)-বিপুল তার জনসংখ্যা। অবশ্য, বিশেষ পরিস্থিতিতে নাগরিকগণ যখন জাতির প্রতি চরম আনুগত্য প্রদর্শন করে তখন সেখানে প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পায়।

তৃতীয়ত, গৌণ গোষ্ঠীর তুলনায় প্রাথমিক গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব বেশি। প্রত্যক্ষ পরিচয়ভিত্তিক সম্পর্কে নানারকম

আবেগ ও স্মৃতি জড়িয়ে থাকে বলে প্রাথমিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সম্পর্ক দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকার সম্পর্ক কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও কালক্রমে উদ্দেশ্য সিদ্ধি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, গৌণ গোষ্ঠী চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বলে নির্দিষ্ট শর্তের মধ্যেই তার সদস্যদের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে, নির্দিষ্ট প্রয়োজন মিটে যাবার পর পরিচয়ের বন্ধন সেখানে শিথিল হয়ে পড়ে।

চতুর্থত, গোষ্ঠীর আয়তন যত বাড়বে তার সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার ধরনও প্রত্যক্ষ চরিত্রের না হয়ে পরোক্ষ চরিত্রের হয়ে উঠবে। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে সদস্যরা একসঙ্গে কাজ করে, গান শোনে, উপাসনা করে, আলোচনা করে বা সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু, বড় বড় সংগঠনে মূলত গোষ্ঠীর লক্ষ্যই সভ্যদের একসুতোয় বেঁধে রাখে। সেখানে সভ্যরা অন্যের জন্য কাজ করে; একসঙ্গে নয়, অর্থাৎ সধারণ লক্ষ্য পূরণে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে।

পঞ্চমত, শ্রম বিভাগ ও কর্তৃত্বের বিভাজনের ফলে প্রাথমিক গোষ্ঠী থেকে গৌণ গোষ্ঠীতে যে উত্তরণ ঘটে তাকে হেনরী মেইন (Henry Maine)-এর কথায় 'মর্যাদা থেকে চুক্তিতে' (Status to contract) উত্তরণ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সম্পর্ক যেহেতু স্বার্থ-প্রণোদিত নয় সেহেতু এই প্রকার গোষ্ঠী স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে, আনুষ্ঠানিকভবে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নয়। কিন্তু বৃহদায়তন গৌণ গোষ্ঠীতে বিভিন্ন সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করা প্রয়োজন, অর্থাৎ স্পষ্ট বা অনুচ্চারিতভাবে চুক্তিভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। ফলে সেখানে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও আনুষ্ঠানিক হ'তে বাধ্য। সুতরাং, গৌণ গোষ্ঠী মানেই বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত সংস্থা।

পরিশেষে, প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পর্ক একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। কিন্তু, বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির নির্ভরতা নৈর্ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণ, পরোক্ষ যোগাযোগ এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক গোষ্ঠী তার সদস্যদের কাছ থেকে পারস্পরিক সহমর্মিতা, ভালবাসা ও সহৃদয়তা দাবী করে; কিন্তু গৌণ গোষ্ঠীর এমন কোনও চাহিদা নেই। সদস্যরা তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করল কি না সেটাই তার বিচার্য বিষয়। তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে তার কোনও আগ্রহ নেই।

শিল্পায়ন, নগরায়ন ও শ্রম বিভাগের প্রসারের ফলে আধুনিক সমাজ যত বেশি জটিল হয়ে উঠেছে ততই বেশি করে পরোক্ষ পরিচয়ভিত্তিক, আনুষ্ঠানিক ও বিধিবদ্ধ গৌণ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, নৈর্ব্যক্তিকতা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে মানসিক দূরত্ব ও হতাশাবোধ। সমাজকে সজীব করে তুলতে তাই প্রয়োজন গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক সম্পর্কজালের বিস্তার। মানবিক সম্পর্ক বিদ্যা (Human Relations School) এ বিষয়ে আলোকপাত করে সংগঠন ও শিল্পসমাজতত্ত্বে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তবে প্রাথমিক গোষ্ঠী যেহেতু সমাজের 'নিউক্লিয়াস' সেহেতু আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বরের মধ্যেও প্রত্যক্ষ পরিচয়ভিত্তিক সম্পর্ক আপন ঐশ্বর্যে মহীয়ান হয়ে উঠবেই।

৫.৪.২ নির্দেশক গোষ্ঠী

নির্দেশক গোষ্ঠীর ধারণা সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করেন হার্বার্ট হাইম্যান (Herbert Hyman)। পরবর্তীকালে রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton), র‍্যাল্‌ফ্ এইচ. টার্নার (Ralph H. Turner). তামোৎসু শিবুতানি (Tamotsu Shibugtani), এলিনর সিঙ্গার (Eleanor Singer) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকরা আরো ব্যাপকভাবে তা প্রয়োগ করেন। অবশ্য, প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক জর্জ এইচ. মিড্ (George Herbert Mead) তাঁর "Mind, Self, and Society" গ্রন্থে যে "সাধারণীকৃত অপরপক্ষ" (generalized other)-এর ধারণা প্রচার করেন তাকেই নির্দেশক গোষ্ঠী সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বসূরী বলা যায়। মিড্-এর মতে, সামাজিকীকরণের সর্বশেষ পর্যায়ে ব্যক্তি 'সাধারণীকৃত অপরপক্ষ' বা সমাজের সাধারণ বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও বিধিনিয়মের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থ করতে সক্ষম হয় এবং ক্রমবর্দ্ধমান মিথষ্ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। তেমনিভাবে

ভূমিকা সংক্রান্ত তত্ত্বের (Role theory) প্রবক্তারাও দেখিয়েছেন যে, সমাজে বিভিন্ন মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সামাজিক কাঠামোর প্রত্যাশা পূরণ করেন তার অন্যতম হ'ল "দর্শকমণ্ডলী" (audiences) বা নির্দেশক গোষ্ঠী। এই দর্শকমণ্ডলী বা গোষ্ঠী বাস্তব বা কল্পিত হ'তে পারে, প্রকৃত গোষ্ঠীতে পরিণত হ'তে পারে অথবা নিছকই একটি সামাজিক বর্গ হিসেবে অবস্থান করতে পারে এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি তার সদস্যপথ যেমনি লাভ করতে পারে তেমনি শুধুই সদস্যপদ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। তবে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আসন কথা হ'ল এই ধরনের গোষ্ঠীর কাছে ব্যক্তি যে ধরনের প্রত্যাশা আরোপ করে তাই আবার তার আচরণকে পরিচালিত করে।

নির্দেশক গোষ্ঠীর ধারণাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, বাস্তবে আমরা যে গোষ্ঠীর সদস্য সেই গোষ্ঠীর রীতিনীতি বা নিয়মকানুনের সঙ্গে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা না করে, যে গোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভে আমরা আগ্রহী অথবা যার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলতে চাই, তারই রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও নিয়মকানুনের সঙ্গে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করি। এই দ্বিতীয় প্রকাশ গোষ্ঠীকেই নির্দেশক গোষ্ঠী বলা হয়। যেমন, নিম্নতর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত উচ্চতর শ্রেণীর আদব-কায়দা অনুসরণ করা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত উচ্চতর শ্রেণীকে নীচুতলার মানুষের নির্দেশক গোষ্ঠী বলে গণ্য করা যায়।

নির্দেশক গোষ্ঠী কোনও প্রকৃত গোষ্ঠী নাও হ'তে পারে। এমনকি এটি একটি কল্পিত গোষ্ঠীও হ'তে পারে। তবে, যে কোনও গোষ্ঠীই ব্যক্তির কাছে নির্দেশক গোষ্ঠী হয়ে উঠতে পারে যদি সেই গোষ্ঠী সম্পর্কে তার ধারণা, তা বাস্তবসম্মত হোক বা না হোক, তার সামাজিক পরিস্থিতি বা নিজের সম্পর্কে মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে গড়ে ওঠে। যেমন, সমাজে যে সব ব্যক্তি তাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করতে চায় তাদের মধ্যে সাধারণত যে সমস্ত উচ্চতর শ্রেণীর সান্নিধ্য তারা লাভ করতে চায় বা যাদের সঙ্গে তারা একাত্ম হতে চায়, সেইসব শ্রেণীর বাচনভঙ্গী ও কেতা বা আদব-কায়দা অনুকরণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাস (M. N. Srinivas)-এর 'উচ্চজাতানুগমন' (Sans-kritization) সংক্রান্ত ধারণার উল্লেখ করা যায়। শ্রীনিবাসের মতে, 'উচ্চজাতানুগমন' এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ভারতীয় হিন্দু সমাজে নীচু বর্ণ বা জাত (caste) ও উপজাতীয় গোষ্ঠী প্রায়সই কোন উঁচু জাতের এবং বিশেষ করে দ্বিজ ব্রাহ্মণদের প্রথা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ভাবাদর্শ এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতি অনুকরণ করে এবং কালক্রমে জাতপাতের কাঠামোয় নিজেদের জন্য উচ্চতর মর্যাদা দাবি করে। বর্ণ-কাঠামো অনুযায়ী এই দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু, বাস্তবে দুই বা তিন পুরুষ ধরে একাদিক্রমে এই প্রচেষ্টার ফলে অনেক সময় দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাবেকি জাতপাতভিত্তিক সমাজে সামাজিক সচলতার সুযোগ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে নীচু জাতের কাছে উঁচু জাতগুলি নির্দেশক গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করে।

সমাজতত্ত্বে নির্দেশক গোষ্ঠীকে ব্যাপকতর অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। কেননা যে সব গোষ্ঠীর সদস্য আমরা নই বা যাদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই কেবল তারাই নয়, যেসব গোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা আদৌ নিজেদের মেলাতে চাই না সেইসব গোষ্ঠীও আমাদের নির্দেশক গোষ্ঠী হিসেবে বর্তমান থাকতে পারে।

নিম্নলিখিত কোনও একটি পরিস্থিতি বর্তমান থাকলেই বিশেষ কোনও একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে অপর একটি গোষ্ঠী নির্দেশক গোষ্ঠী হয়ে উঠতে পারে ঃ

(১) কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন অপর কোনও শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভের জন্য সচেষ্ট থাকে তখন আকাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠীকে ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নির্দেশক গোষ্ঠী বলা যায়।

(২) যখন প্রথম গোষ্ঠীর সদস্যরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের মত হ'তে চেষ্টা করে তখন এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি প্রথম গোষ্ঠীর নির্দেশক গোষ্ঠী বলে বিবেচিত হয়। এখানে প্রথম গোষ্ঠী দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মত হ'তে

চায় কারণ তার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভ করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত অব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আচার-আচরণ অনুকরণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, কারণ তারাও ব্রাহ্মণদের মত সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতে চায়।

(৩) যখন প্রথম গোষ্ঠীর সদস্যরা দ্বিতীয় গোষ্ঠী থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য দেখেই সন্তুষ্টি লাভ করে এবং এমনকি ঐ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয় তখন দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে প্রথম গোষ্ঠীর নির্দেশক গোষ্ঠী বলা হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ নাগরিকরা কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করে। বস্তুতপক্ষে, অশ্বেতাঙ্গ নাগরিকরা আছে বলেই শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাছাড়া, শ্বেতাঙ্গ মানে তো শুধু গায়ের রং সাদা হওয়া নয়, এর সঙ্গে উচ্চতর সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত আছে। সেই কারণেই শ্বেতকায়দের গোষ্ঠী বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ধরে রেখে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের থেকে নিজেদের পার্থক্য বজায় রাখে। নির্দেশক গোষ্ঠীর ধারণা সমস্যাটিকে বুঝতে সাহায্য করে।

(৪) কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি গোষ্ঠী হয়ত সত্যি অপর কোনও গোষ্ঠীর মত হ'তে বা তার থেকে পৃথক থাকতে বিশেষ কোন প্রয়াস নেয় না, অথবা অপর কোনও গোষ্ঠীভুক্তও হ'তে চায় না, কিন্তু অপর একটি গোষ্ঠীর কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের কাজকর্মের মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে প্রথম গোষ্ঠী দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে নির্দেশক গোষ্ঠী বলে গণ্য করে। যেমন, কলেজের অশিক্ষক কর্মচারিবৃন্দ অনেক সময় অধ্যাপকদের কাজ বা হাজিরার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের কাজ বা হাজিরার মূল্যায়ন করেন। এখানে অধ্যাপকরা হলেন শিক্ষাকর্মীদের নির্দেশক গোষ্ঠী।

নির্দেশক গোষ্ঠী সংক্রান্ত আচরণ-তত্ত্বে তাই বলা হয়, কোনও একটি গোষ্ঠীকে তুলনার মানদণ্ড বা নির্দেশক হিসেবে তখনই গ্রহণ করা যায় যখন : (ক) নির্দেশক গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে (খ) বিকল্প গোষ্ঠীর সদস্যভুক্তি নিয়ে অসন্তোষ বর্তমান, (গ) কোনও গোষ্ঠীর কাছ থেকে সম্ভাব্য পুরস্কার লাভের ধারণা সৃষ্টি হয়, (ঘ) অন্য গোষ্ঠীর আচরণের মান সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব, এবং (ঙ) গোষ্ঠীতে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্যদের (significent others) অন্তর্ভুক্তি ধারণা করা সম্ভব।

৫.৫ আমলাতন্ত্র

আধুনিক শিল্প-সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল অসংখ্য বৃহদায়তন ও আনুষ্ঠানিক গৌণ গোষ্ঠীর উপস্থিতি। আর এই গোষ্ঠী বা সংগঠনগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে আমলাতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করেছে। তাই আধুনিক সমাজ ও তার অন্তর্গত গৌণ সংগঠনগুলির প্রকৃতি বুঝতে হ'লে 'আমলাতন্ত্র' কথাটিকেও ভালোভাবে বোঝা দরকার।

ইংরেজী ভাষার আমলাতন্ত্রকে বলা হয় 'ব্যুরোক্র্যাসী' (Bureaucracy)। এই শব্দটির স্রষ্টা মঁসিয়ে দ্য গুর্নে (Mousieur de Gournay)। ১৭৪৫ সালে তিন 'ব্যুরো' (Bureau), যার অর্থ অফিস ও লেখার টেবিল, এবং 'ক্র্যাসী' (cracy), যার অর্থ শাসন করা, এই দুটির মিলনে ব্যুরোক্র্যাসী বা আমলাতন্ত্র শব্দ চয়ন করেন। এই অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ হল রাজকর্মচারীদের শাসন। প্রথম প্রথম সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরই আমলাতন্ত্রের বলে চিহ্নিত করা হ'ত। কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণভাবে যে কোনও বড় সংগঠনের কাঠামো বোঝাতেই আমলাতন্ত্রের ব্যবহার স্বীকৃত হয়। গণপ্রশাসনে আমলাতন্ত্রকে সংগঠনরূপে বিচিত্র করা হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরা একে এক বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী ব'লে অভিহিত করেন। আর রাজনীতিবিদেরা একে কেন্দ্রীয় শক্তি বলে মনে করেন। গোড়া থেকেই অবশ্য আমলাতন্ত্র শব্দটি নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। দ্য গুর্নে পদস্থ কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে 'ব্যুরোম্যানিয়া' নামে রোগ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সাধারণ আলাপচারিতায় আমরা আমলাতন্ত্রকে দীর্ঘসূত্রিতা, অযোগ্যতা, অপচয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সমর্থক বলে গণ্য করি।

তবে আমলাতন্ত্র নিয়ে যাঁরা লেখালেখি করেছেন তাঁদের অনেকেই এই ব্যবস্থাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁদের মতে এটি হ'ল যত্নশীলতা, সূক্ষ্মতা এবং কার্যকরী প্রশাসনের আদর্শ রূপ। বস্তুতপক্ষে, এখানে সমস্ত কাজ কঠোর নিয়মানুসারে পরিচালিত হয় বলে আমলাতন্ত্রকেই তাঁরা যে কোনও সংগঠনের তুলনায় সর্বাধিক দক্ষ ব'লে গণ্য করেন। যে তিন জন চিন্তাবিদ্ আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সনাতন চিন্তাধারার উৎস সেই মার্কস্ (Karl Marks), ম্যাক্স হেবার (Max Weber) এবং মিচেলস্ (Robert Michels) এর মধ্যে হেবারের আলোচনাই কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়েছেন। হেবার কিন্তু উপরোক্ত পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আধুনিক সমাজে আমলাতন্ত্রের প্রসার অবধারিত, কারণ বৃহদায়তন সমাজব্যবস্থার প্রসাসনিক চাহিদা পূরণের জন্য একমাত্র উপায় হ'ল আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিকাশ ঘটানো। তবে, আধুনিক সমাজজীবনের পক্ষে আমলাতন্ত্রের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে হেবার সচেতন ছিলেন।

আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল সমাজ-কাঠামোর পৃথকীকরণ। বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা, প্রতিষ্ঠান ও স্বার্থের পৃথকীকরণ এই সমাজে লক্ষ্য করা যায়। অনানুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কভিত্তিক এবং যৌথ অংশীদারী মনোভাবসম্পন্ন প্রাথমিক গোষ্ঠীসমূহের পক্ষে এই পৃথকীকরণের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এই কারণেই বৃহদায়তন সংগঠনের প্রয়োজন হয়। এইসব সংগঠনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পদ, মানবশক্তি ও অন্যান্য সহায়-সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ'তে হয়। দেখা দেয় নানা নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রশাসনিক সমস্যা, যা মেটাতে গেলে প্রয়োজন হয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সমন্বয়মূলক পারদর্শিতা। ফলে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করে নিয়মাবলী প্রয়োগের জন্য ক্রমোচ্চ কাঠামো গড়ে তুলতে হয়। এই কাঠামোই হ'ল আমলাতন্ত্র।

হেবারের মতে, উন্নত অর্থব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের উদ্ভবের অন্যতম শর্ত। কারণ, অর্থনীতির ভিতর শক্তিশালী হ'লেই পদস্থ কর্মচারীদের ভাল বেতন ও আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। আমলাতান্ত্রিক প্রসাসনের আর একটি পূর্বশর্ত হ'ল স্থিতিশীল কর-ব্যবস্থা। তবে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিই আমলাতন্ত্রের উদ্ভবের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ইউরোপে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা গঠনের পর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে গণতন্ত্রের সুফল সুনিশ্চিত করার জন্য আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ, আমলাতন্ত্র বিশেষ সুবিধাদানের নীতির বিরোধিতা করে। এই প্রসঙ্গেই প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মনীতি এবং ধনতান্ত্রিক চেতনার কথা উল্লেখ করতে হয়। উভয়ে মিলে এমন এক সমাজ-চেতনার সৃষ্টি করে যা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, ব্যক্তিগত নিয়মানুবর্তিতা, কৃৎকৌশল এবং আমলাতান্ত্রিক সংগঠন সৃষ্টির সহায়ক হয়। অন্যদিকে, তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার জগতে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে সুদক্ষ সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সংগঠনই হল আমলাতন্ত্র।

হেবার অবশ্য আমলাতন্ত্রের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি আমলাতন্ত্রকে আধিপত্য বা কর্তৃত্বের রূপ হিসেবে আলোচনা করেছেন। তার মতে আমলাতন্ত্র যুক্তিসহগত ও আইনী প্রাধিকারের (Rational-legal authority) অন্যতম উদাহরণ। কারণ, আমলাদের মর্যাদা, অধিকার ও কর্তব্য এবং শাসক সাসিত ও সহকর্মীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রাধিকারীর যে মর্যাদা স্থির করে তার অধিকারী হওয়ার ফলেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি ঐ প্রাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। আবার বিধিবদ্ধ নিয়ম সেরকম নির্দেশ করে বলেই অধস্তন ব্যক্তিরা উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের আদেশ শিরোধার্য করে। অর্থাৎ, আমলাতান্ত্রিক প্রাধিকার পদাধিকারী ব্যক্তির উপরে নয়, নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ নির্দিষ্ট পদের উপরেই নির্ভরশীল।

৫.৫.১ আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

আদর্শ রূপ হিসেবে হ্বেবার আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন :

(১) অফিসের কাজ নিরবচ্ছিন্ন এবং নিয়মের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়।

(২) কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট থাকে। সুবিন্যস্ত শ্রমবিভাগের ফলে যার যা দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকে তা পালনে সে দায়বদ্ধ থাকে। এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত প্রাধিকার তাকে দেওয়া হয় এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হস্তক্ষেপ প্রয়োগ করা যাবে তাও আইনে নির্দিষ্ট করা থাকে।

(৩) স্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে অফিস সংগঠিত হয় এবং অভিযোগ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি অধস্তন অফিস তার ঊর্ধ্বতন অফিসের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

(৪) অফিসের কার্যাবলী আইনগত বা কৃৎকৌশলগত নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালিত হয়। এজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়।

(৫) বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েই আমলাতন্ত্রের সদস্য হওয়া যায়।

(৬) প্রশাসনিক কর্মিবৃন্দ উৎপাদন বা প্রশাসনের উপকরণসমূহের মালিকানা থেকে বঞ্চিত থাকবে। অফিস কোনও কর্মচারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'তে পারবে না। অর্থাৎ, সংগঠনের সম্পদ সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(৭) অফিসার অফিসকে আত্মসাৎ করতে পারেন না।

(৮) অফিসারেরা চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। তাঁরা আর্থিক বেতন পান অবসরকালীন ভাতা বা পেনশন ভোগ করেন। পদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুসারে বেতন প্রদান করা হয়। আমলার জীবনকে অফিসাররা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

(৯) প্রশাসনিক কাজ, সিদ্ধান্ত ও নিয়মাবলী লিখিত দলিল হিসেবে নথিবদ্ধ করা হয়।

আদর্শরূপ হিসেবে আমলাতন্ত্রের স্থায়িত্ব, শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং নির্ভরযোগ্যতা হ্বেবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় এর অধিকতর দক্ষতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন। কারণ এই ধরনের সংগঠন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কাজের উৎসাহকে সুন্দরভাবে সাংগঠনিক কাজ বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। তাছাড়া আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে ব্যক্তিগত স্বার্থ, আবেগ ও অনুভূতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া হয় বলে তার দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। তবে যুক্তিসঙ্গত সংগঠন হ'লেও আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই যে তার বিভিন্ন উপাদানের খুঁটিনাটি সম্পর্কগুলির ব্যাপারে অবহিত থাকেন তা কিন্তু নয়। কারণ সংগঠনের কর্মিবৃন্দ যে যার নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

৫.৫.২ আমলাতন্ত্রের সমালোচনা

আমলাতন্ত্রের দক্ষতা নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংগঠনের সার্বিক লক্ষ্য এবং নিয়মমাফিক কাজ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে মানবিক চাহিদা পূরণের পথেই দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে। হ্বেবারের মনেও এই সম্পর্কে সংশয় ছিল। দক্ষতা বাড়লেই যে মানুষের সুখ বৃদ্ধি পাবে অথবা কল্পরাজ্যের দিকে অগ্রগতি ঘটবে এমন কোন সমীকরণ তিনি করেন নি। বরং এমন আশঙ্কাই করেছেন যে, আমলাতন্ত্রের ফলে গড়ে ওঠা চরম যৌক্তিকতার লৌহশৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মানুষই একদিন মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্যর্থ প্রয়াস চালাবে।

সুতরাং সমাজের পক্ষে আমলাতন্ত্রের সবটাই মঙ্গলজনক নয়। মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট মার্টন (R. K. Merton)এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আমলাতন্ত্রের দুষ্ক্রিয়ার (Dysfunction's of bureau-

cracy) কথা বলেছেন। মার্টনের মতে শৃঙ্খলা, আনুষ্ঠানিকতা, নিয়ম-প্রীতি যখন বড় হয়ে ওঠে তখন সংগঠনের মূল মানবিক উদ্দেশ্যই আড়ালে চলে যায়। ফলে দেখা দেয় লাল ফিতের বাঁধনের সমস্যা (red tapism)। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা একটু ব্যক্তিগত মনোযোগ ফেলে সহজেই মেটানো যেত, সেসব সমস্যাও নিয়মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনকারী আমলাদের ফাইলবন্দী হয়ে থাকে। অথচ, জনসেবার লক্ষ্য পূরণ না হ'লেও ক্ষমতাসচেতন, আত্মগর্বী আমলাতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হ'তেই থাকে। মার্কসের মতে, রাষ্ট্রযন্ত্র যদি শোষণের যন্ত্র হয় তবে তার অন্যতম যন্ত্রী হল আমলাতন্ত্র।

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরও যেসব অভিযোগের তীর বর্ষিত হয় সেগুলি হ'ল ঃ

(১) আমলাতান্ত্রিক কাঠামো স্থিতিশীল পরিবেশের উপযোগী, কিন্তু অস্থিতিশীল পরিবেশের ক্ষেত্রে অনুপযোগী ;

(২) রুটিনমাফিক কাজের উপযুক্ত হ'লেও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টিশীল কাজের পক্ষে উপযোগী নয় ;

(৩) নিয়মানুবর্তিতার প্রাধান্যের কারণে এই কাঠামোয় অনমনীয়তা এবং উপায়কে উদ্দেশ্যে পরিণত করার প্রবণতা দেখা যায় ;

(৪) এখানে জনসেবার তুলনায় রীতিনীতি বেশি প্রাধান্য পায়।

সমালোচনা সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে যে, আধুনিক সমাজ প্রকারান্তরে আমলাতান্ত্রিক সমাজই। বস্তুতপক্ষে পুঁজিবাদী সমাজেই হেবার-কল্পিত আমলাতান্ত্রিক আদর্শরূপের সবচেয়ে বেশি নিখুঁত আবির্ভাব ঘটে। সমাজের নানা ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের সম্প্রসারণের ফলেই আধুনিক সমাজে আমলাতান্ত্রিকতার প্রসার ঘটেছে।

সাম্প্রতিককালে পিটার ব্লাউ (P. M.Blau)-এর মত গবেষকরা আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত মুখোমুখি সম্পর্কভিত্তিক প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, এই ধরনের গোষ্ঠী যে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যদের উদ্যোগ ও দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে তোলে তাও তাঁরা প্রমাণ করেছেন। আধুনিক সংগঠনের সর্বস্তরের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক জাল বিস্তার লাভ করে। উঁচুতলায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ অনেক সময় ক্ষমতার কাঠামোয় আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আপাতদৃষ্টিতে পরিচালন বোর্ড ও অংশীদারদের মিলিত সভা নীতি নির্ধারণ করলে আদতে মুষ্টিমেয় পরিচালকই ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে বোর্ডের সভায় তা অনুমোদন করিয়ে নেন। তবে আনুষ্ঠানিক বর্জিত প্রক্রিয়াগুলো সংগঠনের কার্যকারিতা বাড়ায় না কমায় তা নির্ণয় করা সহজ নয়। নিরানন্দ কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির কাছে এগুলো সন্তোষজনক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনুষ্ঠান-বহির্ভূত যোগাযোগ সামগ্রিকভাবে সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে। অন্যদিকে এই পদস্থ কর্মচারীরাই ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগকে মূলধন করে সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করতে পারেন। এই বিপরীতধর্মিতাই আধুনিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য।

৫.৬ স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী

সমাজতাত্ত্বিকরা অনেক সময় এটা ধরে নেন যে আধুনিক সমাজে যদি কোনও সংঘের আদৌ কোনও গুরুত্ব থাকে তবে তা হ'ল হয় প্রাথমিক গোষ্ঠীসমূহ, নয়তো আমলাতান্ত্রিক সংগঠনসমূহ। কিন্তু, বাস্তব ঘটনা একথা প্রমাণ করে না। কারণ, এই দুই প্রকার সংঘ ছাড়াও আরও একপ্রকার সংঘকে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংঘ, সমাজসেবামূলক সংগঠন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পাশ্চাত্যে শিল্পায়নের আদিপর্বে এই প্রকার বহু শ্রমিক-সেবামূলক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। শ্রমজীবী মানুষের ক্লাব বা শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে নিযুক্ত সংঘগুলি মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের

ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের দেশেও ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, আলিগড় আন্দোলন, ডন সোসাইটি ইত্যাদির মত অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমাজসংস্কার ও সমাজসেবায় বহদিন ধরেই নিযুক্ত আছে। সুতরাং সমাজে এদের গুরুত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যার সূচনা বিংশ শতাব্দীতে তা মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। কারণ, বিগত এক শতাব্দীতে স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীসমূহের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বেড়েছে যে তাদের উত্থান ও কর্মযজ্ঞ ঐতিহাসিক ঘটনার স্বীকৃতি পেতে চলেছে। বাড়ীওয়ালা সমিতি, ভাড়াটে সমিতি, স্বেচ্ছামূলক রক্তদাতাদের সংঘ, সুবর্ণ বণিক সভা, পশুপ্রেমীদের সমিতি, বিজ্ঞান মঞ্চ, পরিবেশবাদী সংগঠন নেশাসক্ত মানুষের পুনর্বাসনে নিযুক্ত সংঘ ইত্যাদি অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর কথা আমরা জানি যারা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চাহিদা প্রতিনিয়ত পূরণ করে চলেছে। এর মধ্যে যেমন শতাব্দী প্রাচীন সংগঠনও আছে, আবার তেমনি অনেক সংগঠন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে তৈরি হয়ে অচিরেই বিলীন হয়ে গেছে তারও উদাহরণ কম নয়।

তবে স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী তৈরি করার অধিকার সহজে আইনী স্বীকৃতি পায় নি। ইউরোপের অনেক দেশেই ধনতন্ত্র বিকাশের প্রাথমিক পর্বে শ্রমিক সংঘগুলির উত্থান শাসকশ্রেণী কখনোই ভালো মনে মেনে নেয় নি। যেমন ব্রিটেনে একাধিক পত্রালাপ সমিতি, হ্যামডেন ক্লাব বা ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ্ ওয়াকিং ক্লাস প্রভৃতি যেসব সংগঠন রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সংহত কার চেষ্টা করেছিল তাদের তৎকালীন শাসকশ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই স্বাগত জানায় নি। বহু সংগ্রামের ফলেই অধিকাংশ সমাজে নিজস্ব স্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য স্বাধীনভাবে সংগঠন বা গোষ্ঠী গড়ার অধিকার মানুষ আদায় করেছে।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর চরিত্রগত পার্থক্য আছে। প্রথমত, যেসব মানুষ একই ধরনের সামাজিক অবস্থান করে এবং সাধারণ সমস্যা মোকাবিলার জন্য অথবা যৌথ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তাঁদের নিয়েই স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী তৈরি হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে শুধু সমস্বার্থ বা সম-সামাজিক অবস্থান সদস্যপদ প্রাপ্তির মাপকাঠি হ'তে পারে না যোগ্যতার নিরিখে যিনি প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হন কেবলমাত্র তিনিই আমলাতন্ত্রের সদস্য হতে পারেন। তাছাড়া নিজস্ব স্বার্থ নয়, সংগঠনের স্বার্থকেই তাঁদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান করে নিতে হয়। অতএব ব্যক্তিগত পরিচয়ভিত্তিক সম্পর্ক যদি স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে নৈর্ব্যক্তিকতা হ'ল আমলাতন্ত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, আমলাতন্ত্রে যেমন পদমর্যাদার তারতম্যের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের একটি ক্রমোচ্চ কাঠামো গড়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীতে সাধারণত তা হয় না। এই ধরনের গোষ্ঠীতে ব্যক্তির কোনও নির্দিষ্ট মর্যাদা আবহমানকাল ধরে থাকে না। তাই ঊর্ধ্বতন-অধস্তনের আমলাতান্ত্রিক গড়ন এই গোষ্ঠীতে অনুপস্থিত থাকে। এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ গোষ্ঠীসদস্যদের অস্থায়ী চরিত্র। অর্থাৎ, এইসব গোষ্ঠীতে আজীবন সদস্যের সংখ্যা কম থাকে। কাজের গতিতে অনেকেই যোগ দেয়, আবার অনেকেই সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য সংগঠনে যোগ দেয়। কোনও কোনও সদস্যকে আবার শুধু সভা সমাবেশের সময়ই দেখা যায়, অন্য সময় নয়।

তৃতীয়ত, আমলাতন্ত্রের আয়ের উৎস সরকারী কোষাগার বা কোম্পানীর আয়। সেইজন্যই এক কাঠামো দৃঢ়তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু, স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর আয়ের উৎস হ'ল সদস্যদের চাঁদা এবং জনসাধারণের অনুদান। ফলে, এখানে যদি কিছু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়ও, তাদের বেতন কাঠামো আমলাতন্ত্রের সঙ্গে কখনোই তুলনীয় নয়। কাজেই আকর্ষণীয় বেতন ও ভাতা নয়, একধরনের নৈতিক আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারই স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক মৈত্রীর ভিত্তি।

এ্যান্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens)-এর মতে, স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—(ক) অংশীদারিত্ব (sharing) এবং (খ) প্রকল্পের কাজ (Project work)। অংশীদারিত্ব বলতে বোঝায় মুখোমুখি বৈঠকে

বা অন্য কোনও ভাবে অভিজ্ঞতার বিনিময় করা এবং যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা। উদাহরণস্বরূপ, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের পিতামাতাদের নিয়ে গঠিত একটি বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী হ'ল TOUCH এবং এই সংগঠনের সদস্যরা ডাকযোগে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখে। পিতামাতারা নিজেদের মধ্যে পত্রালাপ করেন এবং সেই চিঠির সম্ভার নিয়ে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা প্রতিনিয়ত সেই গোষ্ঠীর মধ্যে বিলি করা হয়। এই ধরনের সংগঠন কেবল তার সদস্যদেরই প্রভাবিত করে না, বৃহত্তর সমাজকেও শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করে। যেমন, আমাদের দেশে মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে পরিচালিত NAPM (National Alliance of People's Movement) পরিবেশ ও বিকল্প উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীগুলি তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য যে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় প্রকল্পের কাজ। যেমন, হিমোফিলিয়া সোসাইটি দূরারোগ্য হিমোফিলিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে সাহায্য করার জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা, সভাসমিতি আয়োজন করা, গবেষণা করা, রক্ত সংগ্রহ করা ইত্যাদি নানাধরনের কর্মসূচী হাতে নেয়। এক্ষেত্রে যখন কোন ব্যক্তি তার অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান সমস্যা অন্যান্যদের জানায় তখন ঐ তথ্যকে ভিত্তি করেই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গোষ্ঠীর সামগ্রিক নীতি নির্ধারিত হয়।

আমলাতন্ত্রের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর বিরোধ অনিবার্য এই কারণে যে, অনেক ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা করেই এইসব গোষ্ঠীর জন্ম হয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজের উদ্যোগেই মানুষ স্বাস্থ্য ও বৈজ্ঞানিক চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের বাইরে মানুষ যখন সহযোগিতা সাম্যের পরিবেশে মিলিত হয় তখনই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। তবে আমলাতন্ত্র বা আনুষ্ঠানিক সংগঠনের পরিবর্ত বা বিকল্প তার নয়, কারণ সমাজে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। তাই বাস্তবে তারা সহাবস্থান করে। কিন্তু যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্থায়িত্ব অর্জন করে এবং আয়তনে বৃদ্ধি পায় তার ক্রমশই আনুষ্ঠানিক সংগঠনের চরিত্র লাভ করতে থাকে। তাদের মধ্যে কর্তৃত্বের কাঠামো, নিয়মিত আয় এবং অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। আধুনিক সমাজের এটাই একটা বড় দুর্ভাগ্য।

৫.৭ অনুশীলনী

১। সমাজবিদ্যার মৌলিক ধারণা কি?
২। সমাজ কাঠামো কাকে বলে?
৩। প্রাথমিক গোষ্ঠী কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।
৪। গৌণ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিন। এর বৈশিষ্ট্যগুলি কি?
৫। প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য দেখান।
৬। নির্দেশক গোষ্ঠী কাকে বলে? উদাহরণসহ তার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।
৮। কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ করলে একটি নির্দেশক গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে?
৯। 'আমলাতন্ত্র' কথাটির অর্থ কি?
১০। আমলাতন্ত্রকে কেন যুক্তিসঙ্গত ও আইনী প্রাধিকার বলা হয়?
১১। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে হ্বেবারের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।
১২। আমলাতন্ত্রের দুষ্ক্রিয়া বলতে কি বোঝায়?

১৩। স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখান।
১৪। স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. T. B. Bottomore : *Sociology : a guide to problems and literature* (Unwin University Books. London, 1968).
2. R. M. MacIver & C. H. Pavge : *Society : An Introductory Analysis* (Macmillan, London, 1971)
3. M. Ginsberg : 'The Scope and Methods of Sociology' in *The Study of Society* ed. by F. C. Barttett et. al. (London, 1939)
4. C. H. Cooley : *Social Organization* (1909)
5. K. Davis : *Human Society* (New York, 1948)
6. M. N. Srinivas : *Social Change in Modern India* (Bombay, 1972)
7. J. H. Turner : *The Structure of Sociological Theory* (The Dorsey Press, Illinois. 1978).
8. Anthony Giddens : *Sociology* (Polity Press, Oxford, 1989).
9. R. K. Merton : *Social Theory and Social Structure* (Amerind, New Delhi, 1972).

একক ৬ □ মর্যাদা ও ভূমিকা

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ মর্যাদা ও ভূমিকা
৬.৩.১ সামাজিক মর্যাদা
৬.৩.২ আরোপিত মর্যাদা ও অর্জিত মর্যাদা
৬.৪ ভূমিকাগুচ্ছ
৬.৫ ভূমিকার চাপ ও ভূমিকা-দ্বন্দ্ব
৬.৬ মর্যাদা-ভূমিকার অসঙ্গতি
৬.৭ অনুশীলনী
৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে :

- মর্যাদা কাকে বলে
- মানুষের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার ধরন
- ব্যক্তিজীবনে ভূমিকার গুরুত্ব ও তার বিভিন্ন দিক
- মর্যাদা ও ভূমিকার অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্ব

৬.২ প্রস্তাবনা

সাধারণভাবে বলতে গেলে মর্যাদাকে অধিকার ও কর্তব্যের সমাহার হিসেবে বর্ণনা করা যায়। তবে প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা হচ্ছে সমাজ নির্ধারিত অধিকার, কর্তব্য ও প্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান। অর্থাৎ, সমাজ সংগঠনের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান। তাই ব্যক্তির প্রতিটি সামাজিক অবস্থানই মর্যাদাভিত্তিক। যেমন—মাতা, পিতা, বন্ধু, শিক্ষক, কর্মচারী ইত্যাদি। এই সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, যেমন—লিঙ্গ, সামাজিক কর্মকাণ্ড; যেমন— নেতা, শিষ্য, উদ্ভাবক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের ভিত্তিতে; যেমন —পিতা মাতা, নিয়োগকারী, বিক্রেতা প্রভৃতি। সুতরাং, প্রত্যেক মানুষেরই সমাজে নির্ধারিত মর্যাদা আছে।

অন্যদিকে, ভূমিকা বলতে বোঝায় সমাজ নির্ধারিত সামাজিক অবস্থান অনুসারে ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশিত আচরণ। সমাজজীবনের নাটমঞ্চে ব্যক্তি যে যে চরিত্রে অভিনয় করে তাকেই ভূমিকা বলা হয়। সমাজজীবনে ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। একই ব্যক্তি কখনও পিতা, কখনও স্বামী, কখনও পুত্র, কখনও অফিস কর্মচারী। এইরকমভাবে প্রতিটি ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে অসংখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই ভূমিকা পালন সংগঠিত সামাজিক জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৬.৩ মর্যাদা ও ভূমিকা

সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তি-মানুষ নিয়ে যেহেতু সমাজ গঠিত সেহেতু সমাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হ'লে ঐসব মানুষের নানাবিধ ভূমিকা এবং সেই ভূমিকাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সমাজ-কাঠামোর মধ্যেই সামাজিক ভূমিকাসমূহের প্রতিফলন ঘটে এবং ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা তার সামাজিক পরিচিতির ভিত্তিতে স্থির হয়। অন্যদিকে, প্রত্যেক ব্যক্তির একাধিক সামাজিক পরিচিতি থাকে এবং সেই অনুযায়ী তার সামাজিক ভূমিকার ক্ষেত্রেও পার্থক্য সূচিত হয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মানুষের সামাজিক পরিচিতি বা মর্যাদা (Social Status) এবং সামাজিক ভূমিকার (Social Role) বিচার-বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হ'লেও ধারণাগত বর্গ হিসেবে তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সাধারণ অর্থে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে ব্যক্তির নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানকেই তার মর্যাদার দ্যোতক হিসেবে ধরা হয়, আর সেই মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার-ব্যবহারকে ভূমিকা বলা হয়। ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা যেমন তার ভূমিকা নির্ণয় করে, তেমনি সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে সামাজিক মর্যাদা।

৬.৩.১ সামাজিক মর্যাদা

অন্যান্য সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থানকে মর্যাদা বলে। লাপিয়ের (La-peire)-এর মতে, সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা যেমন তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, তেমনি সমাজে ব্যক্তির অবস্থান তার মর্যাদা অনুসারে স্থির হয়। অতএব, মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সামাজিক মর্যাদা অনেকটাই মনোজাগতিক ধারণা; কারণ সামাজিক মূল্যায়নের উপরেই ব্যক্তির মর্যাদা নির্ভরশীল। অন্যান্য গোষ্ঠী বা মানুষের চোখে ব্যক্তির যে গুরুত্ব ধরা পড়ে তাই তার মর্যাদা : যেমন, রোগীর চোখে ডাক্তারের মর্যাদা বা ছাত্রের চোখে শিক্ষকের মর্যাদা। সমাজে ব্যক্তির ভূমিকার মূল্যায়ন নানাভাবে করা হয়। যে ভূমিকাকে বেশি মূল্যবান বলে মনে করা হয় তা যিনি পালন করেন তাঁকে মর্যাদাও বেশি দেওয়া হয়।

ব্যক্তি একাধারে পিতা, অধ্যাপক, আইনসভার সদস্য বা পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে এবং তদনুযায়ী মর্যাদা ভোগ করতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন ভূমিকার মর্যাদা যোগ করে ব্যক্তির সঠিক মর্যাদা নিরূপণের প্রস্তাব অবাস্তব, কারণ এটি একটি অসম্ভব প্রচেষ্টা বলেই গণ্য হয়।

একথা কিন্তু ঠিক নয় যে, মর্যাদা সর্বদা মানুষের ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল। 'Society'-গ্রন্থের লেখক ম্যাকাইভার ও পেজ (R. M. MacIver & C. H. Page)-এর মতে, মর্যাদার প্রকৃত ভিত্তি হ'ল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান যা ব্যক্তিগত গুণাগুণ বা সমাজসেবামূলক কার্যাবলী নিরপেক্ষভাবেই ব্যক্তির অনুকূলে মানসম্মান, শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সৃষ্টি করে। তবে কিংসলি ডেভিস্ (Kingsley Davis) যেমন বলেছেন, ইচ্ছে করে বা সুপরিকল্পিতভাবে মর্যাদা সৃষ্টি করা যায় না, বরং বিপরীতপক্ষে সামাজিক মর্যাদা হ'ল এক বিশেষ সামাজিক অবস্থান যার পিছনে সমগ্র সমাজের স্বীকৃতি ও সমর্থন বর্তমান থাকে। তবে সব সমাজেই আইন প্রণয়ন করে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় এবং সেই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে মর্যাদার কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। তাই র‍্যাল্‌ফ্ লিন্টন (Ralph Linton) মর্যাদা বোঝাতে অধিকার ও কর্তব্যের সমন্বিত অবস্থার কথা বলেছেন। তাছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিগত গুণ, যোগ্যতা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেও অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতিতে নতুন মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গেই আরোপিত মর্যাদা এবং অর্জিত মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৬.৩.২ আরোপিত মর্যাদা ও অর্জিত মর্যাদা

আমরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও মর্যাদার অধিকারী এবং সেই মর্যাদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করি। এখন প্রশ্ন হ'ল, ব্যক্তি সমাজে কিভাবে মর্যাদা লাভ করে? এর উত্তরে বলা যায়, মর্যাদা লাভের উপায় প্রধানত দু'টি—আরোপণ (Ascription) এবং অর্জন (Achievement)।

কিছু কিছু মর্যাদা সমাজ ব্যক্তির উপর আরোপ করে। কারণ, জন্মসূত্রেই ঐসব মর্যাদা ব্যক্তির উপর বর্তায়। লিঙ্গ, বয়স জন্মক্রম, মা, বাবা, ভাই, বোন ইত্যাদির সঙ্গে জৈবিক সম্পর্ক বা বিশেষ একটি পরিবারে জন্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে যে মর্যাদা ব্যক্তি লাভ করে তা সম্পূর্ণই আরোপিত মর্যাদা; যেমন, লিঙ্গজনিত মর্যাদা। শিশু স্ত্রী না পুরুষ তার ভিত্তিতে পরিবারে ও সমাজে প্রতিপালনের পদ্ধতি পাল্টে যায়, কারণ শিশুপুত্র ও শিশুকন্যার কাছে সমাজের প্রত্যাশা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এতে আমাদের কিছুই করার থাকে না। অনুরূপ ব্যবস্থা হ'ল বয়সভিত্তিক মর্যাদা, যার ওপরেও আমাদের কোনও হাত নেই। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অবধারিতভাবেই ভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর সদস্য হয়ে যাই এবং তদনুযায়ী মর্যাদার অধিকারী হই। পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কনিষ্ঠ পুত্র হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন সমাজে ব্যক্তি যে মর্যাদার অধিকারী হয় তা আরোপিত মর্যাদারই উদাহরণ। কোন্য সমাজে জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারে। আবার হিন্দু সমাজে কিছু কিছু ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের অধিকার কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্যই স্বীকার করা হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মর্যাদাও সমাজ কর্তৃক আরোপিত। ভারতের হিন্দু সমাজে আরোপিত মর্যাদার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হ'ল বর্ণ ও জাতপাতভিত্তিক মর্যাদা। বর্ণ-কাঠামোয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র হয়েই জন্মায় এবং সারা জীবন জাত-এর মর্যাদা বহন করে। এমনকি পারিবারিক মর্যাদার (অভিজাত বা শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে বিখ্যাত অথবা সমাজের চোখে অখ্যাত) ভারও ব্যক্তিকে বহন করে চলতে হ'তে পারে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে আরোপিত মর্যাদা আমরা সেইসব গোষ্ঠীর কাছ থেকেই পাই, যাদের সদস্যভুক্তি হওয়া আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। আমরা চাই বা না চাই, পরিবার বা জাতের সদস্য হয়েই থাকতে হবে এবং তার মর্যাদাও আমাদের উপর বর্তাবে। আমাদের ইচ্ছা, অর্জন বা কর্মোদ্যমের সাহায্যে আমরা সেই মর্যাদা কোন হেরফের ঘটাতে পারি না। কিন্তু অর্জিত মর্যাদার ব্যাপারটা অন্যরকম। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের শিক্ষাদীক্ষা, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা যা নতুন সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে নতুন নতুন মর্যাদা লাভ করে। তাই অর্জিত মর্যাদার অর্থ হ'ল ঐচ্ছিক গোষ্ঠীর (Voluntary groups) সদস্যভুক্তি। ফলে, ব্যক্তি একইসঙ্গে অনেক গোষ্ঠীরও সদস্য হ'তে পারে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত অর্জনের ফলে মর্যাদার উন্নতি ঘটানোও সম্ভব। সমাজে অর্জিত মর্যাদার প্রচুর দৃষ্টান্ত উপস্থিত বৈবাহিক সম্পর্কজাত মর্যাদা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিবাহের মাধ্যমে কেউ স্বামী বা স্ত্রী যেমন হ'তে পারে; তেমনি সন্তানের জন্ম দিয়ে পিতামাতার মর্যাদাও লাভ করতে পারে। শিক্ষাজগতে ও কর্মক্ষেত্রের মর্যাদাও অর্জিত মর্যাদা। নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা লাভ করেই ব্যক্তি স্নাতক, ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হ'তে পারে। অর্জিত মর্যাদার অধিকারেই সামান্য কেরানীও দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হ'তে পারে।

সমাজতত্ত্বের বিচারে আরোপিত মর্যাদা ও অর্জিত মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে আমরা সাবেকী সমাজ ও আধুনিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারি; কারণ, সাবেকী সমাজে যেমন আরোপিত মর্যাদার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তেমনি আধুনিক সমাজ গুরুত্ব দেয় অর্জিত মর্যাদাকে। সাবেকী সমাজে ব্যক্তির মূল্যায়ন হয় তার জাতি-সম্পর্ক, পরিবার বা জাত-গোষ্ঠীর সদস্যপদের ভিত্তিতে। কিন্তু আধুনিক সমাজে কে কোন্ গোষ্ঠীর সদস্য তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কে কি যোগ্যতা অর্জন করেছে তার উপর। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ট্যালকট্ পারসন্স (Talcott Parsons)-এর মতে, আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার (Modernnisation Process) অন্যতম উপাদান হ'ল অর্জিত মর্যাদার উপর গুরুত্ব প্রদান। সাবেকী সমাজে তা করা হয় না বলেই

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে, কোনও সমাজের মূল্যবোধের কাঠামো যখন ব্যক্তিগত উদ্যম ও অর্জনের উপর জোর দেয়, পারসন্স-এর মতে, তখনই সেই সমাজ আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরু করে।

তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আরোপিত মর্যাদা ব্যক্তিকে নতুন মর্যাদা অর্জন করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। কেউ জন্মগত প্রতিভা বা গুণাবলী নিয়ে জন্মাতে পারে, কিন্তু তার আরোপিত মর্যাদা অনুকূল না হ'লে তার পক্ষে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, মেধাী পুত্র বা কন্যা সন্তান দরিদ্র হরিজন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে যদি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করারই সুযোগ না পায় তাহ'লে তার বিকাশের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। অন্যদিকে সাধারণ মানের মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীও জন্মসূত্রে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে জীবন সফল ও প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। এই কারণেই বলা হয় যে, আরোপিত ও অর্জিত, দুই ধরনের মর্যাদা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্করহিত নয়, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

সমাজতাত্ত্বিক কিংসলে ডেবিস্ (Kingsley Davis) সামাজিক সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই প্রকার মর্যাদার পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, আদিম, সরল ও স্থিতিশীল সমাজেই সাধারণত আরোপিত মর্যাদা এবং কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা এইসব সমাজের বিশেষ থাকে না। তাই তারা প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতিসমূহকেই প্রচণ্ডভাবে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। এভাবেই তারা সমাজের সংহতি বজায় রাখে। কিন্তু জটিল তথা অস্থিতিশীল আধুনিক সমাজ অর্জিত মর্যাদা ও নমনীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের উপর গুরুত্ব দিয়ে কার্যত অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেই উৎসাহ দেয় যা সামাজিক সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। এই ধরনের সমাজে বিশেষীকরণের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পায়, তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্জিত মর্যাদার গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। কারণ ব্যক্তিগত যোগ্যতা, কর্মকুশলতা ও প্রতিভার জোরে নতুন নতুন মর্যাদা অর্জনের তথ্য মর্যাদাবৃদ্ধির সুযোগ অবারিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ডেভিসের মতে, ব্যক্তিগত মর্যাদা অর্জনের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা সমাজের সংহতিকেই দুর্বল করে ফেলে।

তবে ডেভিসকে অনুসরণ করে বলা যায়, সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে আরোপিত ও অর্জিত দুই প্রকার মর্যাদাই প্রয়োজনীয়। আরোপিত মর্যাদা যেমন সমজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, অর্জিত মর্যাদা তেমনি সমাজ পরিবর্তনের পথ সুগম করে। মানুষকে তার ব্যক্তিগত গুণাবলী নিরপেক্ষভাবে নির্দিষ্ট মর্যাদা দান করার জন্য সমাজের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা এবং সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান। এগুলি যেহেতু সাধারণ মতৈক্য ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সেহেতু তারা সমাজের ঐক্য ও সংহতির পক্ষেও সহায়ক। এই কারণেই সমাজ-সংহতির পক্ষে আরোপিত মর্যাদার ভূমিকা সদর্থক। অন্যদিকে অর্জিত মর্যাদা লাভের ব্যবস্থা সামাজিক সচলতার সুযোগ সম্প্রসারিত করে অচলায়তন ভেঙ্গে পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।

আরোপিত মর্যাদা ব্যক্তির জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিত্বের সংহতিবিধানে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমাজে প্রতিযোগিতার পরিবেশ যদি কর্তৃত্ব করে এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু যদি সর্বদা অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অর্জন করতে হয় তাহ'লে ব্যক্তি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের আবর্তে পড়ে অসহায় বোধ করে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সুসংহত ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে চরম প্রতিযোগিতার পরিমণ্ডল তাই অন্যতম অন্তরায়। একারণেই মর্যাদা আরোপ করা ব্যবস্থা শুধু সাবেকী কর্তৃত্ববাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়, আধুনিক শিল্পোন্নত গণতান্ত্রিক সমাজেও তা স্বমহিমায় উপস্থিত। বস্তুতপক্ষে, এই ব্যবস্থার উপরেই সামাজিকীকরণ (Socialisation) প্রক্রিয়া ও সামাজিক সংহতি রক্ষা নির্ভরশীল। যে শিশু সমাজের সদস্য হ'তে চলেছে তাকে নির্দিষ্ট মর্যাদা দান করে প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা না করে সমাজ থাকতে পারে না। অন্যদিকে ব্যক্তিও আরোপণের মাধ্যমে নানাবিধ সামাজিক বিধি ও সম্পর্কের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে পারে। এভাবেই তার সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়।

৬.৪ ভূমিকাগুচ্ছ

শ্রম-বিভাজন নীতি হ'ল সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। এই নীতি সমাজের প্রত্যেক সদস্যের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়। এই নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল গোষ্ঠীজীবনে প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকা। ব্যক্তি তার ভূমিকা পালন করলেই গোষ্ঠীজীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সমাজও তাই আশা করে যে, ব্যক্তি তার ভূমিকা পালন করবেই। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে বা পরিস্থিতিতে ব্যক্তির কাছ থেকে যে যে ধরনের আচরণ আশা করা হয় তাকেই ভূমিকা (Role) বলা হয়। লুন্ডবার্গের (Lundberg) সংজ্ঞানুসারে, "A social role is a pattern of behaviour expected of an individual in the certain group or situation."

ব্যক্তির সামাজিক পরিচিতি বা মর্যাদার পার্থক্যানুসারে সামাজিক ভূমিকার ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয়; কারণ, সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তি সামাজিক অবস্থানের প্রয়োজন অনুযায়ী যেভাবে আচরণ বা কাজ করে অথবা যে কর্তব্য সম্পাদন বা সুবিধা ভোগ করে সেটাই হ'ল তাদের সামাজিক ভূমিকা। সুতরাং সামাজিক ভূমিকা হ'ল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বা পরিচিতির ক্রিয়াশীল দিক। বাঞ্ছিত আচরণের বিষয় ভূমিকার মধ্যে বর্তমান থাকে বলে একটি ভূমিকাকে অপর একটি ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন পুত্র-কন্যা ছাড়া পিতামাতার ভূমিকার কথা আসে না বা কর্মচারী ছাড়া নিয়োগকর্তার ভূমিকা হয় না। এদিক থেকে বিচার করলে ভূমিকা বলতে কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্যকে বোঝায়। অর্থাৎ, ভূমিকাসমূহ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

সংগঠিত সমাজজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল বিভিন্ন মর্যাদার আন্তঃসম্পর্ক; যেমন, একজন কলেজের অধ্যাপক। তাঁকে কলেজ পরিচালক সমিতি, অধ্যক্ষ, অশিক্ষক কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী এবং কখনও কখনও ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। কলেজের অধ্যাপক হিসেবেই তাঁকে এতজনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হ'তে হয়। এঁদের সকলকে নিয়েই গড়ে ওঠে ভূমিকাগুচ্ছ (Role-Set)। যখন কোনও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমদর্শী অনেকগুলি সম্পর্কের বৃত্ত গড়ে ওঠে তখন সেই সম্পর্কজালকে 'ভূমিকাগুচ্ছ' বলা হয়। প্রখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী মার্টনের (R. K. Merton) মতে, ভূমিকাগুচ্ছ হ'ল সেই সমস্ত পরিপূরক ভূমিকার সম্পর্ক যার সঙ্গে কোনও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে জড়িয়ে পড়ে ("that complement of role relationships which persons have by virtue of occupy in a particular social status.")

মার্টনের সংজ্ঞানুসারে ভূমিকাগুচ্ছ তখনই তৈরি হয় যখন ভূমিকা ও মর্যাদাই শুধু পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক নয়, বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি এবং ভূমিকাগুচ্ছের প্রতিটি সদস্যের ভূমিকাও পরস্পরের পরিপূরক।

সমাজে আমরা সকলেই নানা মর্যাদার অধিকারী এবং প্রতিটি মর্যাদার সঙ্গেই একটি স্বতন্ত্র ভূমিকাগুচ্ছ জড়িত উদাহরণস্বরূপ, একটি স্কুলের শিক্ষক যেমন শিক্ষক হিসেবেই একটি ভূমিকাগুচ্ছের মুখোমুখি হন, তেমনি কোনও একটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে, বা পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে অথবা স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক হিসেবে আলাদা আলাদা ভূমিকাগুচ্ছের মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়।

তবে মার্টন যতই 'পরিপূরক' চরিত্রের উপর গুরুত্ব দিন না কেন, ভূমিকাগুচ্ছের মধ্যে সংঘাতের বীজ রোপণ করা থাকে। নানা কারণে এটা হ'তে পারে। প্রথমত, ভূমিকাগুচ্ছের অন্তর্গত বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তির প্রতি কোন ব্যক্তির আচরণ স্বতন্ত্র হ'তে বাধ্য। অন্যদিকে, যাঁদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপন করবেন তাঁরাও সকলে তাঁর সামাজিক অবস্থানকে সমান চোখে দেখবেন না। দ্বিতীয়ত, ভূমিকাগুচ্ছের অন্তর্গত সকলের মর্যাদা সমান নয়। কেউ কেউ সমমর্যাদা সম্পন্ন, কারুর মর্যাদা বেশি, কারুর বা আবার কম। তৃতীয়ত, ভূমিকাগুচ্ছের সদস্যরা যেহেতু

বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন সেহেতু যাঁকে কেন্দ্র করে এই ভূমিকাগুচ্ছ তৈরি হয়েছে তার উপর পরস্পর বিরোধী দাবি-দাওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা হ'তে পারে। আমাদের অধ্যাপককে নিয়েই বিষয়টা আরো সরলভাবে বোঝানো যেতে পারে। যেমন, অধ্যাপক হয়ত শিক্ষকতার দায়িত্বের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। কিন্তু অধ্যাপক সমিতির দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য লাগাতার কর্মবিরতির যে আন্দোলন ঘোষণা করা হয়েছে তাতে যোগদানে তাঁকে চাপ দেওয়া হ'তে পারে। বিপরীতপক্ষে, আন্দোলনে যোগ না দিয়ে কলেজের পঠন-পাঠন ঠিকমতো চালিয়ে যেতে অনুরোধ করতে পারে কলেজ পরিচালন সমিতি। অন্যদিকে, ছাত্ররাও 'ক্লাস বন্ধ করা চলবে না' বলে অধ্যাপকের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বলাই বাহুল্য, এই ধরনের পরিস্থিতিতে অধ্যাপক যে দিশাহারা হবেন তার জন্য ভূমিকাগুচ্ছের দ্বন্দ্বই প্রধানত দায়ী।

এই ধরনের বিপরীতমুখী চাপের ফল কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে, এতে সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হবে। কিন্তু মার্টনের মতে সামাজিক কাঠামোর এমন কিছু কার্যকরী উপায় (mechanisms) আছে যার সাহায্যে মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি দ্বন্দ্বের ব্যাপকতা কমিয়ে এনে দক্ষতার সঙ্গে 'ভূমিকা-ব্যবস্থা' (role-system) বজায় রাখতে পারবে। এই উপায়গুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) ভূমিকাগুচ্ছের সদস্যদের স্বার্থের বিভিন্নতা (Varying interest of the members of the role-set) : কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট পদাধিকার বলে যাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন (অর্থাৎ, যে ভূমিকাগুচ্ছ তৈরি করেন) তাঁদের সকলের তাঁর সম্পর্কে সমান আগ্রহ বা তাঁর কাছ থেকে সমান প্রত্যাশা নাও থাকতে পারে। কারও কাছে তিনি কেন্দ্রীয় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, কারও কাছে আবার তাঁর গুরুত্ব প্রান্তিক। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে যাঁদের আগ্রহ বা স্বার্থ তুলনামূলকভাবে কম তাদের দাবীকে উপেক্ষা করা যায়। আমাদের উদাহরণে উল্লেখিত অধ্যাপককেই স্থির করতে হবে কার দাবী বা অনুরোধকে তিনি উপেক্ষা করবেন।

(২) ক্ষমতার বন্টন (Power distribution) : কোনও ব্যক্তির ভূমিকাগুচ্ছে ক্ষমতার বন্টন কদাচিৎ সমভাবে হয়। অর্থাৎ, ভূমিকাগুচ্ছের সদস্যরা সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হন না। কেউ কেউ বেশি ক্ষমতাশালী বা প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বেশি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির বিপরীতে কম ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মোর্চা গঠন করে ভূমিকাধিকারী ব্যক্তি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারেন। আবার একদলের বিরুদ্ধে আরেক দলকে লাগিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হ'তে পারে। যেমন, কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে এমনভাবে কাজে লাগানো হ'তে পারে যাতে আন্দোলনকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ দৃঢ় ব্যবস্থা না নিতে পারেন।

(৩) অন্তরণ (Insulation) : সমাজে ভূমিকা-কাঠামো এমন ধরনের নয় যে নির্দিষ্ট অধিকারী ব্যক্তি তাঁর ভূমিকা-অংশীদারদের (role-partners) সকলের সঙ্গে অবিরাম মিথষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকেন। বরং ঐ কাঠামোই ঐ ব্যক্তিকে ভূমিকাগুচ্ছের সদস্যদের দ্বারা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে আড়াল করে রাখে। ফলে, তাঁকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাত থেকেও রেহাই দেওয়া যায়। এরই জোরে আমাদের উল্লেখিত অধ্যাপক যাবতীয় সমালোচনা ও চাপ প্রতিরোধ করে তাঁর দাবী আদায়ের জন্য কর্মবিরতী পালন করতে পারেন।

(৪) মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি স্বচ্ছতার আশ্রয় নিয়ে তাঁর ভূমিকা-অংশীদারদের স্পষ্ট করে বলে দিতে পারেন যে তার উপর তাঁদের দাবীগুলো পরস্পরবিরোধী। এর ফলে ঐ অংশীদাররাই স্থির করবেন কিভাবে তাঁরা দ্বন্দ্বের নিরসন করবেন—নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জন্য লড়াই করে, না সমঝোতা করে। এরকম ক্ষেত্রে অবশ্য ভূমিকা-সাথীদের সম্পর্কে আস্থার মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

(৫) সামাজিক সমর্থন (Social Support) : ভূমিকাগুচ্ছে সংহতির অভাব নিয়ে যাঁরা সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা যদি সমমর্যাদাসম্পন্ন হন তাহলে সমস্যাজর্জরিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সামাজিক সমর্থনে তাঁরা দিতে পারেন।

যেমন, কোনও সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটে অংশ নিয়ে যদি কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়েন তাহ'লে যে কর্মী-সমিতির তিনি সদস্য তার অন্যান্য সদস্যদের সামাজিক সমর্থন সংগ্রহ করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন।

(৬) ভূমিকাপালনকারী ব্যক্তি কিছু কিছু বিরক্তিকর সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য তাঁকে অন্যান্য ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে যেতে হবে যাতে ভূমিকাগুচ্ছের অবশিষ্ট সম্পর্কগুলি ব্যাপকভাবে বিনষ্ট না হয়।

মার্টনের মতে, ভূমিকাগুচ্ছ মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে না ; তা একান্তভাবেই সামাজিক কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ, নির্দিষ্ট মর্যাদা সমাজ-কাঠামোর সঙ্গেই সম্পৃক্ত থাকে। সুতরাং ভূমিকাগুচ্ছের সংঘাতে ব্যক্তি সত্যিই যদি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে তাহ'লে মর্যাদার কাঠামো থেকে ভূমিকাগুচ্ছকে ছেঁটে ফেলার চেয়ে নিজেকেই মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে নেওয়া শ্রেয়।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, ভূমিকাগুচ্ছের তত্ত্বে ব্যক্তির উপরে সমাজ-কাঠামোকে স্থান দেওয়া হয়েছে। দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য মার্টন ভূমিকা-কাঠামোর স্বার্থে ব্যক্তিকে বিসর্জন দিতেও রাজী। তবে তাঁর নির্দেশিত "উপায়"গুলি প্রকৃত অর্থে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূর করতে পারে না। কিন্তু ভূমিকাগুচ্ছের কার্যকারিতার জন্য ধরে নিতে হবে যে, সমাজে মতৈক্য ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

৬.৫ ভূমিকার চাপ ও ভূমিকা-দ্বন্দ্ব

সমাজ ব্যক্তির কাছে যে ব্যবহার বা আচরণ প্রত্যাশা করে, অর্থাৎ যে ভূমিকা তার কাছে আশা করে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে তা গ্রহণ ও পালন করে তাহ'লে সমাজজীবনও সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু বাস্তবে কদাচিৎ তা ঘটে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নানা ধরনের সামাজিক মর্যাদার দায় বহন করতে হয় এবং সেই সেই মর্যাদা অনুসারে আলাদা আলাদা ভূমিকা পালন করতে হয়। যেমন, কোনও ব্যক্তি তাঁর পরিবারে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা স্বামীর ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বা উকিলের পেশাগত ভূমিকা অথবা এলাকার সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। জীবনের কোনও-না-কোনও সময়ে বিশেষ ব্যক্তিকে রোগী, অতিথি, ক্রেতা বা যাত্রীর ভূমিকা পালন করতে হবে। তাঁর বয়োবৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা জীবন ধরেই তিনি নানা ভূমিকা পালন করবেন। কিছু কিছু ভূমিকা আছে যেগুলি একসঙ্গে পালন করতে হয়, আবার কিছু কিছু ভূমিকার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। কিছু কিছু ভূমিকা পরপর পালন করা হয়; কিছু ভূমিকা জীবনে হয়ত একবারই পালন করা হবে; কিছু ভূমিকা হঠাৎই পালন করা হয়, আবার কিছু ভূমিকা বেশ কয়েক বছর ধরে পালন করতে হয়। সুতরাং ব্যক্তিকে যেখানে এত রকমের ভূমিকা পালন করতে হয়, সেখানে দ্বন্দ্বের অবকাশ যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সমাজ যখন ব্যক্তির কাছে কোনও একটি বিশেষ মর্যাদানুসারী আচরণ অধিক মাত্রায় প্রত্যাশা করে তখন তা পূরণ করার জন্য ব্যক্তির উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকার চাপ (Role constraint) বলা হয় এবং তার ফলে অন্যান্য ভূমিকার সাথে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকার দ্বন্দ্ব (Role Conflict) বলা হয়। আধুনিক সমাজে নারীর অবস্থানকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাবেকী সমাজের ধারণা অনুযায়ী নারীর আদর্শ স্থান হ'ল গৃহে। গৃহিনী বা জননী হিসেবে সাংসারিক কাজ পরিচালনা করা, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী বা পুত্র-কন্যাদের দেখাশোনা করা বা অতিথি-আপ্যায়ন করা নারীর প্রকৃত ভূমিকা বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু আধুনিক নারী লেখাপড়া শিখে স্বাধীন উপার্জনের পথ বেছে নিতে আগ্রহী। অফিস-কাছারিতে চাকরী বা স্বাধীন পেশায় তাঁরা নিযুক্ত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে যে ভূমিকার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'তে পারে মহান চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর 'মহানগর' ছবির নায়িকা

আরতির মাধ্যম চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। নারী যদি অফিসের দায়িত্ব নিষ্ঠাভাবে পালন করতে চান, যা তাঁকে অবশ্যই করতে হবে, তাহ'লে সাংসারিক দায়িত্বের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্যভাবে দেখা দেবে। অন্য উদাহরণের সাহায্যে বলা যায়, শিক্ষক যদি পঞ্চায়েতের সদস্য হয়ে এলাকার উন্নয়নে বেশি সময় দেন তাহলে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করতে হবে এবং এভাবেই তিনি ভূমিকা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে পড়বেন।

ভূমিকার দ্বন্দ্ব নানারকমের হ'তে পারে। প্রথমত, একই ব্যক্তি দু'টি গোষ্ঠীতে সদস্য হওয়ার কারণে ভূমিকা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'তে পারে। যেমন, কোনও কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য হ'তে পারেন। এমতাবস্থায় অধ্যক্ষ পরিচালন সমিতির সভায় কোনও একটি ছাত্রের বিরুদ্ধে পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগ পেশ করলে ঐ ছাত্র-প্রতিনিধি ভূমিকা-দ্বন্দ্বের শিকার হবেন। কারণ পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবে তাকে অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হলেও ছাত্রনেতা হিসেবে তার শাস্তিমকুবের কথাই তাকে ভাবতে হয়।

দ্বিতীয়ত, একই ব্যক্তির একই সামাজিক মর্যাদার মধ্যেও ভূমিকা-দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে। যেন, কোনও ব্যক্তি অধ্যাপক হিসেবে যেমন শ্রেণীকক্ষে ছাত্র পড়ানোকে কর্তব্য বলে গ্রহণ করবেন, তিনিই আবার অধ্যাপক সমিতির আহ্বানে পেশাগত দাবী-দাওয়ার জন্য কর্মবিরতিতেও অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হ'তে পারেন। এই দু'টি ভূমিকা যেহেতু পরস্পরবিরোধী, সেহেতু উক্ত অধ্যাপককে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হ'তে হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় একই ধরনের ভূমিকা বা দায়িত্ব পালনকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বনদ্ব দেখা দিতে পারে। যেমন, কোনও কারখানায় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা আঘাতের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত সে বিষয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের শ্রমিক সংঘ এবং পরিচালন-কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ভূমিকার-দ্বন্দ্ব হ'তে পারে।

ভূমিকা-দ্বন্দ্বের ঘটনা সমাজব্যবস্থা-বহির্ভূত কোনও বিষয় নয়। বরং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। সরল সংস্কৃতির বৈচিত্র্যহীন ও তুলনামূলকভাবে বেশি। স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থায় সাধারণত ভূমিকা-দ্বন্দ্বের অবকাশ কম। পক্ষান্তরে জটিল, পরিবর্তনশীল সমাজে ভূমিকা-দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বেশি থাকে। বস্তুতপক্ষে প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং গতিশীল সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সাবেকী সমাজের মর্যাদা ও ভূমিকার কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে বলেই আধুনিক সমাজে মানুষ ভূমিকার চাপ ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের মুখে ব্যক্তি যখন সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয়ে দ্বিদাগ্রস্ত হয় তখনই দেখা দেয় ভূমিকার সংকট। তবে সংকট যেমন আছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও সমাজের জানা আছে। তার জোরেই সমাজ স্থিতিশীলতা অর্জন করে।

৬.৬ মর্যাদা-ভূমিকার অসঙ্গতি

আমরা দেখেছি সমাজের কাঠামো বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে হ'লে মর্যাদা ও ভূমিকার ধারণা বিশদ করা প্রয়োজন। কিন্তু বিশদ ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে দৈনন্দিন সমাজজীবনে উভয়ের মধ্যে অনেক অসঙ্গতিও ফুটে ওঠে। এ বিষয়ে লিন্টন (Linton) ও মার্টনের ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে।

কোনও সমাজ-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট ব্যক্তি যে পদ অধিকার করে তাকে লিন্টন মর্যাদা বলে উল্লেখ করেছেন। আবার ঐ পদের কাছ থেকে যে ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করা হয় তা পূরণ করাই হ'ল ভূমিকার পালন করা। এই হিসেবে মর্যাদা ও ভূমিকা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা নির্দিষ্ট প্রত্যাশাসমূহের সঙ্গে সুবিন্যস্ত আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কসমূহের মেলবন্ধন ঘটায়। লিন্টনের মতে, সমাজে প্রতিটি মানুষ অসংখ্য মর্যাদার অধিকারী এবং এই প্রত্যেকটি মর্যাদার

আনুষঙ্গিক ভূমিকাও তাকে পালন করতে হয়। যেমন, একই ব্যক্তি একাধারে ডাক্তার, সমাজসেবী, বিধায়ক, স্বামী অথবা পিতার মর্যাদানুসারী ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মর্যাদা ও ভূমিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ডাক্তারের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে গিয়ে তিনি স্বামী বা পিতার ভূমিকাকে অবহেলা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্ত্রী বা পুত্রের সঙ্গে যে মনোমালিন্য বা ভুল বোঝাবুঝি হবে তা নিরসনের জন্য ডাক্তারবাবুকেই বিভিন্ন মর্যাদা ও ভূমিকার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করতে হবে।

রবার্ট মার্টন অন্য একপ্রকারের মর্যাদা-ভূমিকার অসঙ্গতি কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সমাজে প্রতিটি মর্যাদার সঙ্গে একটি নয়, একাধিক ভূমিকা জড়িত থাকে। এই ভূমিকাগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বলে মার্টন তাদের 'ভূমিকাগুচ্ছ' (role-set) বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের একটি ছাত্র তার শিক্ষককূল, সহপাঠীবৃন্দ, নার্স, হাসপাতালের বিভিন্ন ডাক্তার সমাজসেবীর দল ইত্যাদি বিভিন্ন জনের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে এবং সেই অনুযায়ী পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভূমিকাও তাকে পালন করতে হয়। এই ধরনের ভূমিকাগুচ্ছের সঙ্গে বহুবিধ ভূমিকার (Multiples roles) পার্থক্য আছে। কারণ, ব্যক্তি সমাজে যে বিভিন্ন ধরনের মর্যাদার অধিকারী হয় তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভূমিকার জটিল সমাহারকেই 'বহুবিধ ভূমিকা' বলা হয়। যেমন, শিক্ষিকা, স্ত্রী, মা, কম্যুনিষ্ট বা লেখিকার মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূমিকাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মার্টন এগুলিকেই মর্যাদাগুচ্ছ (Status set) বলেন।

ভূমিকাগুচ্ছ ও মর্যাদাগুচ্ছ সমাজকাঠামোর অপরিহার্য অংশ হ'লেও তাদের মধ্যেকার অসঙ্গতির কারণে সমাজে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'তে পারে। এই পরিস্থিতিগুলিকে মার্টন নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সেই পরিস্থিতির যেখানে বিশেষ একটি মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি এমন কিছু ভূমিকা-অংশীদার-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যারা সমাজকাঠামোয় স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। এর ফলে, ভূমিকা-অংশীদারদের মূল্যবোধ ও নৈতিক প্রত্যাশার সঙ্গে ঐ ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক, মহকুমাশাসক, প্রধানশিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতিনিধি থাকতে পারেন। কিন্তু শিক্ষকের আদর্শ ভূমিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ছাত্রদের প্রতি দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যাশা বিভিন্ন রকম হতে হতে বাধ্য। ফলে, যে কোন, শিক্ষকই ভূমিকাগুচ্ছের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়বেন। কারণ, প্রত্যেকের প্রত্যাশাই তাঁকে বিভিন্নভাবে পূরণ করতে হবে। আবার, একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে যা সত্য ভূমিকাগুচ্ছের অন্তর্গত অন্যান্য মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও তা সত্য।

সমাজে স্থিতিশীল ভূমিকাগুচ্ছের জগতে সম্ভাব্য অশান্তি সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত ভিত্তি হ'ল এই পরিস্থিতি। যে সমাজে পৃথকীকরণের মাত্রা বেশি সেখানে 'ভূমিকা-অংশীদারগণ'ও (role-partners) সমাজের নানা স্তর ও মর্যাদা থেকে আসেন এবং তাদের সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। এই ধরনের সমাজে 'ভূমিকা-দ্বন্দ্বের' সম্ভাবনাও অন্যান্য সমাজের তুলনায় বেশি থাকে। তা সত্ত্বেও প্রতিটি সমাজেই এমন কিছু সামাজিক কৌশল অবলম্বন করা হয় যার সাহায্যে দ্বন্দ্বের ব্যাপকতাকে সংকুচিত করার চেষ্টা করা হয়। এই কৌশলগুলিকে মার্টন ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

প্রথমত, বিশেষ কোনও মর্যাদানুসারী আচরণের সঙ্গে জড়িত ভূমিকা-অংশীদারদের প্রত্যাশার মাত্রা বা তীব্রতা কম-বেশি হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে, কম মাত্রাকে কম গুরুত্ব দিয়ে বেশি তীব্র প্রত্যাশাকে ব্যক্তি যদি বেশি গুরুত্ব দেয় তাহ'লে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। যেমন, স্কুল-শিক্ষকের উপর অভিভাবকদের দাবী যদি স্থানীয় ক্লবের তুলনায় বেশি হয় তাহ'লে শিক্ষক অবশ্যই প্রথমোক্ত দাবীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেবেন।

দ্বিতীয়ত, ভূমিকা-অংশীদারদের সকলেই সমান প্রভাবশালী বা ক্ষমতাশালী নন এবং সেই কারণে নির্দিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির আচরণকেও তাঁরা সমানভাবে প্রভাবিত করতে পারেন না। সুতরাং ক্ষমতার ভারসাম্যের নীতি

অনুসারে ভূমিকাগুচ্ছের শক্তিশালী সদস্যের বিরুদ্ধে যদি ছোটখাট শক্তিসমূহের সমাবেশ ঘটানো যায় তাহ'লেও ভূমিকাধিকারী ব্যক্তি আপেক্ষিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে।

তৃতীয়ত, কোনও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি তার ভূমিকাগুচ্ছের সকল সদস্যের সঙ্গে অবিরাম মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকেন না। তাই, প্রতি মুহূর্তেই তাঁকে অপরের প্রত্যাশার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়েও চলতে হয় না। সুতরাং, যে পরিমাণে ঐ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের কারও কারও সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কোনও কোনও সময় স্থাপন না করেও নির্দিষ্ট মর্যাদার দাবী পূরণ করতে পারে, সেই পরিমাণেই সংঘাতের মাত্রা কমে যায়।

চতুর্থত, ভূমিকাগুচ্ছের অন্যান্য সদস্যরা যতদিন এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবেন যে নির্দিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির উপর তাঁরে প্রত্যাশাসূচক দাবীগুলো ঐ মর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ততদিন তাঁরা এরকম চাপ সৃষ্টি করে যেতে থাকবেন। কিন্তু একবার যদি তাঁদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে দাবীগুলি অনেকটাই অন্যায় ও অসঙ্গত সেক্ষেত্রে মর্যাদানুসারী ভূমিকাপালনকারী ব্যক্তির উপর চাপ কমে যায় এবং সংঘাতের ক্ষেত্রেও সীমিত হয়।

পঞ্চমত, ভূমিকার চাপের মুখে পড়ে মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে এটা বুঝতে হবে যে, সমাজে তিনি একক ব্যতিক্রম নন, তাঁর মত সমান অসহায় অবস্থায় আরও অনেক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি আছেন। কারণ, এটা তো সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক মর্যাদার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, ভূমিকা-দ্বন্দ্বের সমস্যা মানুষকে ব্যক্তিগতভাবেই শুধু নয়, সামাজিকভাবেও মেটাতে হবে। এইজন্যই সমাজে নানাধরনের পেশাগত বা বৃত্তিগত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যাদের কাজই হ'ল ভূমিকার-দ্বন্দ্বে জর্জরিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় 'সামাজিক সমর্থন' (Social support) প্রদান করা।

পরিশেষে, ভূমিকাগুচ্ছের সদস্যদের পরস্পরবিরোধী প্রত্যাশাগুলি যদি মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির আচরণের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে তাহ'লে কোন্য কোনও সময় ঐ ব্যক্তি কিছু কিছু ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য তিনি অন্যান্য ভূমিকার দাবী পূরণ করে চলতে থাকবেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এধরনের ব্যাপার অনেক সময়ে ঘটে। কিন্তু এই পদ্ধতির ব্যবহার সীমিত হ'তে বাধ্য। কারণ ভূমিকাগুচ্ছ ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী তৈরী হয় না। তা সমাজ-কাঠামোরই অঙ্গ যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে মর্যাদার বিষয়টি। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিকেই হয়ত মর্যাদার আসন ত্যাগ করে ভূমিকা-দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই পেতে হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তির প্রস্থান ঘটলেও সমাজকাঠামো স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় চিরপ্রবহমান থাকে।

৬.৭ অনুশীলনী

১। সামাজিক মর্যাদার সংজ্ঞা দিন।
২। আরোপিত মর্যাদার উদাহরণসহ সংজ্ঞা দিন।
৩। অর্জিত মর্যাদা কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।
৪। আরোপিত মর্যাদা ও অর্জিত মর্যাদার পার্থক্য দেখান।
৫। সামাজিক মর্যাদার গুরুত্ব কি?
৬। ভূমিকা কাকে বলে?
৭। ভূমিকাগুচ্ছ কাকে বলে?
৮। ভূমিকাগুচ্ছের মধ্যে সংঘাতের বীজ কেন রোপিত হয়?
৯। কোন্ কোন্ কার্যকরী উপায়ের সাহায্যে ব্যক্তি ভূমিকা-ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারে?

১০। ভূমিকার চাপ কি?

১১। ভূমিকার-দ্বন্দ্ব কাকে বলে? কোন্ কোন্ কারণে ভূমিকার-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়?

১২। মার্টনের মতে সমাজ কিবাবে মর্যাদা ও ভূমিকার অসঙ্গতি দূর করতে পারে?

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Abhijit Mitra, 'R. K. Merton's Role-set : A critique', *in Socialist Perspective,* vol. II, No. 1. June 1974.
2. Petter worsely : *Introducing Sociology* (Penguine Books Ltd., Harmondsworth, 1970).
3. R. K. Merton *op, cit.* (The Free press, N. Y., 1968).

একক ৭ □ সামাজিক স্তরবিন্যাস

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য
৭.২ প্রস্তাবনা
৭.৩ স্তরবিন্যাস
৭.৪ সামাজিক বৈষম্য ও সমাজ পরিবর্তন
৭.৫ দাসতন্ত্র, এস্টেট্, জাতপ্রথা ও শ্রেণী
৭.৫.১ দাসতন্ত্র
৭.৫.২ জমিদারি প্রথা বা এস্টেট্স্
৭.৫.৩ জাতপাত
৭.৫.৪ শ্রেণী
৭.৬ শ্রেণী চেতনা
৭.৭ লিঙ্গভিত্তিক স্তরবিন্যাস
৭.৮ অনুশীলনী
৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ উদ্দেশ্য

প্রথম এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- মনুষ্যসমাজ কিভাবে স্তরবিভক্ত
- সামাজিক বৈষম্যের বিভিন্ন ধরন
- বিভিন্ন যুগে সামাজিক বৈষম্য ও স্তর কিভাবে বিভক্ত হয়েছিল

৭.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক স্তরবিন্যাস মানবসমাজ এক চির-প্রচলিত অবশ্যম্ভাবী ব্যবস্থা। প্রত্যেক সমাজেই কোনও-না-কোনও বৈশিষ্ট্যের, যেমন জন্মগত বৈশিষ্ট্য, অর্থ, কৃতিত্ব প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে প্রভেদ করা হয়। যেমন ভূতাত্ত্বিকরা ভূপৃষ্ঠে মাটি বা পাথরের স্তর খুঁজে পান ঠিক তেমনই সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজের মধ্যে স্তর খুঁজে পান, যাকে বলা হয় সামাজিক শ্রেণী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পৃথিবীতে এমন কোনও সমাজ নেই, যেখানে মানুষে মানুষে প্রভেদের ভিত্তিতে কোনও-না-কোনও ধরনের স্তরবিন্যাস নেই। প্রকৃতপক্ষে স্তরবিন্যাসবিহীন সমাজের অস্তিত্ব অলীক।

৭.৩ স্তরবিন্যাস

সামাজিক সংগঠনের মৌলিক নীতিসমূহের সন্ধান করতে গিয়েই সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করেন। এই স্তরবিন্যাস হ'ল সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যের বহিঃপ্রকাশ। পার্থক্য নানারকমের হ'তে পারে— দৈহিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক বা অর্থনৈতিক। সব ধরনের পার্থক্যই স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করে না। এই পার্থক্যগুলির দ্বারা যখন সমাজের ব্যাপকসংখ্যক মানুষ প্রভাবিত হয়, যখন সমস্বার্থ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে তারা অন্যান্য গোষ্ঠী বা বর্গের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দাবী করে, যখন এই ধরনের স্বাতন্ত্র্য সমাজের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় এবং তার ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সৃষ্টি হয় সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social Stratification)। আয়, সম্পত্তি, ক্ষমতা, মর্যাদা, বয়স, জাতি বা লিঙ্গ, যে কোনও দিক থেকে সমাজের সদস্যরা যখন একটি ক্রমোচ্চ কাঠামোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয়। হ্যারি জনসনের (Harry M. Johnson)-এর মতে, যে প্রক্রিয়া বা অবস্থায় সমাজের বিভিন্ন স্তর বা গোষ্ঠী—মর্যাদার পার্থক্য এমনভাবে গড়ে ওঠে যাতে একই মর্যাদাভুক্ত মানুষেরা একই গোষ্ঠীর সদস্যভুক্ত হয় তাকে স্তরবিন্যাস বলা হয়। ("We shall use 'Ranking' as the most general term referring to degrees of prestige and the term "stratification" for the process or condition in which layers (strata) of persons or groups are ranked differentially so that any one stratum contains many person of groups of roughly the same rank.") ফলে, প্রতিটি স্তরের সদস্যদের মধ্যে জীবনযাত্রা পদ্ধতির মধ্যে যেমন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি উন্নতি অবনতির সম্ভাবনাও মোটামুটি একই রকমে থাকে।

তাহ'লে একটি স্তরের উপরে আর একটি স্তর, এইভাবে যখন কোন জনসমষ্টি বিভক্ত হয় তখন তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলা হয়। পিটার উরস্‌লি (Peter Worsely) সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন ঃ

(১) বিভিন্ন সামাজিক স্তর সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ; এই অর্থে প্রতিটি শ্রেণী একটি স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার অংশ।

(২) বিভিন্ন সামাজিক স্তর একটি ক্রমোচ্চ কাঠামোয় বিন্যস্ত; তাই তাদের মধ্যে ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তনের সম্পর্ক বর্তমান। এই সম্পর্ক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নানা ধরনের হতে পারে।

(৩) সামাজিক স্তরগুলি যে জনসমষ্টি নিয়ে তৈরি হয় তারা নিজেরাই এই বৈষম্য প্রত্যক্ষ করে এবং যে স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা তাদের আচরণকে প্রভাবিত করে তার সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা আছে।

(৪) কোনও সামাজিক স্তরই জড়ভরত নয়; কারণ, প্রতিটি সামাজিক স্তর গোষ্ঠীর জন্ম দেয় যা সমগ্র স্তরের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটায় এবং গোটা ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করে।

(৫) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্তরবিন্যাস ব্যবস্থারও রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটে; এই পরিবর্তনের গতি কখনও ধীর, কখনও বা দ্রুত।

৭.৪ সামাজিক বৈষম্য ও সমাজ পরিবর্তন

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষই মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সম্পূর্ণ সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা তেমন কোনও সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি। কারণ, পৃথিবীর সব দেশেই সামাজিক বৈষম্য প্রকট। এইজন্যই সমাজতাত্ত্বিকদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয় হ'ল সামাজিক বৈষম্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা, তার বিভিন্ন প্রকারভেদ নির্দেশ করা এবং ঐ বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোনও প্রকার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ করা।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই জানা দরকার সামাজিক বৈষম্যের (Social inequality) সমস্যাটিকে সমাজতাত্ত্বিকরা ঠিক কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন। আঁদ্রে বেতেই (Andre Beteilla)-এর কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, সাধারণভাবে সমাজতাত্ত্বিকরা মূল্যমানসূচক দৃষ্টিভঙ্গির (normalive approach) পরিবর্তে প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Positive approach) গ্রহণ করেন। সামাজিক বৈষম্যের বিষয়টিকে তাঁরা পছন্দ করেন কি করেন না সেটি এখানে বড় কথা নয়। নৈর্ব্যক্তিক ও নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিকের চোখ দিয়েই দেখাটা বড় কথা। আর সেটা করেই সমাজতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন যে, সমাজে মানুষকে সাম্য ও অসাম্যের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নি; তাদের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা হ'ল অসাম্যের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে অথবা বিভিন্ন রূপ-এর মধ্যে যে কোনও একটিকে নির্বাচন করার। অর্থাৎ, অসাম্য সমাজকাঠামোর অঙ্গ এটা ধরে নিয়েই তাঁরা রূপ-এর মধ্যে যে কোনও একটিকে নির্বাচন করার। অর্থাৎ, অসাম্য সমাজকাঠামোর অঙ্গ এটা ধরে নিয়েই তাঁরা অসাম্য-বৈষম্যের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন।

অসাম্যের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকরা একমত নন। সামাজিক বৈষম্য, সামাজিক শ্রেণী বা সামাজিক স্তরবিন্যাস যে নামই ব্যবহার করা হোক না কেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে, এই সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ হ'ল সে সমস্ত বৈষম্যের উৎস মানব-প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সেইসব বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাদের উৎস মানুষের বৈষয়িক জীবনের শর্তাবলীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে মানুষে মানুষে অবশ্যই পার্থক্য আছে। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকের কাছে তার গুরুত্ব বেশি নয়; তাঁর আগ্রহ অন্য দিকে। মানুষ সমাজে নানা ধরনের পদমর্যাদার অধিকারী— কেউ জমিদার, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ বা হয়ত হরিজন। এই মর্যাদার পার্থক্য তাদের জীবনধারা ও উন্নতির সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পার্থক্য হিসেবে ফুটে ওঠে। সমাজতাত্ত্বিক এই পার্থক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করতে বেশি আগ্রহ বোধ করেন।

স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবণতার দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যদি দু'টি বড় মানবগোষ্ঠীকে বিচার করা হয় তাহ'লে দেখা যাবে বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তির বণ্টনের প্রকৃতি প্রায় একইরকম। এই হিসেবে দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যেই সাধারণ, মাঝারি ও অসাধারণ বুদ্ধির মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, দু'টি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিকতার দিক থেকে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই।

একথা বলা জরুরী এই কারণে যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে বিভিন্ন নৃকুলগত গোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক গড়নের এমন পার্থক্য আছে যে তাদের উৎকর্ষতার বিচারে একটি ক্রমোচ্চ কাঠামোয় বিন্যস্ত করা যায়। এই বিশ্বাসের নিরিখেই প্রচার করা হয়েছিল যে, কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনায় শ্বেতাঙ্গরা উন্নতশ্রেণীর মানুষ এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নার্ডিকরাই হ'ল শ্রেষ্ঠ নৃকুলগত গোষ্ঠী (Race)।

নৃকুলগত গোষ্ঠী ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক বিচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের উপর অনেকগুলি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছিল। এইসব সমীক্ষার ফল থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেছে যে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষেত্রে দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তবে সাদা চামড়ার লোকদের চেয়ে কালো চামড়ার লোকদের পরীক্ষার ফল তুলনামূলকভাবে খারাপ হওয়ার কারণ হ'ল শ্রেণীব্যবস্থা, ক্ষমতা-কাঠামো ও মর্যাদাভিত্তিক ক্রমোচ্চ কাঠামোয় তাদের অধস্তন অবস্থান।

সুতরাং, বিশ্বের সব সমাজের শ্রেণী, মর্যাদা ও ক্ষমতা ইত্যাদি যে সমস্ত মৌলিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সামাজিক বৈষম্য আলোচনা করতে গেলে সেগুলির উপরেই গুরুত্ব দিতে হবে। দুর্কহাইমের পরিভাষায় এগুলিকে সামাজিক ঘটনা (social fact) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়; কারণ, এদের অস্তিত্ব ব্যক্তির ইচ্ছা বা

অনুভূতির উপর নির্ভরশীল নয় এবং ইচ্ছা বা খুশিমত তাদের বদলানোও যায় না। প্রত্যেক সমাজেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক স্তরবিন্যাস আছে। ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনও স্তরে জন্মগ্রহণ করে এবং সারাজীবন তার সদস্য থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের উন্নতি বা অবনতি ঘটে। কিন্তু তার ফলে স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন হয় না।

আমরা যখন বলি, বৈষম্য হ'ল একটি সামাজিক ঘটনা, তখন তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, সমাজভেদে বৈষম্যের ধরনও বদলে যায়। মার্কিন সমাজের শ্রেণীকাঠামোর জন্য নরওয়ে বা সুইডেনের শ্রেণীকাঠামোর যেমন পার্থক্য আছে তেমনি কমিউনিস্ট চীনের ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে ব্রিটেনের ক্ষমতা-কাঠামোর পার্থক্য আছে। অনুরূপভাবে, ভারতীয় হিন্দুসমাজের জাতপাতের কাঠামো শ্রীলংকা বা থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ সমাজ থেকে পৃথক।

বৈষম্যকে সামাজিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা আর একটি তাৎপর্য হ'ল এই যে, কালের গতিতে স্তরবিন্যাসের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। প্রাক্-বৃটিশ ভারতে যে শ্রেণীকাঠামো বলবৎ ছিল, বৃটিশ-ভারতে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। বিপ্লব-পূর্ববর্তী চীন ও সমাজতান্ত্রিক চীনের শ্রেণীকাঠামোর বিন্যাসের যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

বৈষম্যের কাঠামোর একটি আপাত স্ববিরোধিতা রয়েছে। এটি যেহেতু একটি সামাজিক ঘটনা তাই একে ব্যক্তি তার ইচ্ছেমত বদলাতে পারে না। কিন্তু সামাজিক ঘটনা বলেই তা সমাজের যৌথ অভিজ্ঞতার ফল, আর তাই সেই অভিজ্ঞতা যদি পরিবর্তিত হয় তাহ'লে বৈষম্যেরও রূপান্তর ঘটবে। সব সমাজতাত্ত্বিক এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের দ্বারা বৈষম্যের কাঠামো পাল্টানো যায় না। তবে, প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ সচেতনভাবে হস্তক্ষেপ করে সামাজিক বৈষম্য কতটা দূর করতে পারে সে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

একই সমাজে নানা ধরনের বৈষম্যের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক সমাজে যে বৈষম্য সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হ'ল শিক্ষা, বৃত্তি বা পেশা এবং আয়ের বৈষম্য। আবার ক্ষমতার বৈষম্যও সমাজে কেটি কর্তৃত্বের কাঠামো সৃষ্টি করে যা জনসাধারণকে শাসক ও শাসিত এই দু'টি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। এছাড়া রয়েছে মর্যাদার তারতম্য যার ভিত্তিতে সমাজের কিছু কিছু মানুষ অন্যান্যদের তুলনায় বেশি মর্যাদার অধিকারী হন।

একেকজন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক বৈষম্যের একেকটি দিকের উপর জোর দিয়েছেন। অধিকাংশের কাছেই অর্থনৈতিক উপাদান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একে সহজেই পরিমাপ করা যায়। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে আয় ও পেশাকে বৈষম্যের নির্ধারক হিসেবে বিচার করা হয়। উভয়ের ভিত্তিতেই সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নির্দেশ করা যায়।

অর্থনৈতিক উপাদানের কথা বললেই কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)-এর কথা মনে আসে। তাঁর তত্ত্বকে একসময় 'অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ' (economic determinism) বলে সমালোচনাও করা হয়েছিল। কিন্তু মার্ক্স সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে আয় (income) ও পেশা (occupation)-এর মাপকাঠি ব্যবহার করেননি। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যক্তির অবস্থানের উপর। কারা উৎপাদন-উপকরণসমূহের মালিক আর কারা নয়—এর ভিত্তিতেই তিনি শ্রেণীর চরিত্র নির্ধারণ করেছেন, অর্থাৎ আয় বা পেশা নয়, সম্পত্তিই হ'ল মার্ক্সের মতে বৈষম্য-নির্ণায়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বণ্টনজনিত বৈষম্যের উপর যাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। চতুর্দশ শতাব্দীর আরব ঐতিহাসিক ইবন্ খালদুন (Ibn Khaldun) বলেছিলেন, ক্ষমতার দখলই ঐশ্বর্য্যের উৎস। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় পারেতো (Pareto), মস্কা (Mosca), মিকেল (Michel) বা রাইট মিল্স (Wright-Mills)-এর মত প্রবরবাদী (elitist) সমাজবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক উপাদানকেই বৈষম্যের প্রধান কারণ বলে গণ্য করেছিলেন। তাঁদের মতে, সমাজের মূল বৈষম্য ধনী-দরিদ্র বা বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যে নয়। প্রবর (elites) ও জনগণ (masses) বা শাসক ও শাসিতদের মধ্যে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানের পাশাপাশি মর্যাদা (Status)-কেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের উল্লেখযোগ্য উপাদানরূপে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে সম্পত্তি বা ক্ষমতার তুলনায় সম্মান (esteem) ও আভিজাত্যের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। তবে কোন্ কোন্ গুণাবলী ব্যক্তির জন্য সম্মান আদায় করবে তা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম। সাবেকি ভারতীয় সমাজে আচারের বিশুদ্ধতা যেমন মর্যাদার দ্যোতক ছিল তেমনি প্রাচীন চীনা সমাজে বিদ্যাচর্চায় সৌকর্য্য মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপের বীরত্ব বা শিভ্যালরী (Chivalry) সংক্রান্ত ধারণা মর্যাদা নির্ণয়ে সাহায্য করত। আধুনিক শিল্পসমাজেও নানা ধরনের মর্যাদা-গোষ্ঠী (status-group) গড়ে উঠেছে। মার্কিন লেখক ভ্যান্স প্যাকার্ড (Vance Packard) তাঁর "status seekers" শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন, শহরের কোন্ এলাকায় ব্যক্তি বসবাস করেন, কোন্ স্কুলে তাঁর ছেলেমেয়েরা পড়ে বা কোন্ মডেলের মোটরগাড়ি তিনি ব্যবহার করেন এসবের উপরেই আধুনিক মার্কিন সমাজে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

শ্রেণী, ক্ষমতা মর্যাদাকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের তিনটি প্রধান দিক হিসেবে গণ্য করা জার্মান সমাজবিজ্ঞানী মাক্স হ্বেবারের (Max Weber) বিশেষ অবদান। স্তানিস্‌ল ওসায়স্কি (Stanislaw Ossowski) অবশ্য তাঁর 'Class Structure in the Social Consciousness' (1963) গ্রন্থে সামাজিক বৈষম্যের অন্য তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) ধনী ও দরিদ্র, (খ) শাসক ও শাসিত, এবং (গ) শ্রমিক ও পরশ্রমভোগী।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন দিকের (dimension's) সম্পর্কে বেশ জটিল। এ বিষয়েও সমাজতাত্ত্বিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। মার্ক্সবাদীরা প্রতিটি সমাজে ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্রমোচ্চ বিন্যাসকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁরা এই বিন্যাসকে শ্রেণী-পার্থক্য থেকে উৎসারিত বলে মনে করেন; কারণ শ্রেণীগত বৈষম্যকেই তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

ম্যাক্স হ্বেবারের মত বহুত্ববাদীরা আবার অর্থনৈতিক পার্থক্যের গুরুত্বকে অস্বীকার না করলেও মর্যাদা ও ক্ষমতার পার্থক্যকেও সমাজ গুরুত্ব দেন এবং তাঁরা একথাও বলেন যে ক্ষমতা ও মর্যাদার পার্থক্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয়। হ্বেবার অবশ্য একথা বলেন নি যে, অর্থনৈতিক উপাদান নিরপেক্ষভাবেই ক্ষমতা ও মর্যাদা সমাজে কার্যকর হয়। বরং, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শ্রেণী, মর্যাদা ও ক্ষমতা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কে আবদ্ধ।

বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নমনীয় বলেই সমাজতত্ত্বে তার বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্বে স্তরবিন্যাসের এক একটি দিক প্রাধান্য অর্জন করে। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে মর্যাদার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সম্পত্তির শাসন, বাজারের শক্তি এবং পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে সমাজের শ্রেণীবিভক্তি, পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই মার্ক্স অর্থনৈতিক উপাদানের উপর এত জোর দিয়েছিলেন। অন্যদিকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলিতে মিলোভান্ জিলাস (Milovan Djilas) কথিত 'নয়া শ্রেরী'-র ('The New Class') উত্থান ব্যাখ্যা করতে হলে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বণ্টনের প্রতি বেশি নজর দিতে হবে।

মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বা বৈষম্য ও শোষণভিত্তিক সমাজ মানব ইতিহাসের একটি সাময়িক ব্যবস্থামাত্র। কারণ আদিম সাম্যবাদী সমাজে যেমন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না তেমনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজও হবে শ্রেণীহীন ও শোষণহীন। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা এখনও পর্যন্ত মার্ক্সের দূরদৃষ্টির সপ্রমাণ করতে পারে নি। উপজাতি বা আদিম সমাজগুলি সম্পর্কেও নৃবিজ্ঞানীরা যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ঐসব সমাজে লিঙ্গ, বয়স ও জ্ঞাতিসম্পর্ক নানাভাবে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। সুতরাং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এটাই প্রমাণ করে যে, বৈষম্য সমস্ত মানবসমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যে কোনও দেশের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, সামাজিক বৈষম্যজনিত অনাচার যখন চরম পর্যায়ে ওঠে তখনই তার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। আমাদের দেশে অতীতে গৌতম বুদ্ধ বা মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য যে সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার মূলে ছিল সাম্য প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আগ্রহ। আবার ব্রিটিশ শাসনকালে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর পর্যন্ত যে অসংখ্য ব্যক্তি ও সংগঠন ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তারও প্রেরণা এসেছিল নারীর সামাজিক মর্যাদাহানি ও অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক ঘটনাগুলি থেকে। অন্যদিকে মার্ক্স যে শ্রেণীসংগ্রামকে ইতিহাসের চালিকাশক্তি বলে বর্ণনা করেছিলেন তার কারণ হ'ল শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীশোষণ।

সামাজিক বৈষম্য যেমন সমাজপরিবর্তনে প্রেরণা দেয়, তেমনি সমাজপরিবর্তনের ফলে সামাজিক বৈষম্যের ধরনেও পরিবর্তন আসে। বিগত দু'শ বছরে সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সেই কারণেই শিল্পসমাজগুলিতেই তাদের বেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে এই পরিবর্তনের প্রকৃতি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলেই ঐ সমাজের পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে টক্‌ভিল্ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। কারণ, তা মানুষের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করবে।

অনেকের মতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন দিক আগের তুলনায় অনেক বেশী জটিল হয়ে পড়েছে। আগে যেমন বিভিন্ন স্তরের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা যেত এখন তা ততটা স্পষ্ট নয়। ব্যক্তিগত সচলতা বৃদ্ধিই এর অন্যতম কারণ। তবে আরও মৌলিক কারণ হ'ল শিল্প-অর্থনীতির বিকাশ; কারণ, অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে দারিদ্র্য ও অভাব দূর হয় এবং তার ফলে বৈষম্যও হ্রাস পায়। অবশ্য, নতুন ও আরও পরিশীলিত বৈষম্যের উদ্ভবের সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়াও আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। টি. এইচ. মার্শাল (T. H. Marshall) ইংল্যাণ্ডে আইনী, রাজনৈতিক ও পৌর সাম্যের বিকাশের কথা বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশেও গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং তারই সঙ্গে তফশীলি জাতি ও উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের উন্নতির জন্য যে বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ফলে সামাজিক সাম্যের পথও প্রশস্ত হয়েছে।

তবে, প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে আরও অনেক দূর যেতে হবে; কারণ, সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য এখনও প্রকট। শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের মধ্যে সকলের সমান সুযোগের নীতি এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য প্রকট। কিভাবে এই বৈষম্য দূর করা যায় তার সমাধানের পথ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, সাধারণভাবে বলা যায় যে, (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে এবং (খ) সচেতন মানবিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সম্প্রসারিত করে আমরা সামাজিক বৈষম্যকে অনেকটা সহনীয় করে তুলতে পারি।

৭.৫ দাসতন্ত্র, এস্টেট্‌স, জাতপ্রথা ও শ্রেণী

বিভিন্ন শ্রেণীতে এবং স্তরে সমাজের বিভক্তি এবং তার ভিত্তিতে মর্যাদা ও ক্ষমতার ক্রমোচ্চ বিন্যাস সব সমাজ কাঠামোতেই দেখা যায়। তবে, সমাজতাত্ত্বিকেরা চারটি প্রধান সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা—যথা, দাসব্যবস্থা, জমিদারী ব্যবস্থা, জাতপাত এবং সামাজিক শ্রেণীভেদ এবং এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই যেসব মর্যাদা সম্পন্ন ও প্রবর গোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য করেন। এখানে প্রত্যেকটি ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

৭.৫.১ দাসতন্ত্র

দাসতন্ত্রকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রাচীনতম ব্যবস্থা বলা যায়। মার্ক্স-এঙ্গেলসের মতে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যাবার পর প্রথম যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল। তার ভিত্তি ছিল দাসতন্ত্র। শুধু প্রাচীনতমই নয়, দাসপ্রথা হ'ল চরম বৈষম্যমূলক ও মানবতার পক্ষে চরম অবমাননাকর।

এই বিষয়ে ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী হবহাউস (L. T. Hobhouse) তাঁর *'Morals in Evolution' (1906)* গ্রন্থে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ক্রীতদাস হ'ল সেই ব্যক্তি যাকে আইন ও প্রথা অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি বলে গণ্য করে। চরম দাসতন্ত্রে ক্রীতদাসকে যাবতীয় অধিকারবিহীন তুল্য বিবেচনা করা হয়— কোনও কোনও বিষয়ে হয়ত সে নিরাপত্তা ভোগ করে, তবে সে ধরনের নিরাপত্তা ষাঁড় বা গাধারও আছে। ভূমিদাসের সঙ্গে ক্রীতদাসের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ভূমিদাসও ক্রীতদাসের মত তার প্রভুর নির্দেশে শ্রম করতে বাধ্য থাকে এবং অন্যায়-অপরাধের জন্য শাস্তি পায়। কিন্তু ভূমিদাস এমন কিছু অধিকার পায় যা সমতাব্যঞ্জক— যেমন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার—যার থেকে তাকে কখনই বঞ্চিত করা যায় না।

অতএব, দাসপ্রথায় কোনও কোনও গোষ্ঠী হয় সম্পূর্ণভাবে নয়ত অনেকাংশেই সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন সমাজে দাসপ্রথার প্রচলন দেখা গেছে। তার মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হ'ল প্রাচীনকালের গ্রীস ও রোমের দাসসমাজ এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথা।

যুদ্ধের ফলে অনেক সময় দাসপ্রথার উদ্ভব হ'ত। প্রাচীনকালে যুদ্ধে পরাজিত মানবগোষ্ঠী স্ত্রী-পুত্রকন্যা সমেত বিজয়ী গোষ্ঠীর সম্পত্তি তথা দাসে পরিণত হ'ত। যে ক্ষেত্রে বিজয়ী এবং বিজিত গোষ্ঠীর গায়ের রং বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ধরনের হ'ত, সেক্ষেত্রে দাসপ্রথা জাতিগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করত। এভাবেই গ্রীস ও রোম 'স্বভাবগত দাসের' (Slave by nature) ধারণা তৈরি হয়েছিল।

দাসপ্রথা টিকেও ছিল নানাভাবে দাসদের মধ্যে আন্তর্বিবাহ, যুদ্ধবন্দীদের আটকে রাখা, ঋণগ্রস্ততার জন্য শাস্তিদান ইত্যাদি নানা উপায়ে এই ব্যবস্থা ধারাবাহিকতা বজায় রাখত। কম্বোডিয়ার বন্নরদের (Bannars) মধ্যে এমন কি মিথ্যে কথা বলার শাস্তি হিসেবেও কোনও ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করা হ'ত।

চরম দাসত্ব এমন একটি অবস্থা যার থেকে আর নীচে মানুষ নামতে পারে না, কারণ সে অবস্থায় তার কোনও আইনী ব্যক্তিত্বই থাকে না, কোনও প্রকার মানবিক অধিকারও তার থাকতে পারে না। দাস হ'ল একটি বস্তু, কোনও ব্যক্তি নয়—সে অন্যের মালিকানাধীন এবং সম্পত্তির মালিক যেমন তার সম্পত্তি নিয়ে যা খুশি করতে পারে ক্রীতদাসের মালিকও ঠিক তেমনি তার দাসকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "Slavery as on industrial System" গ্রন্থে নিব্যয়ার (H. J. Neiboer) দাসপ্রথার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, প্রত্যেক ক্রীতদাসের একজন মালিক থাকে; সে ঐ মালিকের অধীন। কোনও বিশেষ আইনের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে তাদের সম্পর্ক হ'ল ঃ ক্রীতদাস তার মালিকের 'স্বত্বাধিকার' বা সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, ক্রীতদাসের সামাজিক অবস্থান স্বাধীন মানুষের তুলনায় নগণ্য। ক্রীতদাস কোনও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না, নির্বাচনে অংশ নিতে পারে না বা কোনও জনপ্রতিনিধি সভায় যোগ দিতে পারে না; কারণ, সামাজিকভাবে সে ঘৃণা। তৃতীয়ত, দাসব্যবস্থার সঙ্গে বাধ্যতামূলক শ্রম সর্বদা জড়িত থাকে। স্বাধীন শ্রমিক যেমন ইচ্ছে করলেই এক মালিকের কাজ ছেড়ে অন্য মালিকের কাজ নিতে পারে বা অনাহারে থাকা শ্রেয় মনে করলে কাজ ছেড়েই দিতে পারে ক্রীতদাস তা পারে না—তার শ্রম বাধ্যতামূলক। দাসপ্রথার প্রকৃত ভিত্তি অর্থনীতি। নিব্যয়ারের মতে, এটি একটি শিল্প-ব্যবস্থা। দাসব্যবস্থার উদ্ভবের পর্বে সমাজে একধরনের অভিজাততন্ত্রও দেখা দিয়েছিল এবং অবধারিতভাবে অভিজাত শ্রেণী দাসদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করত। *The Material Culture and Social Institution to the Simple Peoples (1915)* গ্রন্থে হবহাউস, হুইলার ও গিন্‌স্‌বার্গ

দেখিয়েছেন, পিগ্‌মি বা সোমাঙ্গদের মত আদিম সরলতম সমাজ-ব্যবস্থাগুলিতে ক্রীতদাস বা ভূমিদাসের কোনও অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু সমাজের সংগঠনের যত জটিলতা দেখা দিতে থাকে, সমাজের শক্তিগুলি যত পৃথক হ'তে থাকে এবং যতই তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সংগঠিত হ'তে থাকে, তখনই সমাজে দাসপ্রথার আবির্ভাব হয়। তাঁদের মতে, অধিকতর উন্নত সমাজে দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটে নৈতিক কারণে, যেহেতু মানুষকে আর শুধুমাত্র বস্তু হিসেবে গণ্য করা অনৈতিক বলে মনে হ'তে থাকে।

তবে, অধিকাংশ লেখরে মতে, দাস-শ্রম ছিল অনুৎপাদনশীল এবং সেটাই দাস্যবস্থার পতনের কারণ। টম বটোমোর অবশ্য এই ব্যবস্থার পতনের কারণ হিসেবে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করেছেন যার সূত্র প্রাচীনকালের ইতিহাসে পাওয়া যায়। দাসব্যবস্থা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ঊর্ধ্বে ছিল না। ক্রীতদাসকে সম্পত্তির তুল্য 'বস্তু' হিসেবে দেখা এবং স্বাভাবিক অধিকারভোগী মানুষ হিসেবে দেখা এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত দেখা দিয়েছিল। এর ফলেই সম্ভবত গ্রীস রোম উভয় দেশেই বিদেশীয় ক্রীতদাস এবং স্বজাতীয় গোষ্ঠী থেকে আসা ক্রীতদাসের মধ্যে পার্থক্য করা শুরু হয়েছিল। আইনবিশারদ সোলোন (Solon) এথেন্সে অধমর্ণকে দাসে পরিণত করার প্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। স্টোইক (Stoic) দার্শনিকদের প্রভাবে রোমেও এই প্রথা বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

দাসব্যবস্থা সমাজকে শোষক প্রভু ও শোষিত দাস এই দুটি বৈরী শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল এবং তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম। সমগ্র দাসযুগ ধরে অবশ্য দাসবিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী দাসবিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীসংগ্রামের অনুষঙ্গ হিসেবে দাসমালিকদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা উপর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ক্রীতদাসদের জন্য বিবাহ, সম্পত্তি অর্জন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি কিছু কিছু ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং দাসত্ব থেকে মুক্তিদানও করা হয়। এসবের ফলে প্রাচীনকালেই ক্রীতদাসপ্রথা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মীয় গীর্জার আনুকূল্যে ও উৎসাহে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত দাসদের মুক্তিদানের ব্যবস্থাও হয়েছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে দাসপ্রথার প্রচলন আর দেখা যায় নি। কিন্তু চারশ' বছর পরে আমেরিকায় যখন নতুন ধরনের দাসব্যবস্থার জন্ম হ'ল তা দমন করার জন্য একদিকে গৃহযুদ্ধের মত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম যেমন করতে হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে উইলবারফোরস্, হাচেসন্, ওয়েস্‌লি এবং এ্যাডাম স্মিথের মত নতুন নৈতিকতার প্রবক্তাদের ও দ্য সোসাইটি অফ্ ফ্রেন্ডস্— এর মত ধর্মসংস্কারদের প্রচারে নামতে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার ঘোষণাপত্র দাসত্বকে মানবতার অস্বীকৃতি বলে ঘোষণা করে, যার ফলে সফল রূপায়নের জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এখন সংগ্রাম করে চলেছে।

৭.৫.২ জমিদারি ব্যবস্থা ও এস্টেট্‌স

এই ব্যবস্থার জন্ম প্রধানত হয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসকেই এস্টেট্‌স্ ব্যবস্থা বলা হয়। এটি হ'ল একধরনের জমিদারি ব্যবস্থা। ইংরেজীতে state কথাটির অর্থ একজন জমিদার বা মালিকের অধীনে জমি। কিন্তু ইউরোপে ও রাশিয়ায় একধরনের শ্রেণীব্যবস্থা বোঝাতে কথাটি ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীব্যবস্থায় সমাজ যে ভিন্ন গোষ্ঠী বা স্তরে বিভক্ত থাকত তাদের প্রত্যেকটিকে এস্টেট্ বলা হত। এই অর্থেই ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ অভিজাত, যাজক ও সাধারণ এই তিনটি এস্টেট্-এ বিভক্ত ছিল। এই ব্যবস্থাও ছিল প্রচণ্ড বৈষম্যমূলক।

সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের জমিদারি ব্যবস্থার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথমত, আইনের দ্বারা এস্টেট্‌স স্থিরীকৃত হ'ত। প্রতিটি এস্টেট্ নির্দিষ্ট "সামাজিক মর্যাদা" ভোগ করত। আইন যে অধিকার ও কর্তব্য এবং বিশেষ সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব স্থির করে দিত তার ভিত্তিতেই এস্টেটের সামাজিক মর্যাদা নির্দিষ্ট হ'ত। সুতরাং, এখানে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন শাসকশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করত ও তাদের স্বার্থ দেখত। যেমন, দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন ভূমিদাস প্রথার (Serfdom) প্রসার ঘটছিল তখন সামন্ত রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ভূমিদাসের রাজার কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনার অধিকার ছিল না, গৃহপালিত পশু ও কৃষিজমির স্বত্বাধিকার সে ভোগ করত না এবং 'মেরসে' ও 'হেরিয়ট' নামে প্রচলিত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকত।

দ্বিতীয়ত, ব্যাপক সামাজিক শ্রম-বিভাগের ফলেই এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ফলে প্রত্যেকটি সামাজিক বর্গেরই নির্দিষ্ট কার্য ছিল। যেমন, জমিদার বা ভূস্বামীর কর্তব্য সবাইকে রক্ষা করা, পাদ্রির কর্তব্য সবার জন্য প্রার্থনা করা আর সাধারণের কর্তব্য সবার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক এস্টেট্‌স্ ছিল রাজনৈতিক গোষ্ঠী। স্টাব তাঁর *Constitutional History of England* (1874-8) গ্রন্থে লিখেছেন—"এস্টেট্‌স্-সভা একটি সংগঠিত সমষ্টি...বিভিন্ন স্তর, এস্টেট্‌স্ অথবা মর্যাদার মানুষকে নিয়ে, যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বীকৃত হ'ত।" এই কারণে ভূমিদাসদের স্বতন্ত্র এস্টেট্‌স্ বলে গণ্য করা হ'ত না। গোড়াতে সামন্ততন্ত্রে এস্টেট্‌স্ বলতে শুরু জমিদার অভিজাত ও যাজক সম্প্রদাকেই বোঝাত। দ্বাদশ শতাব্দীর পর সামন্ততন্ত্রের পতন শুরু হ'লে তৃতীয় এস্টেট্‌সের আবির্ভাব হয়। তবে এই স্তর কিন্তু ভূমিদাস বা জমিদারের অধীনস্থ প্রজাদের নিয়ে গঠিত হয় নি; গঠিত হয়েছিল শহরবাসী বুর্গারদের নিয়ে। এদের থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম যারা সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল।

সামন্ত্রতান্ত্রিক এস্টেট্‌স্ ব্যবস্থা অবশ্য আগে অনেক বেশি জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। সামাজিক সচলতার সুযোগ প্রায় ছিল না। তাই এটি হয়ে উঠেছিল একটি অনমনীয় ব্যবস্থা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক (Mark Block) তাঁর *Feudal Society* (1939-40) গ্রন্থে বিভিন্ন এস্টেট্‌স্-এর পার্থক্য এবং সামন্ততন্ত্রের রাজনৈতিক দিকটিকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

৭.৫.৩ জাতপাত

জাতপাত ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক বিশেষ উদাহরণ যা প্রধানত প্রাচীন ও আধুনিক ভারতেই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, একথা বলা অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর আর কোথাও এধরনের স্তরবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন মিশর, জাপান ও রোম এবং মাসাই, সোমালি, পলিনেশীয়, বর্মী প্রভৃতি উপজাতি সমাজেও জাতপাত ব্যবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা গেছে; তবে, ভারতে এই ব্যবস্থা কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

স্যার এডোয়ার্ড ব্লান্ট (E. A. H. Blunt) জাত (caste)-এর যে ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে এ. সি. বার্ণাবানে, এস. সি. মেহ্‌তা প্রমুখ ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকরা সমর্থন করেছেন। ব্লান্ট-এর মতে, জাত হ'ল একটি আন্তর্বিবাহ গোষ্ঠী বা একাধিক আন্তর্বিবাহ গোষ্ঠীর সমষ্টি যার একটি সাধারণ নাম আছে, যার সদস্যপদ বংশানুক্রমিক, সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে যা সদস্যদের উপর নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করে, যার সদস্যরা হয় গতানুগতিক একই ধরনের পেশা অবলম্বন করে নয়ত সাধারণ উৎসের তত্ত্বে বিশ্বাস করে এবং যা সাধারণভাবে একটি সমসত্ত্ব সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং, জাত-এর নিম্নলিখিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা যায় ঃ

(ক) আন্তর্বিবাহ ও বংশগতি ঃ ব্যক্তি যে জাতে জন্মগ্রহণ করে তার সদস্য হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করে। প্রতিটি জাত কতকগুলি গোষ্ঠীতে বা উপজাতে (Sub-Caste) বিভক্ত থাকে, যারা প্রত্যেকেই আন্তর্বিবাহ প্রথা মেনে চলে। অর্থাৎ হিন্দু নারী বা পুরুষকে তার জাতের মধ্যেই বিবাহ করতে হবে। এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে জাতিচ্যুত হওয়ার আশংকা থাকে।

(খ) **সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রমোচ্চ কাঠামো ঃ** জাতপাত সমাজে একটি ক্রমোচ্চ কাঠামো সৃষ্টি করেছে যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক সমগ্র কাঠামোটিকে ধরে রাখে। 'পুরুষসুক্ত' অনুসারে হিন্দুসমাজ চতুর্বর্ণে বিভক্ত। উচ্চ থেকে নীচ মর্যাদার ক্রম অনুসারে এরা হ'ল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে অন্য তিনটি বর্ণের স্থির হয়। যেমন, যে জাত-এর হাতে রান্না করা 'পাকা' খাবার ব্রাহ্মণ গ্রহণ করবেন সেই জাত-এর মর্যাদা তত বেশি। ব্রাহ্মণও দ্বিজ শ্রেণীভুক্ত অন্য দুই বর্ণ যে সমস্ত বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক বিশেষাধিকার ভোগ করে শূদ্র বা অন্ত্যজরা তা করে না। এভাবেই অস্পৃশ্যতাবাদের মত সামাজিক অভিশাপ, বর্ণহিন্দু সমাজকে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে রাখে। জাতপাত সম্পর্কে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা বর্ণব্যবস্থার মূলে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বসের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন, কর্মের ধারণা যা "একজন হিন্দুকে এই শিক্ষা দেয় যে, সে বিশেষ কোনও একটি জাতে জন্মগ্রহণ করার কারণ তার কর্মফল"—এবং ধর্মের ধারণা—যা আসলে কতকগুলি কর্তব্যবিধি—"জাতপাত ব্যবস্থার" মধ্যে নিহিত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের তত্ত্বকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, অপবিত্রতার ধারণাও "জাতপাত ব্যবস্থার মূলে আছে, জাতপাতের সব সম্পর্কই এর দ্বারা পরিচালিত হয়।" দ্যুমঁ-ও এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, 'শুদ্ধ' ও 'অশুদ্ধের' মধ্যে যে ধর্মীয় পার্থক্য করা হয় তাই জাতপাত ব্যবস্থার ভিত্তি।

(গ) **বংশানুক্রমিক পেশা বা বৃত্তি ঃ** জাতপাতের অর্থনৈতিক তাৎপর্যও স্পষ্ট। বেশিরভাগ জাতপাতই পেশা-গোষ্ঠী—চিরায়ত গ্রামীণ অর্থনীতিতে জাতপাতই দ্রব্যাদি ও সেবাকার্যের, বিনিময়ের প্রধান বাহন। প্রতিটি জাত বংশানুক্রমিকভাবে নিজস্ব পেশা অনুসরণ করে। এই পেশার কারণেই কুনবি (কৃষক), তেলি, মুচি, চামার, লোহার, ছুতার ইত্যাদি জাতের নামকরণ হয়েছে। পেশার পরিবর্তনের ফলে নতুন জাতেরও সৃষ্টি হয়।

(ঘ) **বিধিনিষেধ ঃ** উচ্চ-বর্ণযুক্ত জাতগুলি তাদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য খাদ্য, পানীয়, পাত্র, মেলামেশা ইত্যাদি নানা বিষয়ে নীচু জাতগুলির উপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করে। এভাবেই তারা সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চায়।

(ঙ) **কর্তৃত্ব ঃ** সাবেকী জাত ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত উঁচু বর্ণ ও জাতের কর্তৃত্ব বজায় রাখত। জাতপাতের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করলে পঞ্চায়েত শাস্তি বিধানও করত। তবে, আদালতের কর্মকাণ্ড প্রসারের ফলে পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব অনেকাংশে লোপ পেয়েছে।

জাতপাত ব্যবস্থার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সাবেকী বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে বর্ণ ও জাতের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। কারণ ভারতীয় সমাজ যে ২৫০০ জাত ও উপজাতে বিভক্ত তারা সর্বভারতীয় পর্যায়ে বর্ণভেদ মানলেও আঞ্চলিক স্তরে তাদের মর্যাদা ও সম্পর্কের নানা হেরফের ঘটে। শ্রীনিবাস 'প্রাধান্যকারী জাত' (Dominant caste)-এর ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক কারণে প্রতিপত্তিশালী জাত ক্ষেত্রবিশেষে ব্রাহ্মণের কাছ থেকেও সমীহ আদায় করতে পারে বা নীচু জাতের কাছে সংস্কৃতায়নের আদর্শ হিসেবে কাজ করতে পারে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের যে ধারা বৃটিশ শাসনের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে জাতপাতের কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে, উচ্চ জাতের মত ততটা না হ'লেও নীচু জাতের লোকেরাও এখন শিক্ষা ও সম্পদ আহরণের সুযোগ পাচ্ছে। গ্রামীণ জীবনের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে দুবে (S.C. Dube) আলোচনা করে দেখিয়েছেন, এখন নিচু জাতের যে কোনও ব্যক্তি সম্পদ, শিক্ষা অথবা ব্যক্তিগত যোগ্যতার বলে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হ'তে পারেন। বেইলী ও (F.G. Bailey) তাঁর *Caste and the Economic Frontier (1957)* গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতির "সীমানা প্রসারিত" হওয়ার

ফলে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং আর্থিক বিনিময় বৃদ্ধির ফলে জমি এখন আর সম্পদের প্রধান উৎস নয়। ফলে, নীচু জাতের যে কেউ এখন বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনশালী হয়ে জমি কিনে ক্ষমতা ও মর্যাদা অধিগত করতে পারেন। তাছাড়া, গ্রামের ছোট জাতেরা আত্মরক্ষার জন্য সরকারী আমলা ও প্রশাসনিক সংস্থার কাছে সাহায্যের আবেদন করতে পারে।

বটোমোরের মতে, জাতপাতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা গ্রাম থেকে শহরে বেশি, কারণ অপেক্ষাকৃত বেশি অর্থনৈতিক পরিবর্তন, নগরজীবনের নৈর্ব্যক্তিক এবং শহরের বৌদ্ধিক জীবন সামাজিক সচলতার সহায়ক। শ্রীনিবাস, রুডলফ্ ইত্যাদির বহু সমাজতাত্ত্বিক এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, জাতপাতের ভিত্তিতে গঠিত সঙ্ঘ-সমিতির দ্রুত সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে—বিশেষত শহরাঞ্চলে। এর ফলে আবার আধুনিক ভারতে জাতপাত সচেতনতা বেড়েছে। নির্বাচনী রাজনীতিতেও যে জাতপাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সমাজজীবন এখন অনেক বেশি খোলামেলা। জাতপাতভিত্তিক সংগঠন গঠিত হ'লেও তা হয় সম্পদ অর্জন, শিক্ষার সুযোগ এবং সামাজিক মর্যাদার লক্ষ্য পূরণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে। এগুলি আসলে আধুনিক ধরনের স্বার্থবাহী গোষ্ঠী, যারা জাতপাতকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠলেও, অন্য অর্থে সাবেকী জাতপাতকে বাতিল করে দিচ্ছে। এদের মধ্য থেকেই আধুনিক সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীগুলি সম্ভবত গড়ে উঠবে।

৭.৫.৪ শ্রেণী

এতক্ষণ যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের পর্যালোচনা করা হ'ল সামাজিক শ্রেণীব্যবস্থা তার থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন। সামাজিক শ্রেণী (Social Class) প্রকৃত অর্থেই গোষ্ঠীই, তবে এই ধরনের গোষ্ঠী ধর্ম বা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট বা স্বীকৃত নয়। শ্রেণী কোনও বদ্ধ (closed) গোষ্ঠী নয়, তুলনামূলকভাবে 'মুক্ত' (open) গোষ্ঠীই একে বলা যায়। শ্রেণীর ভিত্তি মূলত অর্থনৈতিক—এটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ কমই আছে। কিন্তু তাই বলে শ্রেণী বলতে শুধু অর্থনৈতিক গোষ্ঠীকেই বোঝায় না; আরও বেশি কিছু বোঝায়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে যে শিল্পাশ্রয়ী পুঁজিবাদী সমাজ বিশ্বে গড়ে উঠেছে শ্রেণী সেই সমাজেরই বৈশিষ্ট্যসূচক গোষ্ঠী। সাধারণভাবে বলা যায়, শ্রেণী হ'ল একটি বর্গ বা গোষ্ঠী যার সমাজে একটি সুনির্দিষ্ট মর্যাদা আছে এবং সেই মর্যাদাই অন্যান্য বর্গ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এই অর্থে শাসক শ্রেণী যেমন একটি শ্রেণী, গৃহভৃত্য বা ঝাড়ুদারেরাও তেমনি শ্রেণী। তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য মর্যাদা ও ক্ষমতার।

দাসত্ব, জাতপাত এস্টেট্স্-এর সঙ্গে শ্রেণীব্যবস্থার অনেকগুলি পার্থক্য আছে। তাদের মধ্যে চারটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) আইনের নির্দেশ বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ফলে যে দাস-দাসমালিক, বিভিন্ন বর্ণ ও জাত এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এস্টেট্-এর মর্যাদা ও ভূমিকা স্থির হয়, শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা ঘটে না; শ্রেণী আইনী বা ধর্মীয় ব্যবস্থাপত্রের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আইন বা প্রথা নির্দেশিত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক অবস্থান শ্রেণীর সদস্যপদ নির্ণয় করে না। অর্থাৎ, শ্রমিকের ছেলে শ্রমিকশ্রেণীরই সদস্য হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা প্রশাসক হয়ে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যপদ লাভ করতে পারে। অতএব অন্যান্য স্তরবিন্যাসের তুলনায় শ্রেণীব্যবস্থা অনেক বেশি নমনীয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যও তাদের তুলনায় কম সুস্পষ্ট। বিভিন্ন শ্রেণীর নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনও আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা থাকে না।

(খ) অন্যান্য স্তরবিন্যাসে ব্যক্তি জন্মসূত্রেই তার মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এই মর্যাদাকে বলা হয় আরোপিত মর্যাদা (Ascribed Status)। কিন্তু ব্যক্তি শ্রেণীর সদস্যপদ অর্জন করে। শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মদক্ষতা, প্রতিভা ইত্যাদির জোরে ব্যক্তি যে শ্রেণীগত মর্যাদা লাভ করে তাকে বলা হয় অর্জিত মর্যাদা (Achieved

Status)। এই কারণেই অন্যান্য স্তরবিন্যাসের তুলনায় শ্রেণীব্যবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী ও অধোগামী সামাজিক গতিবিধি ও সামাজিক সচলতার (Socal Mobility) সুযোগ সাধারণত বেশি।

(গ) বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্যের উপর শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। ধনসম্পদের উপর অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং উৎপাদন-উপকরণ বা বৈষয়িক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বৈষম্য হ'ল শ্রেণীগত পার্থক্যের ভিত্তি। কিন্তু অন্যান্য ধরনের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বাদে অন্যান্য উপাদান বেশি গুরুত্ব অর্জন করে; যেমন, ভারতীয় জাতব্যবস্থায় ধর্মের স্থান।

(ঘ) অন্যান্য স্তরবিন্যাসে কর্তব্য বা অঙ্গীকার পালনের ব্যক্তিগত সম্পর্কসমূহের মধ্যেই প্রধানত বৈষম্যের অভিব্যক্তি ঘটে। যেমন, ভূস্বামী ও ভূমিদাসের সম্পর্ক, দাসও দাসমালিকের সম্পর্ক বা নীচু জাত ও উঁচু জাতের ব্যক্তি মধ্যে সম্পর্ক। শ্রেণীব্যবস্থায় কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। সেখানে নৈর্ব্যক্তিক বৃহদায়তন সামাজিক সম্পর্কই প্রধান; যেমন শ্রেণীগত পার্থক্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হ'ল বেতন ও কাজের শর্তাবলীর মধ্যে বৈষম্য। একটা দেশের অর্থনীতিতে যে ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার পরিণতি হিসেবেই নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তিগত বর্গের প্রতিটি সদস্যকেই এই বৈষম্য প্রভাবিত করে—কোনও ব্যক্তিকে এককভাবে নয়।

গিডেন্‌স্‌-এর মতে, শ্রেণী হ'ল মানুষের বড় বড় গোষ্ঠী যাদের সদস্যরা সাধারণত অর্থনৈতিক রসদ বা সম্পদের অংশীদার, যা তারা যে জীবনযাত্রা পদ্ধতি অনুসরণে সক্ষম তাকে গভীরভাবে প্রবাবিত করে। বৃত্তি এবং সম্পত্তির মালিকানা হ'ল শ্রেণীগত পার্থক্যের মূল ভিত্তি। পাশ্চাত্যে এবং তার অনুকরণে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক সমাজে যে প্রধান শ্রেণীগুলি দেখা যায় তারা হ'ল ঃ উচ্চশ্রেণী (Upper Class)—ধনী সম্পদশালী, মালিক, শিল্পপতি এবং উচ্চপদস্থ আমলারা যারা উৎপাদন উপকরণসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক; মধ্যশ্রেণী— কেরাণী, অফিসার ও স্বাধীন পেশার নিযুক্ত মানুষ; শ্রমিকশ্রেণী—যারা কায়িক শ্রমে নিযুক্ত; এবং কৃষকশ্রেণী। তৃতীয় দুনিয়ার শেষোক্ত শ্রেণীই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

৭.৬ শ্রেণী চেতনা

আমরা সবাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বাস করি এবং আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এ বিষয়ে সচেতন। কিন্তু শ্রেণী সম্পর্কে আমাদের ধারণা একদিকে যেমন সমাজতাত্ত্বিকেরা শ্রেণীব্যবস্থা সংক্রান্ত আদর্শরূপের ধারণা থেকে অন্যরকম, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে মূল্যায়ন থেকেও তা ভিন্ন। আবার সমাজতাত্ত্বিক কোনও ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থান যেভাবে মূল্যায়ন করবেন, তার সঙ্গে হয়ত ঐ ব্যক্তির প্রতিবেশী, সহকর্মী ও আত্মীয়দের মূল্যায়নের কোনও সঙ্গতি থাকবে না। অবশ্য, শ্রেণীগত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কিছু বস্তুনিষ্ঠ মাপকাঠি ব্যবহার করা যায়; যেমন, ব্যক্তির বৃত্তি বা পেশা এবং আয়। তবে, এই মাপকাঠি প্রয়োগ করে কোনও ব্যক্তিকে হয়ত তার প্রতিবেশীর শ্রমিকশ্রেণীর অংশ বলে গণ্য করল, কিন্তু আসল মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত জানা যাবে যে তিনি নিজেকে দারুণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বলেই মনে করেন। অতএব বিষয়গত অবস্থান (Objective position) জানার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির বিষয়ীগত ধারণা (Subjective Perception)-টিও শ্রেষ্ঠনির্ণয়ের জন্য জানা দরকার।

শ্রেণী নির্ণয়ের আর একটি সমস্যা হ'ল এই যে, আমরা যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে বাস করি সেখানে সামাজিক শ্রেণীগুলিও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া শ্রেণী বলতে কলকারখানার মালিক পুঁজিপতিদেরই কেবল বোঝাত। কিন্তু আধুনিক বৃহদায়তন বহুজাতিক জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলিতে যে অত্যন্ত প্রভাবশালী পরিচালকবর্গ ক্ষমতাশালী হয়েছেন, যাদের ক্ষমতা দখলকে 'পরিচালকবর্গের বিপ্লব' (Managerial

Revolution) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁদেরকেও বুর্জোয়াদের সমগোত্রীয় বলেই ধরা হয়। এর ফলে পুঁজির মালিকানা ও কোম্পানী পরিচালনের মধ্যে যে ফারাক সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ নতুন বিষয় যা অন্তত মার্ক্সের দৃষ্টিগোচর ছিল না। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনীতির পরিষেবা ক্ষেত্রের (Tertiary Sector) সম্প্রসারণের ফলে নিম্ন মজুরীতে নিযুক্ত কায়িক শ্রমিকের সংখ্যা কমে করণিক, অফিসার ইত্যাদি কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং শিল্পোৎপাদনের উন্নতি হওয়ায় ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা ও জীবনযাপন পদ্ধতি আত্মস্থ করে সাবেকী শ্রমিকশ্রেণীরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। 'বুর্জোয়া মানসিকতার প্রসার' ও 'নয়া শ্রমিকশ্রেণীর' উদ্ভবের ফলে বিপ্লবী আন্দোলনেরও ভাঁটা পড়েছে।

এতসব পরিবর্তনের কথা মাথায় রাখলে একথা বলতেই হবে যে, শ্রেণী সত্যই অতি বিষম বস্তু। ধনতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ছবিটি যে জটিল তার কারণ একই সঙ্গে 'মর্যাদা গোষ্ঠী (Status Group) ও শ্রেণীর অস্তিত্ব। ম্যাক্স হেবার প্রথম এদের মধ্যে পার্থক্য করে দু'টি বর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক খতিয়ে দেখেছিলেন। তাঁর ভাষায়—"কিছুটা সরলীকরণ করে বলা যায় শ্রেণীভেদ গড়ে ওঠে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে, কিন্তু 'মর্যাদা গোষ্ঠী' গুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের মূলে আছে দ্রব্যের 'ভোগ' সংক্রান্ত নীতি, যা 'জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে' মূর্ত।" পরবর্তীকালের মার্শাল ও অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকদের মতে ইউরোপ ও আমেরিকার ধনতান্ত্রিক সমাজের উত্তরণ ঘটেছে শ্রেণীভিত্তিক সমাজসংগঠন থেকে মর্যাদাভিত্তিক সমাজ সংগঠনে। ফলে, এইসব সমাজে শ্রেণীগত ব্যবধান ও শ্রেণীসংঘাত সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নি ঠিকই, কিন্তু অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে।

এই ব্যাখ্যা মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মার্ক্স শ্রেণীর আলোচনা করতে গিয়ে শ্রেণী চেতনার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আয় পেশা নয়, উৎপাদন-উপকরণের সঙ্গে মালিকানা সম্পর্কের প্রকৃতিই শ্রেণীর বৈষয়িক ভিত্তি। উৎপাদন শক্তির বিকাশের স্তর যেমনই হোক না কেন, উৎপাদন-উপকরণসমূহে যাদের সম্পত্তির অধিকার থাকে তারা শোষক ও শাসক শ্রেণী এবং যাদের তা থাকে না তারা শোষিত শ্রেণী বলে পরিচিত হয়। তবে উৎপাদন-ব্যবস্থায় একই অবস্থানে থাকলে যে বর্গ তৈরি হয় তাকে মার্ক্স অ-চেতন শ্রেণী (Class-in-itself) বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু সেই সামাজিক বর্গ যখন নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজ অনুকূলে ক্ষমতার বিন্যাস সাধনের জন্য সংগঠিত হয় তখন সচেতন শ্রেণীর (Class for itself) আবির্ভাব ঘটে। শ্রেণী বলতে শেষোক্ত বর্গটিকেই বোঝায়। মার্ক্সের মতে, এই অর্থে শ্রমিকরা শ্রেণী, কিন্তু কৃষকরা নয়।

মার্ক্স সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, একমাত্র সচেন শ্রমিকশ্রেণী বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু শ্রেণী চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না। তার জন্য সচেতন প্রয়াস চাই। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ ঘটে তাকে মার্ক্স ও লেনিন শ্রমিক সংঘবাদী চেতনা (Trade Union Consciousness) বলে বর্ণনা করেছেন। চেতনার এই পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী কেবল নিজের আর্থিক উন্নতি ঘটানোর জন্য অর্থনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের সংকট যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার স্ববিরোধিতা যত প্রকট হ'তে থাকে এবং তারই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা যত করুণ থেকে করুণতর হয়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণীও ততই সংকীর্ণ শ্রেণীগত ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার উত্তরণ ঘটায় ব্যাপক বৈপ্লবিক চেতনায় (Revolutionary Consciousness) যা আরও বেশি করে তাকে বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে। এই চেতনার উন্মেষে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা লেনিনের রচনা পাঠ করলেই জানা যায়।

সুতরাং, মার্কসের মতে, শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণী বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেই। পশ্চিমী সমালোচকদের এখানেই আপত্তি। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছেন যে, শ্রেণীচেতনার আসন অত্যন্ত চঞ্চল; কারণ, মানুষ তার নিজের শ্রেণী সম্পর্কে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করে। একটা শ্রেণীর সব সদস্যের চিন্তা যেহেতু একইরকম নয় সেহেতু শ্রেণী চেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অর্থে সামগ্রিক ধারণা আমরা কখনই পেতে পারি না। তাছাড়া, সমাজতত্ত্বে তখন দু'টি প্রধান শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্তরে বহু মর্যাদা গোষ্ঠীর অবস্থিতির কথা বলা হচ্ছে, যার ফলে শ্রেণীকাঠামোয় দুই বৈর শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান কমে আসে। শুধু সম্পত্তির মালিকানা দ্বারা যেহেতু মর্যাদা নির্ধারিত হয় না, সেহেতু ভিন্ন স্তরে অবস্থিত মর্যাদা গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতা ও অনুকরণের, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নয়। বর্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং মোট জন সংখ্যায় তার আনুপাতিক ক্রমবর্ধমানতার ফলে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে মুখ্য সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক অস্বীকার করার এবং সমাজের উচ্চ-নীচ স্তরভেদকে মর্যাদার ধারাবাহিক অনবচ্ছেদ বিন্যাস হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বটোমোরের মতে, সমাজচিন্তার উপর এর প্রভাব বিপুল এবং এর ব্যপ্তি চেতনার বিকাশকে রুদ্ধ করতে সাহায্য করে।

৭.৭ লিঙ্গভিত্তিক স্তরবিন্যাস

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এমন কোনও সমাজে দেখা যাবে না যেখানে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি ক্ষমতাশালী। নারী সর্বত্রই প্রধানত ঘর-গৃহস্থালী সামলানো ও সন্তান উৎপাদন ও পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে রাজনৈতিক বা সামরিক কার্যকলাপে পুরুষেরই একাধিপত্য। শিল্পসমাজগুলিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রম বিভাগ প্রাক্-শিল্পসমাজগুলির মত প্রকট নয় ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতা ও প্রভাবের সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরুষের সংখ্যাধিক্য প্রবল।

পুরুষদের এই আধিপত্যকে পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) বলা হয়। কেন এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব না। আমরা শুধু দেখাতে চাই যে, গৃহকর্ম ও উৎপাদন কর্মের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকার ফলেই সমাজের, বিশেষ করে উৎপাদনের, নানা ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে পড়তে থাকে। উন্নত শিল্পসমাজগুলিতে মহিলা কর্মীদের প্রধানত কম পারিশ্রমিকের গতানুগতিক রুটিনমাফিক কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। আবার যে মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে সফল হয়েছেন তাঁদেরও এক বিজাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। কর্মে নিযুক্ত মহিলাদের গড় আয় পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এমনকি একই পেশার নিযুক্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বেতনের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোচনায় এতদিন পর্যন্ত লিঙ্গ-বৈষম্যের বিষয়টির ওপর মোটেই আলোকপাত করা হয় নি। ভাবখানা এমন যেন ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদার বণ্টন বিশ্লেষণে মহিলাদের টেনে আনা জরুরী নয়। অথচ, লিঙ্গ-বৈষম্যই স্তরবিন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। কারণ, এমন কোন সমাজ নেই যেখানে সমাজজীবনের কোনও না কোনও ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর তুলনায় বেশি সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে না।

লিঙ্গ-বৈষম্য ও স্তরবিন্যাসের আলোচনায় প্রায়শই যে প্রশ্ন উঠে আছে সেটি হ'ল শ্রেণীবৈষম্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক। অর্থাৎ, আধুনিককালে লিঙ্গ-বৈষম্যকে কি আমরা প্রধানত শ্রেণীবৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করব? ঐতিহাসিকভাবে অবশ্য শ্রেণীব্যবস্থার তুলনায় লিঙ্গ-বৈষম্যের শিকড় অনেক গভীরে। যে সব শিকারজীবী বা খাদ্যসংগ্রাহক সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল না সেখানে নারীর চেয়ে পুরুষ বেশী কর্তৃত্ব ভোগ করত। তথাপি, আধুনিক সমাজে শ্রেণীবৈষম্য এত প্রকট যে লিঙ্গ-বৈষম্যের সঙ্গে তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কারণ, অধিকাংশ নারীর বৈষয়িক অবস্থান তাঁদের পিতা বা স্বামীদের বৈষয়িক অবস্থানেরই প্রতিফলন ঘটায়। সেইজন্যই বলা হয় যে, লিঙ্গ-বৈষম্যকে মূলত শ্রেণীবৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

ফ্র্যাঙ্ক পারকিন (Frank Parkin) তাঁর *Class Inequality and Political order (1971)* গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, একথা ঠিক যে চাকরীর সুযোগ, সম্পত্তির মালিকানা, আয় ইত্যাদি সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার মধ্যে কাজ করে। কিন্তু লিঙ্গ-বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত করে এগুলিকে স্তরবিন্যাসের উদাহরণ হিসেবে দেখা হয় না। কারণ, ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলার ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুরস্কার প্রদান নির্ণয় হয় প্রধানত তদের পরিবার ও বিশেষ করে পুরুষ কর্তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী। অদক্ষ শ্রমিকদের স্ত্রী ও কন্যাদের সঙ্গে ধনী ভূস্বামীদের স্ত্রী-কন্যাদের কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তাদের সার্বিক পরিস্থিতি তে আলাদা যে পার্থক্যটাই বেশি চোখে পড়বে। একমাত্র যখন নারীত্বের সঙ্গে অক্ষমতাগুলি এত বেশি জড়িত থাকে যে শ্রেণীপার্থক্যও গৌণ হয়ে যায়, তখনই লিঙ্গ-বৈষম্যকে স্তরবিন্যাসের দিক হিসেবে গণ্য করা যায়। নারী-পুরুষের পার্থক্য এইভাবে দেখানো যায়— নারীর কর্মক্ষেত্র হ'ল ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্র, অর্থাৎ, পরিবার, সন্তানসন্ততি ও গৃহস্থালী এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্র হ'ল সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র যেখান থেকে মূলত ক্ষমতা ও সম্পদের বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এগুলি হ'ল বেতনসহ কাজ, শিল্প এবং রাজনীতি।

সুতরাং, সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণ ধারণা হ'ল এই যে, শ্রেণীগত বৈষম্যই প্রধানত লিঙ্গভিত্তিক স্তরবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। জন গোল্ডথর্প (John Goldthorpe) এই সাবেকী মতকেই সমর্থন করে বলেছেন যে, মহিলারা বেথনের বিনিময়ে যে কাজ করেন পুরুষদের কাজের তুলনায় তার গুরুত্ব এত কম যে, মহিলাদের শ্রেণী অবস্থান তাঁদের স্বামীদের শ্রেণী অবস্থানের ভিত্তিতেই নির্ণয় করা উচিত। এই তত্ত্বে অবশ্য লিঙ্গ বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। তবে, মেয়েরা যেহেতু মূলত কম পারিশ্রমিকের ও আংশিক সময়ের কাজ করে এবং অর্থনৈতিকভাবে তারা যেহেতু স্বামীদের উপরই বেশি নির্ভরশীল, সেহেতু স্বামীর শ্রেণীগত অবস্থানকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গোল্ডথর্পের মত অবশ্যই সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, অনেক পরিবারে মহিলা সদস্যদের আয় পারিবারিক মোট আয়ের অপরিহার্য অংশ বলে সেই আয় পরিবারের শ্রেণী অবস্থান অনেকটাই নির্ণয় করে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর চাকরী ও আয় অনেক সময় স্বামীর সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন, অদক্ষ শ্রমিকের স্ত্রী যদি কোন দোকানের ম্যানেজার হন সেক্ষেত্রে স্ত্রীর মর্যাদাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আগত নারী ও পুরুষ বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হ'লে যে পারিবারিক শ্রেণী-সংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। চতুর্থত, অনেক দেশেই এমন পরিবারের সংখ্যা আগের তুলনায় বাড়ছে যেখানে মহিলারাই আয়ের প্রধান উৎস।

সুতরাং, আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হ'তে পারি যে, নারীর অর্থনৈতিক অবস্থানকে মূল্যহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই কারণেই সাম্প্রতিককালে স্তরবিন্যাস সংক্রান্ত গবেষণায় লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। ফেল্ডবার্গ (Roslyn Feldberg), গ্লেন (Evelyn Glenn), ব্লনার (Robert Blauner) ইত্যাদি গবেষকদের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭.৮ অনুশীলনী

১। সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।
২। সামাজিক অসাম্যের প্রকৃতি নির্দেশ করুন।
৩। বৈষম্যকে সামাজিক ঘটনা হিসেবে কেন চিহ্নিত করা হয়?
৪। সামাজিক বৈষম্য নির্ণয়ে অর্থনীতির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৫। সামাজিক স্তরবিন্যাসের তিনটি প্রধান দিক কি কি?
৬। সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের সম্পর্ক কি?
৭। দাসতন্ত্র ও এস্টেট্‌স্ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখান।
৮। দাসতন্ত্র কেন বিলুপ্ত হ'ল?
৯। জাতপাতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
১০। ভারতে জাতব্যবস্থায় কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?
১১। অন্যান্য স্তরবিন্যাসের সঙ্গে শ্রেণীর পর্থক্য কোথায়?
১২। শ্রেণী চেতনার বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।
১৩। লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Harry M. Johnson : *Sociology : a systematic Introduction* (Allied Publishers, Bombay, 1970)
2. Andre Beteille : *Inequality and Social Change* (OUP, Delhi, 1972).
3. UNESCO, *The Race Question in Modern ScienceI* (Paris, 1956).
4. E.A.S. Blunt (ed) : *Social Service in India* (1939).
5. M.N. Srinivas : *Religion and Society among the coorgs of South India* (Bombay). Asia Publishing House 1965).
6. L. Dumont : *Homo Hierachices : The Caste System and its Implications* (London, Wiedenfeld and Nicolson, 1970).
7. Max Weber : *Economy and Society* (New York, Bedminster Press, 1921), vol. 1, ch. 4.
8. T. Bottomore : *Classes in Modern Society* (London, Allen and Quwin, 1965).

একক ৮ ☐ সংস্কৃতি

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য
৮.২ প্রস্তাবনা
৮.৩ সংস্কৃতি কি
৮.৩.১ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য
৮.৪ সাংস্কৃতিক বিশ্বজনীনতা ও বিভিন্নতা
৮.৪.১ উপসংস্কৃতি
৮.৪.২ বিরুদ্ধ সংস্কৃতি
৮.৪.৩ সাংস্কৃতিক পরিচয়
৮.৫ সংস্কৃতির সামাজিক উৎসসমূহ
৮.৫.১ ধ্রুপদী বিবর্তন তত্ত্ব
৮.৫.২ বিস্তৃতিবাদ
৮.৫.৩ ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব
৮.৫.৪ জ্ঞানমূলক নৃতত্ত্ব ও প্রতীকীবাদ
৮.৫.৫ সাংস্কৃতিক বাস্তুবিদ্যা
৮.৬ সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম
৮.৭ সারাংশ
৮.৮ অনুশীলনী
৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়?
- সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি?
- সংস্কৃতি বিভিন্ন রূপ কি রকম?
- সংস্কৃতির উৎস ও বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলো কি কি?
- সংস্কৃতির বিস্তৃতির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা কি?

৮.২ প্রস্তাবনা

'সংস্কৃতি' শব্দটির সঙ্গে আমরা কম-বেশি সবাই পরিচিত। সমাজতত্ত্ব বিষয়টির সঙ্গে যাঁরা বিশেষ পরিচিতও নন তাঁরা সংস্কৃতি বলতে আচার-আচরণ ও ব্যবহারের বিশেষ পরিশীলনকে বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক

পরিভাষায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি অন্য অর্থ বহন করে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতি বলতে মানবসমাজের যুগ যুগ এবং বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জীবনযাপনের ধারার সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে বোঝায়। এখানেই মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য। মনুষ্যেতর প্রাণী সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হ'লে তার জৈবিক প্রয়োজনগুলোই কেবল মেটায়। অন্যদিকে মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে বলে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো উদ্ভাবন, সংরক্ষণ ও পরিমার্জন করে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারে। আবার সামাজিক স্থায়িত্বের জন্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানারকম অনুশাসন, বিধি, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতির জন্ম হয়। ফলে সমাজে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা জন্মায়। একেই আমরা বলে থাকি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বা মানদণ্ড।

৮.৩ সংস্কৃতি কি?

সমাজতত্ত্ব তথা নৃতত্ত্বের (Anthropology) একটি অতি আলোচিত বিষয় হ'ল সংস্কৃতি। মানব ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। প্রত্যেকটি সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা বা চিন্তা-ভাবনায় যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা মূলত আমাদের সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। সংস্কৃতি হ'ল মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যা আমাদেরকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করে দেয়। মানুষেতর প্রাণীর মধ্যে গোষ্ঠীবিদ্ধ জীবনযাপনের কিছু উদাহরণ বর্তমান থাকলেও এদের পক্ষে কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। বংশগত কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে মূলত এরা জীবন অতিবাহিত করে। তাই এদের পক্ষে সংস্কৃতিসম্পন্ন হ'য়ে কোন সমাজ বা সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার অধিকারী হয়। সংস্কৃতিবিহীন কোন মনুষ্য সমাজের কথা তাই অকল্পনীয়।

সমাজে সংস্কৃতির অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণে কিছু জটিলতা রয়েছে। কেননা সংস্কৃতি শব্দটি ক্ষুদ্র ও ব্যাপক—এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্র অর্থে সংস্কৃতি বলতে মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষকে বোঝানো হয়। এই অর্থে সংস্কৃতি হ'ল অপরিণত ও অমার্জিতের বিরোধী এবং আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান বা রীতি-নীতির মার্জিত রূপকে সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, কোন লোককে যখন সাধারণভাবে 'cultured' বলে অভিহিত করা হয়, তখন তার ভদ্রতা বা আচরণের শিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু সমাজতত্ত্বে ও নৃতত্ত্বে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আমাদের জীবনের সব দিকগুলিই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতির অন্যতম আদি ব্যাখ্যাকর্তা ই. বি. টাইলর (E.B. Tylor) তার Primitive culture শীর্ষক গ্রন্থে সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে নিয়ে বলেন যে, "সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে সব জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিক বিধান, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য যে সমস্ত গুণ ও অভ্যাস অর্জন করে নেয় তার জটিল সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি" (culture...is that complex whole which includes knowledge, belief, arts, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of a society")। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতি শুধুমাত্র মার্জিত রুচি বা অভ্যাসের থেকেও বেশী কিছু। সংস্কৃতি হ'ল মানুষের আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ—সবকিছুই সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত।

মানবজীবনের বিভিন্ন বস্তুগত (meterial) এবং মানসিক বা অ-বস্তুগত (non-material) উপাদানের

সংমিশ্রণে সংস্কৃতি গঠিত হয়। আমাদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিভিন্ন উপকরণ, যেমন—ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত, কারুকলা, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক দৃষ্টি, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি হ'ল সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান। আর সাংস্কৃতিক মানস উপাদানের মধ্যে রয়েছে আমাদের বিশ্বাস, মনোভাব, ধর্ম, নীতি, মূল্যায়ন, প্রতীক, সাহিত্য, জ্ঞান, ভাবাদর্শ, ললিতকলা ইত্যাদি। সংস্কৃতি এই সমস্ত উপাদানসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের পরিপূরক। সংস্কৃতিকে তাই শুধুমাত্র বস্তুগত বা মানসিক উপাদানের সমষ্টি বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনোস্কি (Malinowski) বলেন যে, "সংস্কৃতি হ'ল মানুষের তৈরি বস্তু ও মাধ্যম যার সহায়তায় সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে"। সুতরাং আমাদের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক তথা সৌন্দর্য সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে যে জীবনসংগ্রাম—তার মিলিত রূপকেই আমরা বলি 'সংস্কৃতি'। সংস্কৃতির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ যেহেতু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত যেহেতু মানুষের জীবন-বিকাশ ও জীবন-আচরণের সামগ্রিক প্রয়াসকে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা শ্রেয়।

সংস্কৃতির কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নয়। সমস্ত মানব-প্রজাতির সংস্কৃতি রয়েছে এবং এই অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি উত্তরাধিকার ও ক্ষমতা যা মানুষ মাত্রেই ভোগ করে। মানব-সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করলেও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই অর্থে সংস্কৃতিকে আপেক্ষিক বা specific বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

সংস্কৃতি সহজাত নয়। সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানস ও বস্তুসম্পদগুলিকে মানুষের পক্ষে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রেরণ সম্ভবপর হ'লেও প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক ভাবে জন্মের পর সংস্কৃতিসম্পন্ন হ'তে হয়। মানুষ একটি সংস্কৃতিতে জন্মগ্রহণ করলেও জন্মের পর পশুজগতের সাথে তার বিশেষ পার্থক্য সূচিত হয় না এবং পশুজগতের মতো নিতান্ত কিছু জৈবিক প্রয়োজন দ্বারা মানবশিশু পরিচালিত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে একটি সামাজিক পরিবেশে অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে মানব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। সমাজতাত্ত্বিকগণ আমাদের এই সংস্কৃতি শিক্ষার প্রক্রিয়াকে সামাজিকীকরণ (socialization) বলে অভিহিত করেন যা আমাদের সামাজিক প্রকৃতির বিকাশে সহায়তা করে। এই ধরনের শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক মানদণ্ডে 'মানুষ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভবপর হয় না।

সংস্কৃতি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শিক্ষা বা অনুশীলনের কিছু বিষয় নয়, সংস্কৃতি সমগ্র গোষ্ঠী ও সমাজজীবনকে পরিবেষ্টন করে থাকে। সমাজে বসবাসের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, সংস্কৃতি হ'ল যৌথ এবং অংশীদারমূলক (shared)। আমাদের বিশ্বাস, মূলবোধ, চিন্তা-ভাবনা, প্রত্যাশা বা ক্রিয়ার মধ্যে যে একতা বা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় তা মূলত কোন একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশীদারত্বের প্রতিফলন। সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মূল্যবোধ, বিশ্বাস, নীতি বা প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে বলে সংস্কৃতিকে আমরা একটি সঙ্ঘবদ্ধ অস্তিত্ব বা ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা বলে আখ্যা দিতে পারি। অবশ্য, তার মানে এই নয় যে, সংস্কৃতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার বিরোধী। সংস্কৃতি ব্যক্তির সামনে একটি পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ তুলে ধরে তার মধ্যে 'আমরা' বোধের সৃষ্টির সাথে সাথে ব্যক্তিসত্তা বিকাশেও সহায়ক হয়। যৌথ ও ব্যক্তিগত পছন্দের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি আমাদের ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করে। বস্তুতপক্ষে, সংস্কৃতি যদি ব্যক্তিস্বতন্ত্র্য বিরোধী হ'ত তাহলে সমাজজীবন থেকে বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতা হারিয়ে যেত এবং ব্যক্তির পক্ষে তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মনৈপুণ্য বা প্রতিভার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভবপর হ'ত না।

সংস্কৃতি নিষ্ক্রিয় বা একপেশে কোন বিষয় নয় বলেই সদা পরিবর্তনশীল। আমাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান বা মতাদর্শে পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিকভাবে ঘটে। এই পরিবর্তনগুলি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রবাহকে অব্যাহত রাখে। বিশেষ বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মানুষ

সর্বদাই নতুন নতুন বস্তুগত ও মানসিক উপাদানের সৃষ্টি করে চলেছে যা পরিবেশের সাথে আমাদের অভিনব উপযোজনকে সার্থক করে তুলেছে। সংস্কৃতির এই অভিযোজন (adaptive) মূলত চরিত্র তার পরিবর্তনশীলতার একটি প্রধান কারণ। এছাড়াও, একটি সংস্কৃতি অন্য কোন সংস্কৃতির ভাবে এসে পরিবর্তিত হ'তে পারে। কৃষ্টিমিশ্রণ (Acculturation) বা আত্তীকরণ (Assimilation) জাতীয় প্রক্রিয়া এই ধরনের পরিবর্তনের উদাহরণ। তবে, এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটলেও সেই পরিবর্তনের গতিতে তারতম্য ঘটে। সমাজতাত্ত্বিক অগবার্ন (W.F.Ogburn) মনে করেন যে, সংস্কৃতির কোন কোন অংশ, যেমন প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজের অন্যান্য অংশের, যেমন মানস-সংস্কৃতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুততালে পরিবর্তিত হয়। এর ফলে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা ব্যবধান বা বিলম্বন উদ্ভূত হয়। অগবার্নের এই তত্ত্বটিকে 'সাংস্কৃতিক তত্ত্ব' (Theory of cultural lag) বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

বস্তু-সংস্কৃতি ও মানস-সংস্কৃতির বিপরীতধর্মী চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সময় এই উপাদানগুলিকে যথাক্রমে 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে সভ্যতা বা civilization শব্দ দ্বারা মানব সমাজের উন্নতির একটি অবস্থাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ উন্নততর জটিল সংস্কৃতির জীবনেরই নামান্তর হ'ল সভ্যতা। মনে করা হয় যে, একটি সংস্কৃতি যখন লিখিত ভাষা, বিজ্ঞান, দর্শন, বিশেষীকৃত শ্রমবিভাগ, জটিল প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধিকারী হয় তখনই তা সভ্যতা রূপে চিহ্নিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ (R.M.MacIver & Page)-এর অভিমত অনুসারে মানুষ জীবনযাপনের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে যান্ত্রিক প্রযুক্তি ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে তাকেই সামগ্রিক অর্থে বলা হয় সভ্যতা। অর্থাৎ সভ্যতা হ'ল বাহ্যিক ও যান্ত্রিক এবং আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনও এর অন্তর্ভুক্ত।

৮.৩.১ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য

সমাজবিজ্ঞানীদের যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্যের অবতারণা করেন তখন তারা সভ্যতাকে বস্তুগত সংস্কৃতির এবং সংস্কৃতিকে মানস-সংস্কৃতির সমার্থক বলে গণ্য করেন। জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant) নৈতিকভাবে সংস্কৃতির একটি আবশ্যিক উপাদান হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি যেখানে মনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সেখানে সভ্যতা নিছকই বাহ্যিক ব্যাপার। পরবর্তীকালে, কান্টকে অনুসরণ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা হয়েছে। যেমন, অধ্যাপক ম্যাকাইভার-এর মতে সংস্কৃতি হ'ল লক্ষ্য, সভ্যতা হ'ল সেই লক্ষ্য লাভের উপায়। জিসবার্ট (Gisbert) বলেন, "সভ্যতা হ'ল যা আমাদের আছে, সংস্কৃতি হ'ল আমরা যা তাই"। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে আমরা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য করতে পারি ঃ

(ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাপ করা যেতে পারে— যেহেতু সভ্যতা হ'ল বাহ্যিক ও যান্ত্রিক। কিন্তু সংস্কৃতি হ'ল অন্তঃস্থ ও আঙ্গিক। তাই সংস্কৃতির বিচার হয় আমাদের মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি। যেমন, আগেরকার গরুর গাড়ীর তুলনায় এখনকার যন্ত্রচালিত মোটরগাড়ী অনেক বেশী উন্নত ও ক্ষমতাশালী। আবার, সড়কপথে যাতায়াতের তুলনায় আকাশপথে গমন আজ অনেক বেশী দ্রুততর। কিন্তু আমাদের মানস-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের গুণগত মান অনেকক্ষেত্রে আপেক্ষিক বিষয় বলে পরিগণিত হয়। সংস্কৃতি হ'ল উপলব্ধির বিষয়। তাই সভ্যতার মত সংস্কৃতি নিরপেক্ষ মানদণ্ডে পরিমাপযোগ্য নয়। মানুষের পছন্দ বা রুচির ব্যাপারে কোন সাধারণ ও স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। একটি চিত্র বা ভাবাদর্শ কারো কাছে সুন্দর বা ভালো, আবার কারো কাছে বিশ্রী বা অসুন্দর বলে পরিগণিত হতে পারে। আমাদের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি দেশ, কাল ও পাত্রা-পাত্র ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এটা হওয়াই স্বাভাবিক।

(খ) সভ্যতার অবদানগুলিকে সহজেই বোঝা যায়, আয়ত্ত করে নেওয়া যায় অথবা বর্জন করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতিতে আয়ত্ত করা বা উপলব্ধি করা সহজ নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা সহজেই সভ্যতার অবদানগুলিকে লাভ করতে পারি। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "Civilization is borowed without change or loss, but not culture." কোন একটি দেশ অন্য দেশের বস্তুগত সম্পদগুলি, যেমন—যানবাহন, প্রযুক্তি, প্রকাশিত পুস্তক বা কোন ভোগ্যসামগ্রীকে সরাসরি ও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। সামান্য ব্যবহারিক জ্ঞান পেলে সাধারণ মানুষের পক্ষেও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার-বিধি শেখা বা বুঝে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে নকল করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে এসে ভারতীয় সংস্কৃতি কিছুটা পরিবর্তিত হ'লেও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা অথবা প্রতিষ্ঠানকে আমরা আমাদের মত করে গ্রহণ করেছি। আবার, ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রভাবে এসে উপজাতি সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়েছে একথা সত্যি। তথাপি উপজাতিদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণগুলি অনেকক্ষেত্রেই বজায় রয়েছে। ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকগণ আরো লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতীয় অণু পরিবার এবং পাশ্চাত্য অণু পরিবারের ধারণার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য অণু পরিবারগুলি প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিতান্ত্রিক। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে অণু পরিবারের আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েও আমরা যৌথ বদ্ধতার আদর্শকে বিসর্জন দিই নি। এই ধরনের পার্থক্যের প্রধান কারণ হ'ল সংস্কৃতির প্রতীকমূলক উপাদানগুলিকে আমাদের প্রত্যেককে নতুন করে অর্জন ও আয়ত্ত করে নিতে হয়। ফলে, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য সংস্কৃতির কোন উপাদানের সংস্পর্শে আসে তখন সেটিকে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। এই কারণে সাংস্কৃতিক বিস্তৃতিকরণ (cultural diffusion) বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করে দেয় না।

(গ) সভ্যতার অবদান আয়ত্ত ও ভোগ করা সহজে সম্ভব বলে সভ্যতার ধর্ম হ'ল ধারাবাহিক অগ্রগতি। সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে বিস্তারলাভ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতির কথা উল্লেখ করতে পারি। ইন্টারনেটের যুগে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অতি সহজেই যোগাযোগ সম্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব সাফল্য মানবসভ্যতাকে এক নতুন চরিত্র দান করেছে। কিন্তু সংস্কৃতির বিস্তার যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ বিষয়। ম্যাকাইভার ও পেজ তাই বলেন "Civilizatgion is always advancing, but not cultruc." আমাদের ব্যবহারিক জীবনের যে বস্তু-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে তাকে নতুন প্রজন্মের সদস্যরা সহজে যেমন গ্রহণ করতে পারে, তেমনি তাদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। কিন্তু সংস্কৃতির গতিপথ এরকম সরল, সম্মুখবর্তী এবং একমুখী নয়। যেমন, প্রাচীন সাহিত্য-গান-নাটকের তুলনায় আধুনিক শিল্প-কলা-সাহিত্য অধিক সমৃদ্ধ বা উন্নত— তা বলা যায় না।

(ঘ) সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হ'ল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণতির থেকে কাজটাই হ'ল বড়, সেটাই হল লক্ষ্য। এই কারণে, সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা ততটা তীব্র নয়। মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে, ধর্মীয় সাধনায় নানাভাবে ব্রতী হতে পারে। এই ধরনের প্রয়াসের লক্ষ্য বা পরিণতির মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না এবং এদেরকে তুলনামূলক বিচারে পরিমাপ করাও নিরর্থক। সংস্কৃতি আপেক্ষিক বিষয় বলে প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণকে (সংস্কৃতির ক্ষুদ্রতম এককে বলা হয় প্রলক্ষণ বা trait), অথবা যে কোন গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব পেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু, সভ্যতার ক্ষেত্রে আধুনিকতম অবদানটি প্রাচীন আবিষ্কারকে পেছনে ফেলে দেয় এবং যে প্রযুক্তি বা বস্তু আমাদের প্রয়োজন সাধনে যত বেশী উপযোগী সেই প্রযুক্তি বা বস্তুই আমাদের কাছে ততটাই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

(ঙ) সভ্যতার তুলনায় সংস্কৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিভিন্ন বস্তুসম্পদের ব্যবহারিক মূল্য সাধারণত নির্দিষ্টকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের বা প্রয়োজন সাধনের উপযোগী নিত্যনতুন আবিষ্কারের

সঙ্গে সঙ্গে পুরানো দ্রব্য-সামগ্রীর গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়। কিন্তু সংস্কৃতির পরিবর্তনের গতি শ্লথ বলে এবং প্রত্যেক মানুষকে সংস্কৃতি নতুন করে অর্জন করে নিতে হয় বলে বিভিন্ন যুগে বা সমাজে একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্তমান থাকতে দেখা যায়। হারানো দিনের গান, অতীতের কোন রচনা বা চিত্রকলা অথবা পুরানো খাদ্যাভাস সময়ের গণ্ডী পেরিয়ে আজও আমাদের কাছে সমান মূল্যবান।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্যগুলি সত্ত্বেও আমরা এই দু'টিকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে দেখতে পারি না। আমাদের বাহ্যিক ও অন্তঃস্থ জীবনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র ছাড়া জীবন সম্ভব হ'তে পার না। তাই সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয় যে, এরা পরস্পর যথেষ্ট ঘনিষ্ট ও নির্ভরশীল। সংস্কৃতির জন্য যে অনুকূল পরিবেশ, যেমন—ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, যানবাহন ইত্যাদি সৃষ্টি করে সভ্যতা। সভ্যতার এই উপাদানগুলি ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভবপর নয়। সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তিতে আমাদের চিন্তা-ভাবনা বা মূল্যমানে পরিবর্তন সূচিত হয়। সভ্যতার উপাদানগুলি সংস্কৃতির বাহন হিসেবেও কাজ করে যেমন—টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমগুলি আধুনিক বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রসারে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতি আমাদের সভ্যতাকে পরিচালিত করে। সংস্কৃতিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সভ্যতার বিস্তারে মনোযোগী হই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, সংস্কৃতির সভ্যতার বিস্তারকে নির্দেশ করে। এছাড়াও সভ্যতার উপাদানসমূহের প্রয়োগ-পদ্ধতি সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সভ্যতা হ'ল সমাজের চালিকা শক্তি এবং সংস্কৃতি হ'ল এই শক্তির নিয়ামক।

শুধু তাই নয়, সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের তাৎপর্য বর্তমান থাকে। আমাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু সম্পদের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। এই কারণেই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি আদিম মানবজীবনের সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক একটি সুস্থ, সার্থক ও সাবলীল সমাজজীবনের পক্ষে একান্তই আবশ্যিক; বস্তু-সংস্কৃতি ও মানস-সংস্কৃতির বিকাশ যদি সুসমন্বিত না হয়, তাহলে তা ব্যক্তি-সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক। সাংস্কৃতিক বিলম্বন তত্ত্বের প্রবক্তা অধ্যাপক অগবার্ন তাই সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে গেছেন।

৮.৪ সাংস্কৃতিক বিশ্বজনীনতা ও বিভিন্নতা

সমাজতাত্ত্বিকগণ এই বিষয়ে একমত যে মানবসমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভূমিকা অনন্য। স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর প্রতিটি সমাজই এমন কিছু সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ দেখা যায় যার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনীন এবং যেগুলি ছাড়া মানবসমাজ তার স্বকীয়তা লাভ করতে পারে না। এই ধরনের প্রলক্ষণগুলিকে বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ (Universal cultural traits) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভাষাবিহীন কোন মানব-সংস্কৃতির অস্তিত্ব নেই। আবার পৃথিবীর সর্বত্র কোন না কোন ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থার উপস্থিতি রয়েছে, যাতে শিশু প্রতিপালন তথা পিতামাতার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কিছু মূল্যমান ও নীতি থাকে। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, অথবা সম্পত্তির অধিকারও বিভিন্ন সংস্কৃতির কিছু মূল্যবান দিক। তাছাড়াও মানব-সংস্কৃতির একটি বিশ্বজনীন আচার সংহিতা হিসাবে আমরা 'অজাচার-নিষিদ্ধকরণ' (Incest taboo)-এর কথা বলতে পারি। এই সংহিতা দ্বারা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে, যেমন—পিতামাতার সাথে ছেলেমেয়ের অথবা ভাই-বোনদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক মারডক্ (Murdock)-এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, চিত্রকলা, নৃত্য, দেহঅলংকার, ক্রীড়া, উপহার, বিনিময়, ঠাট্টা-পরিহাস, স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণগুলিও বিশ্বজনীন।

বিশ্বজনীন সংস্কৃতির বিস্তারে সাংস্কৃতিক বিস্তৃতি (cultural diffusion) একটি প্রদান কারণ। সমাজতাত্ত্বিকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, শিল্পায়ন, নগরায়ন, ভোগবাদ, যুক্তিবাদ, আমলাতান্ত্রিকরণ, জটিল শ্রমবিভাজন, ব্যক্তিতান্ত্রিকতার বিস্তার, রাষ্ট্রনির্মাণ প্রক্রিয়া ইত্যাদির কারণগুলি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপকে অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক স্তরে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছে। এরই পাশাপাশি আধুনিক গণমাধ্যম এবং বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি একটি বিশ্ব-সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। বিশ্বায়ন (Globalization) প্রক্রিয়া ছাড়াও মুক্ত অর্থনীতির প্রভাবে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক সংস্কৃতির স্থান-কাল-পাত্র বিহীনতা মানবসমাজের স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করতে কতটা সক্ষম তা অবশ্য একটি বিতর্কমূলক বিষয়। কেননা, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধিতেও সহায়তা করেছে। যত বেশীমাত্রায় বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিগুলি একটি বিশ্বব্যবস্থার অধীনে সমন্বিত হবে ততই তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক প্রকট হয়ে পড়বে। অনেকের কাছে বিশ্বায়ন মানে মার্কিনী বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক মানবজীবনেও নৃকুলতা (Ethnicity), স্বজাতীয়তা, স্বাতন্ত্র্যতা বা বিগঠন (Deconstruction) নামক প্রক্রিয়াগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিকোত্তর (Post-Modernist) যুগে মানব ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বিশেষ বিশেষ স্থান বা সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রবণতা আজ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

মানবসংস্কৃতির বৈচিত্র্য অবশ্য খুবই লক্ষণীয় বিষয়। যদিও কোন একটি সমাজ বা দেশে বসবাসকারী প্রায় সকল নাগরিকই কিছু সাধারণ ঐতিহ্যের অংশীদার হতে পারে, তথাপি বিভিন্ন সমাজের মানুষের মূল্যবোধ, নীতি, প্রতিষ্ঠান, বা বিশ্বাসের মধ্যে অভূতপূর্ব পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের ভাষা, ধর্ম, জাতি বা শ্রেণীগত পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রত্যেকটি অঞ্চলের সংস্কৃতির পার্থক্য খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহপ্রথা বা ললিতকলার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হলেও কয়েক সহস্র জাতি ও অনুজাতিতে (Sub-caste) বিভক্ত, যাদের প্রত্যেকটি আন্তর্বৈবাহিক। আবার উপজাতি জীবনের কিছু সাধারণ সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রায় ছয় শতাধিক উপজাতি গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য বর্তমান; এছাড়াও গ্রাম ও শহরের পার্থক্য, শিল্পায়িত ও অশিল্পায়িত অঞ্চলের পার্থক্য দৃশ্যমান হয়।

৮.৪.১ উপসংস্কৃতি

মানবসমাজের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে বোঝানোর ক্ষেত্রে উপসংস্কৃতির (Sub-culture) ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, জাতিগত, শ্রেণীগত, ধর্মগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক পার্থক্যের ফলে যখন একটি সমাজের বিভিন্ন সদস্যের সামাজিকীকরণ ও শিক্ষার পার্থক্য ঘটে, তখন সৃষ্টি হয় উপসংস্কৃতির। উপসংস্কৃতি বলতে কোন একটি জটিল সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। এই সমস্ত উপগোষ্ঠীর সদস্যরা বৃহত্তর জাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিজেদের সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, উপসংস্কৃতি হ'ল বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর সংস্কৃতি।

উপসংস্কৃতি সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হ'ল সামাজিক স্তরবিন্যাস। যে কোন স্তরবিন্যাস সমাজে ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতিপত্তিগত বিভাজনকে কেন্দ্র করে যে সকল গোষ্ঠী বা শ্রেণীর জন্ম হয় তাদের সংস্কৃতিকে কোন না কোন বিশেষত্ব থেকে যায়। যেমন, উঁচু ও নিচু জাতের সদস্যদের জীবনাচরণ পদ্ধতি, পেশা ও বিবাহ পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখা যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাস ছাড়াও ঐতিহাসিক কারণ, অভিবাসন (Migration), ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্মীয় আনুগত্য, সাংস্কৃতিক অবদমন, নৃকুলতা ইত্যাদিও উপসংস্কৃতি সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৮.৪.২ বিরুদ্ধ সংস্কৃতি

কোন উপসংস্কৃতি যখন ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে এবং বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়, তখন তা মূল সংস্কৃতির বিরোধী অবস্থানে চলে আসতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে উপসংস্কৃতিকে বিরুদ্ধ সংস্কৃতি (Contra culture) বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ কোন উপসংস্কৃতি যখন বৃহত্তর সমাজের মূল সংস্কৃতি বিরোধী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাতে বলা হয় বিরুদ্ধ সংস্কৃতি। বৃহত্তর সমাজে যখন মূল্যবোধের সংকট সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে, তখনই সাধারণ বিরুদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। তাছাড়াও, বৃহত্তর সমাজের আধিপত্যশীল গোষ্ঠী যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় ও হতাশা সৃষ্টিতে উদ্যত হয় তখনও বিরুদ্ধ সংস্কৃতির জন্ম হ'তে পারে। অর্থাৎ সংস্কৃতির অবদমন, রক্ষণশীলতা এবং বিচ্ছিন্নতা বিরুদ্ধ সংস্কৃতির উৎপত্তির কিছু প্রধান কারণ। বিরুদ্ধ সংস্কৃতির আবির্ভাব সমাজজীবনে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। জাতীয় জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জনগোষ্ঠী জাতীয় নিরাপত্তা, সংহতি ও উন্নতির পরিপন্থী হ'তে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতে উপজাতি উগ্রপন্থা বিরুদ্ধ সংস্কৃতির অস্তিত্বের একটি প্রধান উদাহরণ। তবে, উপসংস্কৃতির ইতিবাচক ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। অনেক সময় উপসংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য মূল সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতে পারে। যেমন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে আমরা গর্বের সাথে ব্যক্ত করি। বৃহত্তর সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে তাই উপসংস্কৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৮.৪.৩ সাংস্কৃতিক পরিচয়

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং উপসংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক পরিচয় (cultural identify)। নিজেদের গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য যেমন একদিকে অন্য গোষ্ঠীর সাথে পার্থক্য এবং নিজেদের একাত্মতার ইঙ্গিত বহন করে, তেমনি এই ধরনের স্বাতন্ত্র্যমূলক সাংস্কৃতিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় নৃকুলাভিমান (Ethnocentrism) নামক এক মানসিকতার। অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে যখন নিজেদের সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা বা নিন্দা করা হয় তখন তাকে বলা হয় নৃকুলাভিমান। সমাজতাত্ত্বিকগণ এই ধরনের মানসিকতাকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করেন এবং প্রত্যেকটি সংস্কৃতিকেই তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা পরামর্শ দেয়। এই ধরনের ব্যাখ্যাকে সমাজতাত্ত্বিকগণ সাংস্কৃতিক আপেক্ষবাদ (Cultural relativism) বলে আখ্যা দেন।

৮.৫ সংস্কৃতির সামাজিক উৎসসমূহ

সংস্কৃতির সৃষ্টি কিভাবে ঘটে? অথবা সংস্কৃতির সামাজিক উৎসগুলি কি কি? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা তত্ত্বের অবতারণা করেন। আমরা এই ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পর্যালোচনা করব।

৮.৫.১ ধ্রুপদী বিবর্তন তত্ত্ব

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের এই প্রাচীন তত্ত্বটি সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে একটি প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করে, যার মধ্য দিয়ে নতুন সাংস্কৃতিক রীতি বা ধরন তার পূর্বেকার স্বরূপ থেকে জন্মলাভ করে। এই তত্ত্বের সমর্থকগণ মনে করেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি সমাজই কিছু নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্তরে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সর্বনিম্নে আদিম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে স্থান

দেওয়া হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক মর্গ্যান (Lewis Henry Morgan) ও টাইলর (E. B. Tylor) এই তত্ত্বের দু'জন প্রধান প্রবক্তা। মর্গ্যান তাঁর ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত 'Ancient Society' নামক গ্রন্থে যুক্তি দেখান যে, মানবসমাজ তিনটি প্রধান সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং এর প্রতিটি স্তর পূর্বেকার স্তরের তুলনায় প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নত। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে সংস্কৃতিক অন্যান্য কিছু দিক যেমন পারিবারিক কাঠামো এবং সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়েও পরিবর্তন সূচিত হয়। মর্গ্যান এই তিনটি স্তরের নাম দেন যথাক্রমে, আদিম হিংস্র সমাজ (Savagery), বর্বর সমাজ (Barbarism) এবং সভ্যতা (Civilization)।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস, মর্গ্যান-এর তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং মানবসমাজের বিবর্তনকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। মার্ক্স ও এঙ্গেলস যুক্তি দেখান যে, মানব-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি যেমন—আইন, সরকার, পরিবার, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি আমাদের বস্তুগত প্রয়োজন এবং বস্তুগত বিবর্তনকে কেন্দ্র করে পরিবর্তিত হয়। মার্ক্সীয় ধারণায় যে কোন সমাজের অর্থনীতি বা উৎপাদন পদ্ধতি হ'ল প্রকৃত কাঠামো বা ভিত (Base), যাকে কেন্দ্র করে সমাজের উপরিসৌধ (Superstructure) গড়ে ওঠে। অর্থাৎ বস্তুগত জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production) সাধারণভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত বা বুদ্ধিগত জীবন প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে দেয়। মার্ক্সের রচনায় আমরা আর্থ-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের যে ধাপগুলির উল্লেখ পাই, সেগুলি হ'ল যথাক্রমে—আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিষ্ট সমাজ।

ধ্রুপদী বিবর্তনবাদী তত্ত্বের প্রবক্তারা বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত মানব-প্রজাতির মানসিক গড়নে এক অভূতপূর্ব ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন ধরনের সমাজ একই সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে। কেননা একই ধরনের মানসিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যখন অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হন তখন সেই সমস্যার সমাধান সূত্রগুলিও সমরূপ হয়। অবশ্য বিভিন্ন ধরনের সমাজে সমরূপ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি কারণ হিসেবে সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির (Culture diffusion) গুরুত্বকে টাইলর স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তথাপি ধ্রুপদী বিবর্তনবাদীরা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করতে গিয়ে এই ধরনের বিস্তৃতিকে ততটা গুরুত্ব দেন নি। পক্ষান্তরে, এই তত্ত্ব প্রত্যেকটি সমাজের সাংস্কৃতিকে মূলত একটি স্বাধীন উদ্ভাবনী (Independent invention) প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই তত্ত্বটির দুর্বলতা পরবর্তীকালে বিস্তৃতিবাদের প্রবক্তারা স্পষ্ট করে দেন। মানবসমাজের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার ব্যাখ্যা প্রদানে এই তত্ত্ব ব্যর্থ হয় এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের যে কোন একটিকে অন্যগুলির নিয়ন্তা হিসেবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এই ধরনের নিয়তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তী বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক গবেষণায় এই নিয়তিবাদের ধারণা সমালোচিত হয়েছে।

৮.৫.২ বিস্তৃতিবাদ

বিস্তৃতিবাদের প্রবক্তারা সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং বিস্তৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জার্মান ও ইংরেজ বিস্তৃবাদীরা প্রাক্-অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সমাজের সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণগুলির বণ্টন ও অবস্থানের উপর জোর দেন। তাদের মতে, যে সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত রয়েছে তাদেরকে প্রাচীন প্রলক্ষণ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কোন কোন বিস্তৃতিবাদী যুক্তি দেখান যে, সমস্ত মানব সংস্কৃতি একটি সাধারণ উৎপত্তিস্থল থেকে বিকশিত হয়ে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ক্রমশ প্রসারলাভ করেছে। যেমন—স্মিথ (E. Smith) বা পেরী (Perry) মিশরের সভ্যতাকে আদি মানবসভ্যতা এবং সংস্কৃতির একটি উৎপত্তিস্থল হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

দু'টি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের লোকজন পাশাপাশি বসবাস করলে ভাবের চিন্তাধারার ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান সম্ভব। সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হ'লেও ইউরোপীয় বিস্তৃতিবাদীদের বক্তব্য সমালোচিত হয়েছে। সংস্কৃতির উৎপত্তিস্থলকে কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখাও এক ধরনের নিয়তিবাদ। বিস্তৃতি ও স্বাধীন উদ্ভাবনী ক্ষমতা—এই দু'টি প্রক্রিয়াই যুগ্মভাবে সংস্কৃতির বিস্তারকে ব্যাখ্যা করতে অধিক কার্যকর। মার্কিন বিস্তৃতিবাদীরা ইউরোপীয় ধারাকে অনুসরণ করে সংস্কৃতিকে একটি সার্বিক বিষয় বলে ব্যাখ্যা করেন। বোয়াস (Boas) তাঁর গবেষণায় দেখান যে, কোন একটি সংস্কৃতির উপাদান সমগ্র সংস্কৃতির সাথে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে তাকে পৃথকভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন অংশের সমন্বিত রূপ যদি সংস্কৃতি হয়, তবে বিস্তৃতিকে একতরফা এবং স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কেননা, কোন একটি সাংস্কৃতিক উপাদান অন্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় না হ'তেও পারে। যে সব ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে সাংস্কৃতিক বিস্তার ঘটেছে, সেখানেও পুরানো সাংস্কৃতিক উপাদান নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। অর্থাৎ বিস্তৃতির ফলে সাংস্কৃতিক উপাদানের চরিত্র, অর্থ ও ভূমিকার পার্থক্য ঘটতে পারে। বোয়াস তাই মনে করতেন যে, সংস্কৃতির উদ্ভবের ইতিহাস খোঁজা নিরর্থক।

৮.৫.৩ ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব সংস্কৃতিকে মানুষের প্রয়োজন সাধনের একটি উপায় হিসেব ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হলেন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনোস্কি (Bronislaw Malinowski)। তিনি দেখান যে, মানব-সংস্কৃতির জন্ম ও বিকাশ তিন ধরনের প্রধান প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে হয়েছে। এগুলি হ'ল— মৌলিক (Basic) প্রয়োজন, আহৃত (Derived) প্রয়োজন এবং সমন্বিত (Ingtegrative) প্রয়োজন। খাদ্য, বাসস্থান, শারীরিক সুরক্ষার মতো অতি আবশ্যিক চাহিদাগুলি হ'ল মৌলিক প্রয়োজন, যা ছাড়া আমাদের পক্ষে টিকে থাকাই অসম্ভব। এই মৌলিক প্রয়োজনগুলি খুঁজতে গিয়ে মানুষকে যে ধরনের সম্পর্ক বা সামাজিক ব্যবস্থাপনার দ্বারস্থ হতে হয় তাদেরকে 'আহৃত প্রয়োজন' বলা হয়। যেমন— শ্রমের বিভাজন, খাদ্য বণ্টন, প্রতিরক্ষা, প্রজনন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। সর্বশেষে, 'সমন্বিত প্রয়োজন' বলতে মানসিক সুরক্ষা, সামাজিক একতা, এবং মানবজীবনের নান্দনিক উদ্দেশ্যগুলিকে বোঝায়, যা আইন, ধর্ম, যাদু, জ্ঞান, বিশ্বাস বা শিল্পকলার সহায়তায় আমরা পূরণ করি। যেমন যাদুবিদ্যা মানুষকে অজানা ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মোদ্যোগ গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। আবার, কোন গল্পকথা (Myth) সমাজের মূল্যবোধ ও নীতিকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। ম্যালিনোস্কি তাই বলেন যে, আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয় বা বস্তুর কোন না কোন ভূমিকা বা ক্রিয়া আছে এবং একটি সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ যতদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তা টিকে থাকবে। ম্যালিনোস্কির ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যায় মানবীয় প্রয়োজন ও তার সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়াগুলিকে যেভাবে সর্বজনীনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হ'তেও পারে। কেননা তাই যদি হ'ত তাহ'লে মানব-সংস্কৃতি এত বৈচিত্র্যপূর্ণ হ'ত না। সমস্ত ধরনের মানব পরিবার যদি একই প্রয়োজন সাধন করে থাকে তাহলে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থার উদ্ভব হ'ল কেন? সর্বজনীন ক্রিয়ার (Universal Functions) ধারণা তাই পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সামাজিক ক্রিয়ার গুরুত্বকে নমনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

ম্যালিনোস্কি অবশ্য মার্কিন বিস্তৃতিবাদীদের মত সংস্কৃতিকে সার্বিক (Holistic) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কোন একটি সাংস্কৃতিক উপাদানের বহুবিধ গুরুত্ব ও অর্থ থাকতে পারে। ট্রবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের জীবনপ্রণালীর পর্যবেক্ষণ ও অধ্যায়ন থেকে তিনি দেখান যে, মানবসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি সমন্বিত আকারে অবস্থান করে। যেমন, 'কুলা' (Kula) নামক অলঙ্কার বিনিময়ের প্রথাটি ট্রবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের জীবনের বিভিন্ন দিক, যেমন—অর্থনীতি, জ্ঞাতিত্ব, রাজনীতি, যাদু, সম্মান,

প্রযুক্তি, কল্পকথা, বন্ধুত্ব ও বিবাহ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, একটি সাংস্কৃতিক উপাদানের অস্তিত্ব ও ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য আমাদের সেই উপাদানটিকে সমাজ ও সংস্কৃতিক সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে।

ম্যালিনোস্কির ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (A.R. Radcliffe Brown) দেখান যে, একটি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্রিয়াশীল উপাদানগুলি পারস্পরিক অদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একটি কাঠামো (structure) সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এই কাঠামোটি মানুষকে তার পরিবেশের সাথে এবং সমাজের অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কিত করে রাখে। ব্রাউনের মতানুযায়ী যে সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদান সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি এবং সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে, সেগুলি মানবসংস্কৃতির বিকাশ ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ। একথা ঠিক যে, মানবসমাজে এমন অনেক সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ আছে যা গোষ্ঠী সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তথাপি 'কাঠামোগত ক্রিয়াবাদী' (Structural functionalist) নামে পরিচিত এই তত্ত্বটি শুধুমাত্র সংহতি, স্থায়িত্ব বা সমন্বয়মূলক ক্রিয়ার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব এবং কাঠামোগত ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব মানবসংস্কৃতির পরিবর্তনকে বুঝতে ততটা সহায়তা করে না। এছাড়া দ্বন্দ্ব, কর্মহীনতা (Nonfunction) বা বিরুদ্ধ ক্রিয়ার (Dys-functions) মত প্রক্রিয়াও এই তত্ত্বগুলি আলোচনা করে নি।

৮.৫.৪ জ্ঞানমূলক নৃতত্ত্ব ও প্রতীকীবাদ

সংস্কৃতি সামাজিক উৎস সন্ধানে আমরা আরো কিছু তত্ত্বের অবতারণা করতে পারি। যেমন—জ্ঞানমূলক নৃতত্ত্বের প্রবক্তারা সংস্কৃতিকে কিছু নিয়ম, অর্থ (Meaning) ও জ্ঞানের সমষ্টি বলে অভিহিত করেন, যা আমাদের আচরণকে নির্দেশ করে। এদের মতে, সংস্কৃতি হ'ল এক ধরনের আচরণসংহিতা যার অনুশীলন থেকে জানা যায় যে, মানুষ কিভাবে তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করে এবং জীবনের অর্থ খুঁজে নেয়। সুতরাং, সংস্কৃতি জানার মধ্য দিয়ে মানুষ শুধুমাত্র কিছু নীতি বা প্রথার সাথেই পরিচিত হয় না, কিভাবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদের পরিচালিত করতে হয় তার জ্ঞানও লাভ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়; একটি সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের অনুশীলন থেকে সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে হয়।

জ্ঞানমূলক নৃতাত্ত্বিকদের বক্তব্যের মতই প্রতীকীবাদীরা সংস্কৃতিকে এমন কিছু প্রতীক ও অর্থের সমষ্টি বলে গণ্য করেন যা সামাজিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতির গঠনে এই ধরনের Shared প্রতীক বা অর্থের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কোন একটি সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ আমাদের কাছে অর্থবহ বলেই গ্রহণীয়। যে কোন সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া প্রতীকের ব্যবহার ও তার অর্থের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। যেমন—ভিন্ন ভাষাভাষী দু'জন মানুষের পক্ষে কথোপকথন সম্ভব নয়। আবার শারীরিক অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়ে যে বক্তব্য ব্যক্ত হয় তা আদান-প্রদানকারী মানুষের কাছে বোধগম্য হ'তে হবে। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টির পেছনে তাই যৌথ জীবনযাত্রায় সৃষ্ট প্রতীক ও অর্থের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৫.৫ সাংস্কৃতিক বাস্তুবিদ্যা

বাস্তুবিদ বা ইকোলজিষ্টরা মানবসংস্কৃতিকে একটি অভিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়া (Adaptive response) বলে ব্যাখ্যা করেন। পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে এবং বেঁচে থাকা তথা মানব-প্রজননের স্বার্থে মানুষ যে সমস্ত বস্তুগত ও মানসিক উপাদানের সৃষ্টি করে তার অন্য নাম হ'ল সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদীরা 'সংস্কৃতি' শব্দটির পরিবর্তে 'সামাজিক-সংস্কৃতি ব্যবস্থা' বা (Socio-cultural system) শব্দটি পছন্দ করে থাকেন। কেননা, তাদের কাছে সংস্কৃতি হ'ল সামাজিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রেরিত এমন কিছু আচরণ প্রণালীর সমষ্টি

যাতে প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, বসবাসের ধরন, সামাজিক গোষ্ঠী, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাস্তুবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিকাশে বিভিন্ন পর্যায়ের কথাও বলে থাকেন। কিন্তু সমসাময়িক সাংস্কৃতিক বস্তুবাদীদের কাছে পর্যায়কৃত সংস্কৃতি বিকাশের ধারণা প্রায় সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু সাধারণভাবে এদের সবাই একমত যে, মানবসমাজে কিভাবে বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন বিস্তারলাভ করে তা জানতে হ'লে সংস্কৃতিকে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা বলে ব্যাখ্যা করতে হবে, যা মানব-সম্প্রদায়গুলিকে তাদের বাস্তুগত বা ইকোলজিক্যাল বিন্যাসের সাথে সযুক্ত করে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অভিযোজনমূলক ক্ষমতাকে বাস্তুবাদীকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মনে হতে পারে এটি ক্রিয়াবাদেরই অন্য একটি ধরন। এই সমালোচনাটি অবশ্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বাস্তুবাদীদের কাছে অভিযোজন শুধু একটি ক্রিয়া নয়, এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হই। বাস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রধান সমালোচনা হ'ল এটি সংস্কৃতির প্রতীকী উপাদানগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। তথাপি, বাহ্যিক ও সামাজিক পরিবেশের সাথে মানবগোষ্ঠীর সামঞ্জস্য বিধানের যে তত্ত্ব সাংস্কৃতিক বাস্তুবিদ্যা প্রদান করে, তা সমাজতত্ত্বে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

৮.৬ সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম

ঊনবিংশ শতাব্দীর শে, ভাগ থেকে মানবসংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে গণমাধ্যম। সংবাদপত্র, সিনেমা, সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তক, রেডিও, টেলিভিশন এবং কম্পুটারের মতো গণমাধ্যমগুলি আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সাথে এতটাই জড়িয়ে গেছে যে গণমাধ্যমবিহীন কোন মানবজীবন ও সংস্কৃতির কথা আমরা ভাবতে পারি না। এমনকি, প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিম অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিও আজ গণমাধ্যমের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। মানব-সংস্কৃতিতে গণমাধ্যমের প্রভাবকে আমরা বিভিন্নভাবে আলোচনা করতে পারি।

প্রথমত, গণমাধ্যমগুলি সাংস্কৃতিক বিস্তৃতিকে সম্ভবপর করার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। বিভিন্ন সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষের কাছে যখন কোন বিশেষ নিয়ম-নীতি, আদর্শ বা অন্য কোন সাংস্কৃতিক উপাদান প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শিত হয়, তখন তা অনেক বেশিমাত্রায় আমাদের মনকে ও চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আধুনিক ফ্যাশান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দূরদর্শন বা সিনেমার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি তাতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে একটি স্বল্প পরিসরে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যমগুলি আমাদের সামাজিকীকরণ ও শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, দূরদর্শন বা কম্পিউটার যে তথ্য অতি দ্রুততার সাথে আমাদের কাছে পরিবেশন করে, তা আধুনিক জীবনযাপনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। জটিল সমাজের মানুষ দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য গণম্যধ্যমগুলির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। খেলাধূলা, রাজনীতি, অর্থনীতি শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং মানবজীবনের অন্যান্য ঘটনাক্রম পরিবেশের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমগুলি আমাদের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। এন্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens) তাই গণমাধ্যমগুলিকে 'means of aceess to the knowledge' বলে গণ্য করেছেন। গণ-যোগাযোগকে (mass communication) সম্ভব করে তোলার ক্ষেত্রে এই মাধ্যমগুলির ভূমিকা অদ্বিতীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটপ্রদান প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলার

ক্ষেত্রে যে তথ্য ও জ্ঞানের প্রয়োজন তা গণমাধ্যমের সহায়তায় অধিক সুচারুভাবে পরিবেশিত হতে পারে। তাছাড়া ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

গণমাধ্যমগুলির উপরোক্ত সদর্থক ভূমিকা সত্ত্বেও শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সিনেমা বা টেলিভিশনের ভূমিকা আজ যথেষ্ট আলোচিত বিষয়। টেলিভিশন বা সিনেমার পর্দায় যে চরিত্রগুলি দেখানো হয় তা শিশুদের মানসিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বাস্তবিক জগতে বাবা-মা, শিক্ষক-বন্ধু বা প্রতিবেশীর চরিত্রগুলির সাথে যখন রূপালি পর্দার নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র ও ভূমিকার পার্থক্য ঘটে তখন শিশু বা কিশোরের মনে নিরাশা ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম হতে পারে। টেলিভিশন শিশুদের চিন্তা ও কাজের সৃজনশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করা হয়। কেননা সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচারের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন ও ভিডিও আমাদের জীবনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। গৃহবন্দী মানুষের জীবন থেকে তখন সামাজিক মেলামেশা ও সমাবেশের ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যায়। সর্বোপরি, হিংসা ও যৌনতার প্রদর্শন শিশু ও কিশোরদের মনকে কলুষিত করে তোলে বলে কিছু গবেষণায় দেখা গেছে। অবশ্য, শিশুরা টেলিভিশনের এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয় সে সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যও রয়েছে। তবে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হিংসা বা যৌনতা শিশুর আচরণ ও মনোভাবকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না একথা মানা যায় না। এই ধরনের মাধ্যমগুলিকে তাই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারে নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না।

তৃতীয়ত, গণমাধ্যমগুলি জনমত গঠনে সহায়তা করে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে জনগণকে জাগরিত করার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমগুলি সরকার, রাজনৈতিক দল বা সামাজিক গোষ্ঠীর কার্যক্রমকে সংযত ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এমনকি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকেও গণমাধ্যমগুলি প্রভাবিত করে। তথ্য পরিবেশন ও তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা হয়। অবশ্য শ্রেণীগত, ব্যবসায়িক, গোষ্ঠী বা দলগত স্বার্থকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমগুলি যখন বিভ্রান্তি ছড়ায় তখন জনমানসে এদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং প্রতিযোগিতা গণমাধ্যমগুলিকে অনেক সময়ই আকাঙ্ক্ষিত বা গঠনমূলক জনমত সৃষ্টির পরিবর্তে বাজার-জাত জনমতকে বৈধতা প্রদানে চালিত করে।

চতুর্থত, গণমাধ্যমগুলি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ও ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নির্ণায়ক হতে পারে। মানবিক সম্পর্ক ও ক্রিয়াকে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে যখন এই মাধ্যমগুলি ব্যাখ্যা করে তখন সৃষ্টি হয় নতুন ধারণা, মূল্যবোধ ও আদর্শের। পরিবর্তিত সমাজ ও জীবনের পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া ও ভূমিকার সংজ্ঞা প্রদানেও গণমাধ্যমগুলি সচেষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, টেলিভিশনের পর্দায় বা বিজ্ঞাপনে নারীচরিত্রের যৌন আবেদন যখন অতিরঞ্জিতভাবে প্রদর্শিত হয় তখন নারীর মর্যাদা ও ভূমিকার ব্যাখ্যা বিতর্কিত হয়ে পড়ে। একইভাবে নারীস্বাধীনতা ও নারীবাদকে (Feminism) প্রতিষ্ঠিত করতেও গণমাধ্যম সহায়তা করে। চলচ্চিত্র, নাটক বা কোন ধারাবাহিক অনুষ্ঠান (সিরিয়েল) প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ব্যবস্থার বিকল্পগুলি প্রদর্শন করতে পারে এবং ইদানিং কালে এই ধরনের বিকল্প ব্যাখ্যার প্রয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও গণমাধ্যমগুলি একটি ভোগবাদী সংস্কৃতির (consumer culture) বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আধুনিক জীবনে মর্যাদার একটি সূচক হিসেবে ভোগ্যপণ্যের উপস্থিতি তাই অতি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, ভোগবাদী সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য আমাদের মানসিকতা ও চেতনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

পঞ্চমত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার হিসেবেও গণমাধ্যম কাজ করে। সমাজ কাঠামোর রক্ষণশীলতা, শ্রেণী-শোষণ, সামাজিক অবদমন, বা অন্য কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্র, সাময়িক পুস্তিকা

বা পুস্তক যখন প্রচারে অবতীর্ণ হয় তখন সামাজিক পরিবর্তনের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ মতামত গঠিত হ'তে পারে। সামাজিক আন্দোলনের স্বপক্ষে (বা বিপক্ষে) মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়েও গণমাধ্যম সামাজিক পরিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

ষষ্ঠত, আমোদ-প্রমোদের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যমগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্যাটার্নকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। আধুনিক সমাজে অবসর সময় এবং অবসরের গুরুত্ববৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অবসর জীবনযাপনের নানান সাধন। পৃথিবীর ১১টি দেশের টেলিভিশন দর্শকদের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের অবসর জীবনের একটি প্রধান আশ্রয় হচ্ছে টেলিভিশন এবং বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই নির্ভরশীলতা অধিক। স্বভাবতই জটিল সমজের মানুষের কাছে সামাজিক সম্পর্ক, মেলামেশা, বন্ধুত্ব, আড্ডা বা গল্প-গুজবের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। আধুনিক সমাজ-জীবনের ব্যক্তিতান্ত্রিকতাকে তাই গণমাধ্যম প্রশ্রয় দেয়।

৮.৭ সারাংশ

নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অতি আলোচিত বিষয় হ'ল সংস্কৃতি। মানব ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে সব জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিক বিধান, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য যে সমস্ত গুম ও অভ্যাস অর্জন করে নেয় তার জটিল সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি। মানবজীবনের বিভিন্ন বস্তুগত এবং অ-বস্তুগত বা মানসিক উপাদানের সংমিশ্রণের সংস্কৃতি গঠিত হয়। সমাজ যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য নির্দেশ করে তখন তারা সভ্যতাকে বস্তুগত সংস্কৃতির এবং সংস্কৃতিকে মানবসংস্কৃতির সমার্থক বলে গণ্য করে। তাই বলা যায়, সভ্যতা হ'ল আমাদের আছে এবং সংস্কৃতি হ'ল যা আমরা তাই।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, মানবসমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালনা করার জন্য সংস্কৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পৃথিবীতে সমস্ত সমাজেই এমন কিছু সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ দেখা যায় যেগুলো সর্বজনীন এবং মানবসমাজের স্বকীয়তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই প্রলক্ষণগুলিকে বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ বলে। বিশ্বজনীন সংস্কৃতির বিস্তারে সাংস্কৃতিক বিস্তৃতি একটি প্রধান কারণ। বিশ্বায়নের প্রভাবে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধিতেও সাহায্য করেছে। এর ফলে উপসংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। উপসংস্কৃতি বলতে কোন একটি জটিল সমাজের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ব্যবস্থার বিভিন্নতাকে বোঝায়। কোন উপসংস্কৃতি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে মূল সংস্কৃতির বিরোধী অবস্থানে আসতে পারে। তখন তাকে বিরুদ্ধ সংস্কৃতি বলা হয়। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং উপসংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক পরিচয়।

সংস্কৃতির সামাজিক উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে, যেমন—ধ্রুপদী বিবর্তন তত্ত্ব, বিস্তৃতিবাদ, ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব, জ্ঞানমূলক তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক বাস্তুবিদ্যা প্রভৃতি।

সংস্কৃতির প্রসারে বর্তমান যুগে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৮.৮ অনুশীলনী

১. সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতির স্বরূপ আলোচনা করুন।

২. সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
৩. সংস্কৃতির সামাজিক উৎস-সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের পর্যালোচনা করুন।
৪. মানবসংস্কৃতিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৫. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   (ক) সাংস্কৃতিক বিশ্বজনীনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
   (খ) উপসংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়? উপসংস্কৃতির দৃষ্টি কিভাবে হয়?
   (গ) বিস্তৃতিবাদের মূল বক্তব্য কি?
   (ঘ) সংস্কৃতি কেন পরিবর্তনশীল?
৬. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   (ক) সাংস্কৃতিক বিলম্বন কি?
   (খ) বিরুদ্ধ সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়?
   (গ) নৃকুলাভিমানের সংজ্ঞা দিন।
   (ঘ) সাংস্কৃতিক বাস্তুবিদ্যা বলতে কি বোঝায়?

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Raymond Wiliams : Culture
(২) Anthony Giddesn : Sociology
(৩) Serena Nanda : Cultural Anthropology
(৪) অনাদি কুমার মহাপাত্র ঃ বিষয় ঃ সমাজতত্ত্ব
(৫) অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ প্রসঙ্গ ঃ সমাজতত্ত্ব
(৬) Mike Featherstone : Undoing Culture—Globalization, Postmodernism and Identity.

একক ৯ □ সংস্কৃতির উপাদানসমূহ

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য
৯.১ প্রস্তাবনা
৯.২ বস্তুগত ও মানসিক উপাদান
৯.৩ বিশ্বাস ও মনোভাব
৯.৪ নীতি ও মূল্যবোধ
৯.৫ প্রতীক ও সংকেত
৯.৬ ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞান
৯.৭ সারাংশ
৯.৮ অনুশীলনী
৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- সংস্কৃতির মুখ্য উপাদানগুলি কি কি ?
- বিশ্বাস, মনোভাব, নীতি, মূল্যবোধ, প্রতীক, সংকেত, ভাবাদর্শ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বলতে কি বোঝায় ?
- এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি ?

৯.১ প্রস্তাবনা

সংস্কৃতির অর্থ ও তাৎপর্য আরও পরিষ্কার করে বোঝার জন্য এর বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে সাধারণ ও বিশেষ —এই দুই অর্থে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সাধারণ অর্থে এটি সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝায়, যেগুলো প্রাণীজগতে কেবলমাত্র মনুষ্য সমাজেই লক্ষণীয়। বিশেষ অর্থে এটি কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনধারা বা ব্যবহার বিধিকে বোঝায়। যেমন—চৈনিক সংস্কৃতি, এস্কিমো সংস্কৃতি বা হিন্দু সংস্কৃতি ইত্যাদি।

৯.২ বস্তুগত ও মানসিক উপাদান

সংস্কৃতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন বস্তুগত ও মানসিক বা অ-বস্তুগত উপাদানের সংমিশ্রণে সংস্কৃতি গঠিত হয়। সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে যাবতীয় কারুকলা, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক আবিষ্কার এবং মানব সৃষ্ট অন্যান্য বস্তু যেমন ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, মন্দির-মসজিদ, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি যা আমাদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ। সংস্কৃতির এই সমস্ত বাহ্য বা অ-প্রতীকী উপাদান

অবশ্য মূল্যবান নিরপেক্ষ নয়। স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শ অনুযায়ী বস্তুগত সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের গুণগত মান নিরূপিত হয়ে থাকে। কেননা সংস্কৃতির এই বহিরঙ্গগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার অন্তরঙ্গের প্রতিলন বলে মনে হয়। আমরা যা ভাবি এবং যা করি—এই দুই-এর মধ্যে যোগসাজশ অবশ্যই বর্তমান থাকে।

সংস্কৃতির মানসিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে আমাদের বিশ্বাস, মনোভাব নীতি, মূল্যবোধ, প্রতীক, আদর্শ ধারণা, কল্পনা, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই উপাদানগুলি পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করলেও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সক্রিয় থাকে এবং একটি সামগ্রিক চরিত্রের উপস্থাপনা করে। এই মানসিক উপাদানগুলি একক বা যৌথভাবে আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম ও বস্তুজগতের বিভিন্ন ঘটনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের আদর্শ বা মানসিকতা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করতে পারে, আবার অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের চিন্তাভাবনা ও সমাজজীবন-পদ্ধতিতে পরিবর্তন সূচিত করতে পারে। আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ও নীতির ভূমিকাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি এটাও ঠিক যে মারণাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক সাফল্য এই মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এই কারণে সংস্কৃতির বস্তুগত ও মানসিক উপাদানগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে সাজিয়ে আলোচনা অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না। তথাপি সংস্কৃতির মানসিক উপাদানগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করার জন্য এখন আমরা এই ধরনের কিছু উপাদান নিয়ে আলোচনা করব। প্রত্যেক সমাজের সংস্কৃতিগত পার্থক্য এই সমস্ত মানসিক উপাদানের উপর নির্ভর করে।

৯.৩ বিশ্বাস ও মনোভাব

আমাদের কর্মকুশলতার জগতে বিশ্বাস ও মনোভাবের গুরুত্ব যথেষ্ট। যখন কোন মত, আদর্শ, ঘটনা বা বস্তুকে আমরা সত্য বলে মনে করি এবং তার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করি তখন তাকে বলাহয় 'বিশ্বাস'। বিশ্বাস বাস্তবিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত না হ'লেও ব্যক্তির আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকে এটি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে পূজা-অর্চনায় অনুপ্রাণিত করে। যিনি ধর্মীয় সহনশীলতায় বিশ্বাস রাখেন, তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। আবার কিছু বিশ্বাস (যেমন, সাম্প্রদায়িকতা, জাত্যাভিমান) সমাজে হানাহানির কারণ হতে পারে। মানবীয় সম্পর্কের স্থায়িত্ব বিশ্বাসের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এমনকি অপরিচিত দুই ব্যক্তির মধ্যেকার মিথষ্ক্রিয়াও কিছু মানবীয় বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই চলতে পারে। বিশ্বাস সত্যি হ'লে সৃষ্টি হয় ভক্তি ও ভালোবাসার; অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক সমাজে নিন্দার পাত্র বলে বিবেচিত হয়। বিশ্বাস মানুষকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও অনুপ্রাণিত করে। যেমন, বি ম্যালিনোউস্কি (B. Malinowski) দেখিয়েছেন যে ট্রবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ গভীর সমুদ্রে মৎস শিকারে যাবার পূর্বে কিছু যাদুবিদ্যার (Magic) অনুষ্ঠান করে। কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, ঐ ধরনের অনুষ্ঠান করলে ভবিষ্যতের বিপদ থেকে তারা রক্ষা পাবে। আধুনিক নগরকেন্দ্রিক জটিল সমাজজীবনে সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধি ও অবিশ্বাসের মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বলা যায় যে, বিশ্বাসবিহীন কোন মানবসমাজ সম্ভব নয়।

বিশ্বাস ও মনোভাব পরস্পর সম্পর্কিত, কেননা কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তিমানবের বিশ্বাস বা জ্ঞান থেকে যে ধারণা জন্মায় তাকেই 'মনোভাব' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। 'মনোভাব' বলতে সাধারণভাবে আমরা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে বোঝাই। অন্য কোথায় বলা যায় যে, মনোভাব হ'ল আমাদের মনোগত সচেতনতার সূচক। এটি একটি সামাজিক বিষয়, কেননা আমরা কোন বিশেষ মনোভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করি না। সমাজে বসবাসের মধ্য দিয়ে অন্যের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মনোভাব গঠিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে

মনোভাবকে আমরা সামাজিক পরিমণ্ডলের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের নির্দেশক একটি পরিণতি বলে গণ্য করতে পারি।

একেবারে প্রথম অবস্থায় শিশুর মনোভাব খুব সাধারণভাবে আনন্দ ও বেদনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের অনুভূতি তাদের জৈবিক চাহিদার পরিতৃপ্তি বা অতৃপ্তিকে কেন্দ্র করে আসে। যেমন, বিশেষ খাবারের প্রতি শিশুর ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই মনোভাবগুলি পরবর্তীকালে তার খাদ্যাভ্যাসকে প্রভাবিত করে। তবে, মানবশিশু যেহেতু একটি সামাজিক পরিবেশে পরিবার ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, সেহেতু আমাদের মানসিকতার গঠনে সামাজিক পরিবেশও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণের যতই বুদ্ধি পায় ততই তার মনোভাবের বিস্তৃতি ও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, ছোটবেলায় যে খাদ্য পছন্দ হত না, পরবর্তীকালে তা অতি প্রয়োজনীয় ও সুস্বাদু বলে মনে হ'তে পারে। একইভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ক্ষেত্র যতই প্রসারিত হয়, মনোভাবের বিস্তৃতি ততই ঘটতে থাকে। বিশ্বাস ও মনোভাব অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং অর্জিত বলে এগুলি পরিবর্তনযোগ্য। কিন্তু বাস্তবে তা সব সময় সম্ভব নাও হ'তে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মনোভাবও অভ্যাসের মতো একবার গঠিত হ'লে তার পরিবর্তন কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মনোভাব ও আগ্রহ (Interest) পরস্পর সম্পর্কিত হ'লেও এক জিনিস নয়। আগ্রহকে আমরা সাধারণত সদর্থক প্রবণতা বলে ব্যাখ্যা করি। যেমন শিক্ষালাভে আগ্রহ, কাজকর্মে আগ্রহ, সঙ্গীতে আগ্রহ ইত্যাদি। কিন্তু মনোভাব সদর্থক ও নঞর্থক— দুই-ই হ'তে পারে। তাছাড়াও মনোভাব ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু আগ্রহ হ'ল বিষয়গত। যেমন, খেলাধূলায় কারো আগ্রহ আছে কি নেই তা যাচাই করা যেতে পারে, খেলাধূলার প্রতি মনোভাব নয়। একই বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে তাদের মনোভাব এক হয় না। অবশ্য মনোভাব সৃষ্টিতে আগ্রহের ভূমিকা থাকে না এখন নয়। তথাপি ব্যক্তির শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার পার্থক্যের দরুন মনোভাব একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত হয় যা অনেকক্ষেত্রেই অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে।

৯.৪ নীতি ও মূল্যবোধ

মানবসংস্কৃতিতে নীতি ও মূল্যবোধের অবস্থান পশুসমাজের সাথে আমদের পার্থক্যকে সূচিত করে। নীতি ও মূল্যবোধের সহায়তায় আমরা মানবজীবনকে শিষ্টাচারের গণ্ডীর মধ্যে বেঁদে রাখতে সক্ষম। 'নীতি' বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অনুসরণযোগ্য কিছু নিয়মকানুন বা নির্দেশনাকে বোঝানো হয়। গোষ্ঠী ও সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে সর্বদাই আচরণগত কিছু বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। অন্যথায় সমাজ সম্ভব হতে পারে না। গোষ্ঠীগত বা সমষ্টিগত মানদণ্ডে আমাদের আচরণের যৌক্তিকতা যাচাই হয় বলেই মানবজীবন বিশৃঙ্খল হয় না। স্বভাবতই প্রত্যেক সমাজে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-ব্যবহার সমাজস্বীকৃতি কিছু নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, পিতা মাতা বা বয়স্কদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের নীতি প্রায় সব সমাজেই প্রচলিত আছে। অন্যদিকে, বন্ধু-বান্ধব বা বিশেষ বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক স্বীকৃত। আবার, রক্ত-সম্পর্কের, আত্মীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নীতি বিরুদ্ধ। একইভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার ও মেলামেশার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতির অবস্থান রয়েছে। হিন্দু সমাজে বিবাহিত রমণীদের সিঁদুর দেওয়ার নীতি একসময় বাধ্যতামূলক ছিল। এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে প্রচলিত কোন নীতি কিছু নৈতিক মানদণ্ডে স্বীকৃতি লাভ করে। এই কারণে নীতিকে অভিপ্রেত বা আদর্শ ব্যবহার বলেও আখ্যা দেওয়া হয়। ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সম্বলিত এই সামাজিক নীতিগুলি সমাজে প্রচলিত আইন-ব্যবস্থা, লোকাচার, লোকনীতি, প্রথা

প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। অধ্যাপক অগবার্ন ও নিমকফ (W.F. Ogburn and M.F. Nimkiff)-এর মতে "সামাজিক নীতি হ'ল এক ধরনের সামাজিক ব্যবহার যা সমাজস্বীকৃত এবং যার থেকে বিচ্যুতি সামাজিকভাবে নিন্দিত হয় এবং কখনো কঠোর শাস্তি পেতে হয়।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, সামাজিক নতি শুধুমাত্র কিছু ঔচিত্যবোধক আচরণই নয়; এর সাথে বাধ্যবাধকতার প্রশ্নও জড়িত থাকে। এই জন্যই নীতি থেকে বিচ্যুতিকে সামাজিক ব্যর্থতা বলে গণ্য করা হয় এবং তখন তা নিন্দা বা শাস্তির এক্তিয়ারভুক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সামাজিক নীতির অনুসরণকারী প্রশংসা বা সম্মানের অধিকারী হন। অর্থাৎ শাস্তিদান বা পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাজে নীতিসমূহকে বলবৎ রাখার চেষ্টা হয়। অবশ্য, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন সাধারণ অনুভব করা হয় না, যেহেতু মানুষ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নীতিগুলিকে আয়ত্ত করে নেয়। ফলে, স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ নীতিবিরুদ্ধ হয় না। তবে পরিবর্তনশীল সমাজে প্রচলিত নীতির যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটলে নীতিবিরুদ্ধ মানসিকতার জন্ম হতে পারে। তাই পরিবর্তিত সমাজজীবনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক নীতিসমূহের পরিবর্তনও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সুতরাং সামাজিক নীতি অপরিবর্তনীয় বা চিরস্থায়ী নয়। তাছাড়া, লিঙ্গ, বয়স, বৃত্তি, পদমর্যাদা ভূমিকা এবং অন্যান্য অবস্থার তারতম্য ভেদে সামাজিক নীতিসমূহের গ্রহণযোগ্যতায় তারতম্য ঘটতে পারে। যেমন শিশু ও বয়স্কদের আচার-ব্যবহারের ঔচিত্যবোধ সম্পর্কে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বা মানদণ্ডের অবতারণা হতে পারে। এই ধরনের তারতম্য অবশ্য সামাজিক নীতির গুরুত্বকে ম্লান করে দেয় না। বরং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রযোজ্য হ'লে নীতি অধিক গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক নীতির উপস্থিতি যে কোন সমাজ ও সংস্কৃতিতেই দৃষ্টিগোচর হয়। ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। অনুশাসন বিহীনতার দুঃস্বপ্ন থেকে নিজেদের রক্ষা করতেই মানুষ সামাজিক আচরণ, সম্পর্ক বা ক্রিয়ার নির্দিষ্ট মান নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়। সামাজিক নীতিগুলি তাই মানব ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে।

নীতির মতো 'মূল্যবোধ' ও মানবিক মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিছু ঔচিত্যবোধক বা প্রত্যাশিত আচরণবিধির নির্দেশ করে। নীতিও মূল্যবোধ তাই গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। সামাজিক নীতিসমূহ মানুষের আচরণের যে মান নির্দেশ ক'রে দেয় তা অনেকক্ষেত্রেই মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার, কোন বিশেষ মূল্যবোধ থেকে বহুবিধ নীতি আত্মপ্রকাশ করতে পারে। মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মূল্যবোধ, যেমন— শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মমত্ববোধ, দয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক নীতি, যেমন —নমস্কার, উপহার প্রদান, করমর্দন, সংঘর্ষ পরিহার করা ইত্যাদিকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে, সামাজিক নিয়ম-নীতির অনুকরণ মূল্যবোধকে জনপ্রিয় করে তোলে। যেমন, যৌথ পরিবার প্রথা তার সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহনশীলতার আদর্শ বিস্তারে কার্যকর হয়।

নীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে উপরোক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দু'টি এক জিনিস নয়। প্রথমত, মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্র ভিন্ন কিছু সাধারণ বিশ্বাস বা আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু নীতি হ'ল এমন কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশনা যা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়। যেমন, মানবিকতা হ'ল একটি মূল্যবোধ, কিন্তু ভিক্ষা প্রদান বা উপহার প্রদান রীতি-নীতির পর্যায়ে পড়ে। আবার নমস্কার করা হ'ল নীতি, কিন্তু শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা হ'ল মূল্যবোধ।

দ্বিতীয়ত, নীতিগুলি খুবই নির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত থাকে বলে নীতি-বিরোধিতা সহজেই চোখে পড়ে এবং এই কারণে সমাজ নীতি-বিরোধিতাকে সাধারণত প্রশ্রয় দেয় না এবং প্রয়োজনে বাধ্যতামূলকভাবে এগুলি বলবৎ করা হয়। কিন্তু মূল্যবোধের প্রয়োগ এভাবে সম্ভব নয়। নৈতিক অনুজ্ঞার স্তরে আমাদের কল্পনাতে যে বিশ্বাস বা মূল্যবোধ থাকে তা অনেক সময়েই অপ্রকাশিত থেকে যায়, ব্যক্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ মূল্যবোধের প্রতি তার সমর্থন বা অনীহা প্রকাশ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রশংসা বা নিন্দার পাত্র বলে বিবেচিত হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা মূল্যবোধের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারি। মূল্যবোধ হ'ল এক ধরনের বিশ্বাস বা ধারণা যা কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা ক্রিয়াকে শ্রেষ্ঠ, কাম্য ও অনুসরণযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করে। কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) বলেন যে, "মূল্যবোধ হচ্ছে এমন কিছু যা বাঞ্ছনীয়, এবং যা অনুসরণ করা কাম্য, যদিও বাস্তবে তা অনুসৃত নাও হতে পারে" (A value is that which is considered desirable which is sought worthy of being purpused regardless of whether or not it is actually being pursued)। কি হওয়া উচিত—মূল্যবোধ এই বিষয়ে মূলত নির্দেশ করে; কি হচ্ছে তা নয়। ফলে মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে কোন সমাজের নৈতিক ভাবাদর্শের প্রকাশ ঘটে। তবে সমাজ ও সময় ভেদে মানুষের বিশ্বাস-প্রত্যয়ে বিভিন্নতার ফলশ্রুতি হিসেবে মূল্যবোধের বিভিন্নতাও প্রকট হয়। যেমন, পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক মূল্যবোধ মানুষের সম্পর্ক ও কর্মপরিধির ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। কিন্তু ভারতীয় তথা এশীয় মানসিকতায় আধ্যাত্মিক ও সংঘবদ্ধ আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। অবশ্য, তার মানে এই নয় যে ভারতীয় সভ্যতায় বস্তুতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। বস্তুতপক্ষে, মূল্যবোধজনিত বিভিন্নতা একটি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ যেমন—ধনী দরিদ্র, গ্রাম ও শহরের মানুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যাদির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে কোন সমাজে সর্বজনীন কিছু মূল্যবোধের পাশাপাশি গোষ্ঠীগত বা স্থানীয় মূল্যবোধের অস্তিত্বও বর্তমান থাকে। নীতির মতো মূল্যবোধও পরিবর্তনশীল বিষয়। আমাদের সমাজ জিজ্ঞাসা ও জীবন দর্শনের পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে মূল্যবোধেরও রূপান্তর ঘটে। এই কারণে মূল্যবোধকে আপেক্ষিক বিষয় বলেও ব্যাখ্যা করা হয়। যে আদর্শ আমাদের কাছে আজ গ্রহণযোগ্য, তা অন্য প্রেক্ষাপটে বা অন্য সময়ে রক্ষণশীল বলে মনে হতে পারে। অবশ্য, তার মানে এই নয় যে, মূল্যবোধ গুরুত্বহীন। সংস্কৃতি ও সমাজ সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনশীলতাই সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জীবন্ত করে তোলে। ব্যক্তির আচার-ব্যবহারে যৌক্তিকতা, মনোভাব, প্রয়োজন ও আদর্শ এবং সমাজজীবনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রশ্নের নান্দনিক ও নীতিগত প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ে মূল্যবোধ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

৯.৫ প্রতীক ও সংকেত

মানবসংস্কৃতির আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক উপাদান হ'ল প্রতীক ও সংকেত। প্রতীক সংকেতের ব্যবহার একান্তভাবে মানবসংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা পশুসমাজের সাথে আমাদের পার্থক্যকে সুনিশ্চিত করে। উন্নত প্রজাতির কিছু প্রাণীর মধ্যে সংকেতের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও তা মানবসমাজে ব্যবহৃত সংকেতের তুলনায় অতি নিম্নমানের। 'প্রতীক' বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যা অন্য কোন বস্তু ধারণা বা বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে যেমন, কোন প্রতিমূর্তি (statue), একজন ব্যক্তি, একটি ঘটনা বা ধারণার প্রতীকমূলক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। আবার একটি শব্দ (word) বা শব্দ-সমষ্টির সহায়তায় কোন কিছুর চরিত্রকে আমরা বোঝাতে সক্ষম হই। যেমন, 'কুকুর', 'বেড়াল' ইত্যাদি শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ প্রাণীর প্রতি ইঙ্গিত করে। এক্ষেত্রে শব্দ বা নাম প্রতীকের কাজ করে। প্রতীকের মতো সংকেতও কোন ঘটনা বা অবস্থাকে অর্থবহ করে তোলে। 'সংকেত' দ্বারা কোন বস্তুর অবস্থান বা উপস্থিতিকে বোঝানো হয়। যেমন, ধোঁয়াকে আগুনের বা মেঘকে বৃষ্টির সংকেত বলে ভাবা হয়। লিখিত কোন পোস্টার, যেমন—'এখানে ধূমপান নিষেধ' বা তীরাকৃতি কোন চিহ্ন, অথবা কোন আলো, যেমন লাল বা সবুজ বাতি, অথবা কোন শব্দ যেমন গাড়ির হর্ণ বা কোন গন্ধ সংকেতের কাজ করে।

সংকেত ও প্রতীক এক জিনিস না হ'লেও উভয়ের মধ্যে সবসময় পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। কেননা, বস্তু বা ঘটনার বিশ্লেষণে এগুলি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে সংকেতের তুলনায় প্রতীক অনেক বেশী বিশ্লেষণাত্মক।

যে কোন প্রতীক কোন না কোন ধারণা (concept) বিজড়িত হয়ে অবস্থান করে। ফলে, ধারণার উপলব্ধি ব্যতীত প্রতীকের ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্ভব নয়। সামাজিক মেলামেশা বা অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত প্রতীকের ব্যবহার করি তার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে প্রতীক অর্থহীন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'কুকুর' শব্দটি যদি কোন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তখন তার অর্থ পাল্টে যায়। আবার বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গির (Gesture) কি মানে হতে পারে তা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বুঝে নিতে হয়। মুষ্টিবদ্ধ হাত যেমন একতার প্রতীক, তেমনি শারীরিক দক্ষতা বা আস্ফালনের প্রকাশেও ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের প্রতীক ছাড়াও বিমূর্ত প্রতীকের ব্যবহার সমাজে গুরুত্বপর্ণ। যেমন, জাতীয় পতাকা ও তাতে ব্যবহৃত চিহ্ন বা রঙগুলির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক অর্থে থাকে, যা জাতীয় আর্শের প্রতিফলন ঘটায়। সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় এই ধরনের প্রতীককে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক জর্জ হারবার্ট মিড (G. H. Mead) মনে করেন যে, মানুষ সামাজিক জীব, কেননা অন্যের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সে অর্থপূর্ণ প্রতীকের ব্যবহার করে। প্রতীকের ব্যবহার মানুষ শুধু কিছু ব্যস্ত বা ঘটনাকে বোঝাতেই করে না; প্রতীক আমাদের কিছু ক্রিয়ার (action) প্রতিও ইঙ্গিত করে। যেমন 'চেয়ার' শব্দটির সাথে বসা বা আসন গ্রহণের ক্রিয়া সম্পর্কিত। এইভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে প্রতীক সামাজিক ক্রিয়া ও আদান-প্রদানকে সম্ভব করে তোলে। তুলনামূলকভাবে সংকেতগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বব্যাখ্যাত হয় বলে তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতার সূত্রপাত ঘটে না। যেমন, তীরচিহ্ন আঁকা কোন সংকেত বা রাস্তায় ট্রাফিক সিগ্‌ন্যাল-এর অর্থ জানা থাকলে তাদের বিশ্লেষণ সহজসাধ্য হয়। তবে যে যে ক্ষেত্রে আমরা সংকেতকে প্রতীকের মতো ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে সংকেতও প্রতীকের মতো ব্যাখ্যার দাবী করে।

সমাজে প্রতীক ও সংকেতের ভূমিকাকে আমরা দুই দিক থেকে আলোচনা করতে পারি ঃ

(ক) সাাজিক আদান-প্রদান বা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রতীক ও সংকেত; এবং

(খ) সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক একতার উপস্থাপক হিসেবে প্রতীক ও সংকেত।

(গ) প্রতিটি সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং বেশিরভাগ সামাজিক ক্রিয়াকে সম্ভব করে তোলে প্রতীক ও সংকেত। প্রতীক ও সংকেত প্রেরণ তথা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক আদান-প্রদান সম্ভব হয়ে ওঠে। সমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতীকের মধ্যে ভাষার গুরুত্ব যথেষ্ট। কথ্য ও লিখিত ভাষাবিহীন ভাব-বিনিময় প্রায় সম্ভব নয় আমরা বিশেষ বিশেষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ ভাষার ব্যবহার করি। শুধু তাই নয়, ভাষা প্রকাশের সময় অঙ্গভঙ্গি বা কণ্ঠস্বরের তারতম্যের ফলে ভাষার অর্থেরও যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। এমনকি মুখমণ্ডলের স্বরূপও আমাদের মানসিক ভাবাবেগকে প্রকট করে তোলে। যেমন, হাসিযুক্ত বা সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশিত কোন ভাষাকে সমর্থক বলে সাধারণত ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য ভাষা প্রকাশের পশ্চাদপট বা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও বিশ্লেষণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে অবশ্য এই ধরনের জটিলতার অবকাশ থাকে না। যদি না ভাষা সাঙ্কেতিকভাবে লেখা হয়। মনের ভাব প্রকাশ ছাড়াও ভাষা ধারণা গঠনে সহায়তা করে। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার নামকরণের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। যেমন, জল বা বায়ু শুধুমাত্র দু'টি শব্দ নয়; এগুলি অর্থবহ শব্দ বা বিশেষ দু'টি বস্তু বা দ্রব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। এভাবে ভাষার সহাতায় আমরা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করি এবং মানবজীবনকে সম্ভবপর করে তুলি।

(ঘ) সামাজিক আদান-প্রদান ছাড়াও প্রতীক ও সংকেত সমাজের বিমূর্ত, মানসিক, নৈতিক ও যৌথ দিকগুলিকে জীবন্ত, বাস্তব ও দৃশ্যমান করে তোলে। যেমন, কোন জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, ব্রিটেনের রাজমুকুট বা আমেরিকার সংবিধান, কোন বিশেষ পশু বা গাছ, কোন বেশভূষা ইত্যাদি জাতীয় বা নৃকুল গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই ধরনের প্রতীকগুলি যূথবদ্ধতার

চেতনা ও গোষ্ঠীর একতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়শই প্রতীক বা সংকেতের সহায়তায় (যেমন, কুশপুত্তলিকা দাহ বা বিশেষ স্লোগানের ব্যবহার) তাদের আন্দোলনকে সংগঠিত করে। একইভাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গৌণ গোষ্ঠী, পুলিশ ও প্রশাসন, অপরাধী বা উগ্রবাদী সংগঠন প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের কার্যনির্বাহ করে। এমনকি প্রতিটি পরিবারে দৈনন্দিন কাজকর্মে বা আচার-অনুষ্ঠানে প্রতীকের ব্যবহার ঘটে। আধুনিক পরিবারে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করা হয়। আবার কোন পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে বা উপহার-বিনিময়কে সংহতি প্রকাশের (এর উল্টোটা সামাজিক দূরত্বের) নিদর্শন বলে চিহ্নিত হয়।

সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা ও ভূমিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রতীক ও সংকেতর গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আমাদের বেশভূষা ও অন্যান্য পরিধেয় সামগ্রী, গোষ্ঠী সদস্যপদ, জীবন-যাপন পদ্ধতি, গৃহসজ্জা ভাষাগত দক্ষতা ইত্যাদি সব কিছুই সামাজিক অবস্থান বা দূরত্বকে অনেকাংশে নির্ণয় করে। প্রতীক ও সংকেতর মধ্য দিয়ে আমাদের আচরণ মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রতীক ও সংকেত আমাদের মূল্যবোধ ও মানসিকতার উপস্থাপনা করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, প্রতীক ও সংকেত সামাজিক অংশগ্রহণকে বাস্তবিক করে তোলে এবং ব্যক্তির সাথে গোষ্ঠীর তথা গোষ্ঠীর সাথে সমাজের সম্পর্ককে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯.৬ ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞান

সংস্কৃতি গঠনে ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞানের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞান আমাদের নীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও মনোভাবের প্রকৃতিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। যে কোন সমাজ ও তার অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনাকে পথনির্দেশ করে ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞান।

'ভাবাদর্শ' বলতে ব্যাপক অর্থে কিছু চিন্তা-ভাবনা বা ধারণার সমষ্টিকে বোঝানো হয় যা কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থনযোগ্য বলে ব্যাখ্যা করে। ভাবাদর্শের সহায়তায় মানবজীবনের ইপ্সিত ক্রিয়া বা ফল সম্পর্কে ধারণা গঠন সম্ভব। এই কারণেই ভাবাদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও নীতিগুলিকে প্রভাবিত করে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ণয়ে ভাবাদর্শ আমাদের পরিচালিত করে। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেবার (Max Weber) দেখিয়েছেন যে, অর্থনীতি যেমন ভাবাদর্শকে প্রভাবিত করে তেমনি কোন কোন ভাবাদর্শ ও নীতিবিজ্ঞানও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে এবং কোন কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্ক্সীয় দর্শনে ভাবাদর্শকে শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করার একটি হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মার্ক্স (Karl Marx) মনে করতেন যে, একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শ 'ভ্রান্ত চেতনার' (False consciousness) উপস্থাপন করলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে যখন এই ভাবাদর্শ পরিচালিত হয়, তখন তা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। তখন এটি সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতির একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবাদর্শের ভূমিকা যথেষ্ট সক্রিয় এবং সমাজগঠনে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সংস্কৃতিকে যদি আমরা আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের মানদণ্ড বলে গণ্য করি, তাহলে ভাবাদর্শ হবে সেই ক্রিয়াকাণ্ডের দর্শন।

মূল্যবোধ বা ভাবাদর্শের তুলনায় বিজ্ঞান অনেক বেশি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট জ্ঞানের সন্ধান দেয়। বিজ্ঞান হ'ল কোন একটি বিষয় সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানভাণ্ডার। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

বিষয়সমূহের শৃঙ্খলিত জ্ঞানই হ'ল বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেও আমরা মানবসংস্কৃতির একটি উপাদান হিসেবে গণ্য করব কেননা আমাদের জীবনশৈলী ও জীবন-জিজ্ঞাসার বিভিন্ন দিককে এই জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণার হাত ধরে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক জীবন গতিশীল হয়ে ওঠে। সমাজজীবন থেকে সুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে দূর করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গুরুত্ব অত্যধিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পরিবার নিয়ন্ত্রণ, বিবাহের বয়স, লিঙ্গ ভেদে, জাতি, সম্প্রদায়গত বা ধর্মীয় গোঁড়ামি, খাবার-দাবারের বাধা-নিষেধ, অবসর জীবনযাপন, ফ্যাশান ইত্যাদি সব কিছুই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের সংস্কৃতির যে দিকগুলি যুক্তিপূর্ণ ও স্বতঃসিদ্ধ নয়, বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সেখানেই অনুভব করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে আজ সারা পৃথিবী একটি 'বিশ্বব্যাপী গ্রামে' (Global Village) পরিণত হয়েছে। গ্রাম ও শহরের ধারাবাহিকতা (Continuum), কৃষি উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি এবং বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমের প্রসার আধুনিক মানবসংস্কৃতিকে 'আধুনিক' করে তুলেছে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপব্যবহার মানবসংস্কৃতিতে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তথাপি বিজ্ঞানকে মানব-সভ্যতার একটি প্রধান অবদান বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তথা পরিব্যাপ্তিকে সম্ভব করে তুলেছে।

৯.৭ সারাংশ

বিভিন্ন বস্তুগত ও অ-বস্তুগত উপাদানের সংমিশ্রণে সংস্কৃতি গঠিত হয়। বস্তুগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে যাবতীয় কারিগরী, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং মানবসৃষ্ট অন্যান্য বস্তু। সংস্কৃতির মানসিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস, মনোভাব নীতি, মূল্যবোধ প্রতীক, আদর্শ, ধারণা প্রভৃতি।

যখন কোন মত, ঘটনা বা বস্তুকে সত্য বলে মনে করি তখন তাকে বলা হয় বিশ্বাস। আবার ব্যক্তির বিশ্বাস বা জ্ঞান থেকে যে ধারণা জন্মায়, তাকে মনোভাব বলে আখ্যা দেওয়া হয়। পশুসমাজের সঙ্গে মানবসমাজের পার্থক্য নির্দেশক নিরিখ হ'ল নীতি ও মূল্যবোধ। নীতি বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অনুসরণযোগ্য কিছু নিয়মকানুনকে বোঝানো হয়। সামাজিক নীতি মানুষের আচরণের যে মানদণ্ড স্থির করে দেয় তাকেই বলা হয় মূল্যবোধ। মূল্যবোধও কিছু ঔচিত্যবোধক বা প্রত্যাশিত আচরণবিধি নির্দেশ করে। মানবসংস্কৃতি আর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক উপাদান হ'ল প্রতীক ও সংকেত। 'প্রতীক' বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যা অন্য কোন বস্তু, ধারণা বা বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে 'সংকেত' কোন বস্তুর অবস্থান বা অবস্থিতিকে বোঝায়। সংস্কৃতির গঠনে ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞানের ভূমিকা ও গুরুত্বপূর্ণ। ভাবাদর্শ বলতে ব্যাপক অর্থে কিছু চিন্তাভাবনা বা ধারণার সমষ্টিকে বোঝানো হয় যা কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থনযোগ্য বলে ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে মূল্যবোধ ভাবাদর্শের তুলনায় বিজ্ঞান অনেক বেশী স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট জ্ঞানের সন্দান দেয়। বিজ্ঞান হ'ল কোনও একটি বিষয় সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানভাণ্ডার।

৯.৮ অনুশীলনী

১. সংস্কৃতির উপাদান বলতে কি বোঝেন? সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে বিশ্বাস ও মনোভাবের গুরুত্ব পর্যালোচনা করুন।

২. মানবসংস্কৃতিতে নীতি ও মূল্যবোধের অবস্থান নির্ণয় করুন।
৩. প্রতীক ও সংকেত কিভাবে সংস্কৃতিকে অর্থবহ করে তোলে তা উদাহরণসহ দেখান।
৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   (ক) সংস্কৃতির বস্তুগত ও মানসিক উপাদানগুলি কেন এবং কিভাবে পরস্পর নির্ভরশীল?
   (খ) মনোভাব কিভাবে গড়ে ওঠে তা দেখান।
   (গ) নীতি ও মূল্যবোধের মধ্যেকার সম্পর্ক কি ধরনের?
   (ঘ) সমাজে ভাবাদর্শ বা বিজ্ঞানের ভূমিকা নির্ণয় করুন।
৫. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   (ক) প্রতীক কি?
   (খ) মূল্যবোধের প্রয়োজন কি?
   (গ) বিজ্ঞান কেন একটি সাংস্কৃতিক উপাদান?
   (ঘ) মনোভাব ও আগ্রহ কিভাবে পৃথক?
   (ঙ) মনোভাব কেন একটি সামাজিক বিষয়?

৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) অনাদি কুমার মহাপাত্র ঃ বিষয় ঃ সমাজতত্ত্ব
(২) অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব
(৩) পরিমল কর ঃ সমাজতত্ত্ব
(৪) Guy Rocher : A General Introduction to Sociology—A Theoretical Perspective
(৫) H. M. Johnson : Sociology.

একক ১০ □ সামাজিকীকরণ

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য
১০.১ প্রস্তাবনা
১০.২ সামাজিকীকরণ কি?
১০.২.১ সামাজিকীকরণের প্রকার
১০.৩ সামাজিকীকরণের ভূমিকা ও গু(ত্ব
১০.৪ সামাজিকীকরণের পদ্ধতি বা প্রক্রি(য়া
১০.৪.১ শিশুর প্রাথমিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর
১০.৪.২ শিশুবিকাশ সংক্র(ান্ত কিছু তত্ত্ব
১০.৪.৩ ফ্রয়েডের মনঃসমী(া
১০.৪.৪ মিড-এর তত্ত্ব
১০.৪.৫ পিয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব
১০.৪.৬ তত্ত্বগুলির মূল্যায়ন
১০.৫ সামাজিকীকরণের মাধ্যম
১০.৫.১ পরিবার
১০.৫.২ সঙ্গী-গোষ্ঠী
১০.৫.৩ শি(া-প্রতিষ্ঠান
১০.৫.৪ গণপ্রচার মাধ্যম
১০.৫.৫ অন্যান্য মাধ্যম
১০.৬ সামাজিকীকরণের পরিবর্তিত ধরন
১০.৭ সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতি ও সমাজ-কাঠামো
১০.৮ সারাংশ
১০.৯ অনুশীলনী
১০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কিভাবে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানবশিশু সমাজের সচেতন সদস্য হয়ে ওঠে?
- সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্য কি?
- সামাজিকীকরণের প্রকৃতি কি?

১০.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা সামাজিকীকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব। এখানে সামাজিকীকরণের তত্ত্ব ও ধারা নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং সামাজিকীকরণের ভূমিকা ও লক্ষ্য নিয়েও আলোচনা করা হবে। সচেতন এবং অবচেতনভাব সামাজিকীকরণ, ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ, পূর্বাভাসের ভিত্তিতে সামাজিকীকরণ এবং পুনঃসামাজিকীকরণ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই এককে সামাজিকীকরণের প্রকৃতির এক গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১০.২ সামাজিকীকরণ কি?

সামাজিকীকরণ হ'ল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তি সামাজিক জীবে পরিণত হয়। মানুষ সামাজিক হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে না। এবং জন্ম অবস্থায় তার সাথে পশুজগতের বিশেষ পার্থক্য সূচিত হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় পশুজগতের মতোই নিজস্ব কিছু জৈবিক প্রয়োজন দ্বারা মানবশিশু পরিচালিত হয়। শুধু তাই নয়, ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় চার-পাঁচ বছর পর পর্যন্ত মানবশিশু বড়দের সাহচর্য ও সান্নিধ্য ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য প্রাণীর শৈশবাবস্থা এতোটা স্থায়ী হয় না। সুতরাং 'মানুষ' হিসেবে বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার জন্য মানবশিশুর চাই একটি সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ। শিশুর মানব প্রকৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

অতএব 'সামাজিকীকরণ' বলতে আমরা এমন এক পদ্ধতিকে বোঝাই যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানবের সামাজিক প্রকৃতির বিকাশ ঘটে। সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য হ'ল শিশুকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতে অনুপ্রবিষ্ট করানো, তাকে সমাজের ও বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর একজন অংশগ্রহণকারী সভ্যরূপে গড়ে তোলা এবং সমাজের আদর্শ ও মূল্যমান গ্রহণে প্রবৃত্ত করা। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-গোষ্ঠী এবং সমাজের অন্যদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এটি কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কখনো বা বিচার-বিবেচনা সম্মত ভাবে ঘটে থাকে।

১০.২.১ সামাজিকীকরণের প্রকার

সামাজিকীকরণকে অবশ্য এক ধরনের 'নিষ্ক্রিয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম' বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। শিশু তার সংস্পর্শে আসা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়কে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে না। শিশুর কৌতূহল ও আত্মপ্রচেষ্টা ছাড় সামাজিকীকরণ সম্ভব নয়। এ ছাড়াও, প্রত্যেক শিশুর এমন কিছু প্রয়োজন বা চাহিদা থাকে যা তার পিতা-মাতা ব অন্য তত্ত্বাবধায়কদের আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশু লালন-পালনের অভিজ্ঞতাকেও এক ধরনের 'শিক্ষা' বলে অভিহিত করা হয়।

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণও অভিজ্ঞত সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অবশ্য শৈশবকালে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি তা অনেক প্রগাঢ় ও দীর্ঘস্থা হয়। শিশু সামাজিকীকরণের (Child Socialization) প্রক্রিয়াকে তাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। শি সামাজিকীকরণের তুলনায় প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিকীকরণ (Adult Socialization) সহজ হয়। নিম্নলিখি কারণগুলি এর জন্য দায়ী ঃ

প্রথমত, বয়স্করা সাধারণত কোন পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে কাজ করতে উদ্যত হয়।

দ্বিতীয়ত, বয়স্কদের কর্মজীবনে যে নতুন নতুন ভূমিকা (Role) গ্রহণ এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মকানুন/আচরণ আয়ত্ত করতে হয়, সেগুলি তার কাছে সম্পূর্ণ অজানা থাকে না। কেননা, ছোটবেলা থেকেই আমরা কোন না কোন প্রত্যাশাকে লক্ষ্য করে শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হই। এই ধরনের প্রত্যাশামূলক সামাজিকীকরণ (Anticipatory Socialization) বয়স্ক সামাজিকীকরণকে সহজ করে তোলে।

তৃতীয়ত, লিখিত বা কথ্য ভাষার উপর দখল প্রাপ্তবয়স্কদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফলে, যে কোন জ্ঞান বা অভিভাবনের (suggestion) আদান-প্রদান এদের ক্ষেত্রে সহজ হয়। সর্বোপরি, বয়স্কদের পূর্ব-সঞ্চিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নতুন কিছু আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

উপরোক্ত সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও, প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিকীকরণ অনেক সময় যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলে পরিগণিত হয়। বিশেষ করে জটিল কোন দক্ষতা অর্জন বা যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ, অথবা এমন কোন নিয়ম-নীতি আয়ত্ত করা যা পূর্বেকার সমস্ত শিক্ষার বিপরীত—এই সমস্ত ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ মোটেও সহজ ব্যাপার নয়। পরিণত বা বৃদ্ধ বয়সে সবকিছু মেনে নেওয়া সবার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সমাজতত্ত্বে তাই পুনঃসামাজিকীকরণের (Resocialization) সমস্যাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। পুনঃসামাজিকীকরণ বলতে এক ধরনের 'ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনকে' বোঝায় যা দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তার পূর্ব প্রতিষ্ঠিত মানসিকতা, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটায় এবং নতুন আচরণ-পদ্ধতি বা মূল্যবোধ গ্রহণ করে। অধ্যাপক এন্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens)-এর ভাষায়, "Resocialization is a pattern of personality change whereby a mature individual adopts modes of behaviour distinct from those he or she previously accepted"। কারাগার, মানসিক হাসপাতাল, বা ব্যারাকের মতো কোন 'অবরুদ্ধ সংগঠনে' (carceral organization) যখন ব্যক্তি প্রবেশ করে তখন তার পুনঃসামাজিকীকরণ হয়। এই ধরনের সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বে যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে তা চিরাচরিত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রায় সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনাম যুদ্ধে পাঠানো সেই সব আমেরিকান সৈনিকদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় যারা একটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত চাপের মধ্যে পড়ে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং রূঢ় তথা পাশবিক আচরণে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর শান্তির পরিবেশ তাদের কাছে বেমানান হয়ে দাঁড়ায়।

১০.৩ সামাজিকীকরণের ভূমিকা ও গুরুত্ব

মানুষ যেহেতু 'সামাজিক' হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, অতএব তাকে সমাজে বসবাসের মধ্য দিয়েই সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি আয়ত্ত করে নিতে হয়। সামাজিকীকরণের এই প্রক্রিয়া ছাড়া শিশুর সামাজিক বিকাশ সম্ভবপর নয়। ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়ের জন্যই তার সামাজিকীকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের দিক থেকে বিচার করলে সামাজিকীকরণ হ'ল এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করে এবং যৌথ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তোলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ-শৃঙ্খলা (Social order) প্রতিষ্ঠা করার একটি অন্যতম মাধ্যম হ'ল সামাজিকীকরণ। রচার (Guy Rocher) মনে করেন যে, সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের কাজকর্ম, চিন্তা ও অনুভূতিতে পর্যাপ্ত ঐক্যমত সৃষ্টি করা সামাজিকীকরণের একটি স্বাভাবিক পরিণতি ('The normal result of socialization–from the sociological point of view is to produce sufficient conformity in ways of acting, thinking and feeling among each members of a collectivity')। আবার ব্যক্তিগত মানদণ্ডে এটি হ'ল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে সুপ্ত গুণাবলী পরিস্ফুটিত ও বাস্তবায়িত করার একটি উপায়। অর্থাৎ, সামাজিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণ (individualization) প্রক্রিয়াও

চলতে থাকে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে শিশু একদিকে যেমন সমাজ সচেতন হয়, তেমনি অন্যদিকে নিজস্ব ব্যক্তিত্বও গড়ে তোলে। শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে এই দু'টি প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। একদিকে শিশু যেমন সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হয়, তেমনি অন্যদিকে নিজের মতামত প্রকাশ করা বা নিজের স্বার্থরক্ষা করা এবং অন্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের দাবি আদায় করার জন্য সচেষ্ট হয়। সুতরাং, যে সামাজিক সম্পর্ক শিশুকে সমাজ-সচেতন করে তোলে, সেই সামাজিক সম্পর্কই তাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী করে। সামাজিকীকরণ তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিরোধী কোন প্রক্রিয়া নয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক এন্থনি গিডেন্স বলেন যে, আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উৎসও হ'ল সামাজিকীকরণ ('Yet socialization is also at the origin of our very individuality and freedoms.')।

সংস্কৃতির সঞ্চালক ও ব্যক্তিত্বের উন্মেষক হিসেবে সামাজিকীকরণের গুরুত্ব আছে বলেই সমাজ ও সময় ভেদে মানুষ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এসেছে। সামাজিকীকরণের যদি না থাকতো তাহলে মানবসমাজ এক পুরুষের বেশি স্থায়ী হত না। কেননা একমাত্র সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়েই মানবশিশুর বংশলব্ধ গুণ বিকশিত হতে পারে। সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্য পরিবেশে যে সব মানবশিশু লালিত-পালিত হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের মনুষ্যোচিত পরিচয় তথা ব্যক্তিত্বের বিকাশ যথাযথ ভাবে ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু বন্য পরিবেশে লালিত শিশুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি।

১৯২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় নেকড়ের গুহা থেকে একটি দু'বছরের এবং একটি আট বছরের বালিকাকে উদ্ধার করা হয়। ওদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে 'অমলা ও কমলা'। উদ্ধার পাবার অল্প কিছুদিন পর অমলা মারা যায়। কিছু কমলা কিছু বছর জীবিত ছিল। ওদের কারোর মধ্যেই মানবচরিত্রের কোন গুণই বিকশিত হয়নি। উভয়েই নেকড়ের মতো ডাকত, কাঁচা-মাংস খেতে চাইত, দু'হাত দু'পায়ে ভর দিয়ে নেকড়ের মতো হাঁটত এবং মানুষ দেখলে ভয় পেত।

একই ভাবে 'বায়ুকে' লখনউ এর কাছে নারায়ণপুর গ্রামে নেকড়ের অন্য তিনটি বাচ্চার সাথে পাওয়া যায়। ছেলেটির আচার-ব্যবহার নেকড়ের বাচ্চাগুলোর মতোই প্রায় ছিল। তাকে সামাজিকীকৃত করার বিভিন্ন প্রয়াস তেমন সাফল্য লাভ করেনি। হিংস্র স্বভাব ও পশুসুলভ আচরণ সে সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেনি। ক্রমশ সে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায়।

'ক্যাসপার হসারের' (Kaspar Hauser)-এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিউরেমবর্গের জঙ্গলে লালিত পালিত হয়েছিল বলে তার চলাফেরা ও মানসিক গঠন শিশুতুল্য থেকে যায়। ভালো করে সে জানা রপ্ত করতে পারেনি। চেতন ও জড় পদার্থের মধ্যে সে পার্থক্য করতে পারত না যদিও ডাক্তারি পরীক্ষায় তার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে নি। 'জন্তু' থেকে তাকে 'মানুষে' পরিণত করার প্রচেষ্টায় কিছু ফল পাওয়া গেলেও ভাষা রপ্ত করার ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সে যথেষ্ট পিছিয়ে থাকে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সামাজিক পরিবেশে বসবাসের মধ্য দিয়ে ভাষা, সামাজিক আদবকায়দা, মূল্যবোধ, নীতি ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ না করলে আমাদের পক্ষে সমাজের উপযোগী হওয়া, এমনকি 'মানুষ' হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করাও সম্ভব নয়। সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়েই মনুষ্য সমাজের এখানেই বড় পার্থক্য। সংস্কৃতির এই সঞ্চালন যদি সম্ভব না হ'ত, তাহলে আমাদের কাছে প্রগতি, উন্নতি বা অগ্রগতি নামক শব্দগুলিরও কোন মানে থাকত না। অতএব, সামাজিকীকরণ ছাড়া ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান একেবারেই সম্ভব নয়।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সামাজিকীকরণের ভূমিকার কথা সমাজতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করে নিলেও বংশগতিকে

পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ, সহজাত প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধি-নৈপুণ্য, দোষ-গুণ ইত্যাদি সব কিছুর সংমিশ্রণেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। রক্তের সম্পর্ক সূত্রে ব্যক্তি যে মানসিক ও দৈহিক গুণাগুণ লাভ করে—বা যাকে আমরা বংশগতি বলে আখ্যা দিই—সেই উপাদানগুলিও নিঃসন্দেহে ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। শিশুর অভিব্যক্তি (Reflexes), সহজাত প্রবৃত্তি, জেদ (urges), ক্ষমতা ইত্যাদি অনেক সময়েই বংশগতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এইসব বৈশিষ্ট্য শিশুর সামাজিকীকরণকেও প্রভাবিত করে। অতএব বংশগতি ও পরিবেশজনিত উপাদানের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে এর কোনটিই উপেক্ষিত নয়। আমাদের জীবনের সম্ভাবনাসমূহ আংশিকভাবে হ'লেও বংশগতি দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং কার্যক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাসমূহ একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়।

১০.৪ সামাজিকীকরণের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া

সামাজিকীকরণ যেহেতু ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে, সেহেতু একে এমন কোন 'একক প্রণালী' বলে আখ্যা দেওয়া যায় না যা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিটি স্তরেই সমাজভাবে কাজ করে। পক্ষান্তরে, এটি একাধিক প্রণালীর সমবায়। সামাজিকীকরণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ শিশুকে একবারেই সবকিছু শিখিয়ে দেন না। আমাদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিক্ষা প্রয়োজন। স্বভাবতই শিশুর জন্ম থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিকীকরণের পদ্ধতি পরিচালিত হয়। আমাদের সামাজিকীকরণের সে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি যুগবৎ ক্রিয়া করে সেগুলি হ'ল —অনুকরণ, অনুসরণ, অভিভাবন, ভাষা আয়ত্তীকরণ, অনুশীলন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, মূল্যমান গ্রহণ, উপযোজন, বাস্তবতাবোধের বিকাশ, নিজের ও অন্যের সম্পর্কে ধারণার বিকাশ প্রয়োজনীয় কাজ, কর্মশিক্ষা ও জীবনে বিভিন্ন ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি। এই প্রণালীগুলির মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধ বা অসামঞ্জস্যতা থাকলেও, এগুলি সামগ্রিকভাবে পরস্পরের পরিপূরক। ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মধ্যে যদি অসঙ্গতি বা বিরোধিতার সৃষ্টি হয় তাহলে সেগুলিকে দূর করে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানকে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে ব্যবহার করা মধ্যেই সামাজিকীকরণের সার্থকতা নির্ভর করে। সামাজিকীকরণের বিভিন্ন প্রণালীগুলির একটি পুঞ্জীভূত চরিত্র (cumulative character) রয়েছে এবং আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ও অভিজতার সংমিশ্রণেই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়। সামাজিকীকরণের প্রধান প্রধান প্রণালীগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য আমরা এখন প্রথমত শিশুর প্রাথমিক বিকাশের স্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপর শিশুবিকাশের কিছু তত্ত্ব পর্যালোচনা করব।

১০.৪.১ শিশুর প্রাথমিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর

(ক) ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ ঃ প্রতিটি মানবশিশুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষমতা নিয়ে সাধারণত জন্মগ্রহণ করে। শিশু আচরণের বেশিরভাগ ছাত্রের কাছে আজ এটা স্পষ্ট যে সদ্যোজাত শিশুও বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া করে। স্পর্শকাতরতা ও উষ্ণতার আনন্দ শিশু জন্মের পর থেকেই অনুভব করতে পারে। জন্মের প্রথম সপ্তাহের পর থেকেই শিশুর মুখের গঠন একটি বিশেষ আকৃতি নিয়ে নেয়, এবং এক মাস বয়সের পর থেকে তার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শিশুর এই ইন্দ্রিয় শক্তিগুলির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক পরিবেশ। শ্রবণ, দৃষ্টি বা স্পর্শতার অনুভূতি সামাজিকীকরণে দায়িত্বে থাকা লোকদের সংস্পর্শেই সম্ভব হতে পারে। পরবর্তী সময়ে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

(খ) কান্না ও হাসির সামাজিক ব্যাখ্যা : বাচ্চারা যেমন পছন্দমতো পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী প্রতিক্রিয়া করে

তেমনি বড়রাও বাচ্চার আচরণকে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের কারণ ভেবে পার্থক্য করে নেয়। যেমন কান্নাকে খিদে পাওয়া বা অস্বাচ্ছন্দ্যের নির্দেশক বলে এবং হাসি বা ঐ ধরনের অভিব্যক্তিকে পরিতৃপ্তির লক্ষণ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ফলে, শিশুর কান্না বা হাসির মতো অভিব্যক্তিগুলি সামাজিক ক্রিয়া (Social action) বলে চিহ্নিত হয়। সংস্কৃতিগত পার্থক্য অবশ্য এই ধরনের ব্যাখ্যার ধরনকে অনেক সময়ই নির্দেশ করে। স্বাভাবিকভাবে কান্না-হাসির মতো জন্মলব্ধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে এবং শিশু বড়দের কাছ থেকে কখন, কি পরিস্থিতিতে হাসতে বা কাঁদতে হবে— সেই শিক্ষা লাভ করে। এই ভাবেই সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আমাদের অনেক সহজাত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) মা, শিশু ও সমাজ ঃ শৈশবাবস্থায় শিশুর মানসিক তথা শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে মা'র ভূমিকা খুবই প্রবল থাকে। তিন মাস বয়স থেকেই একটি শিশু তার মাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে চিনতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে সাত-আট মাস বয়সের পূর্বে মা'র প্রতি শিশুর আসক্তি তেমন গাঢ় হয় না। কেননা ঐ সময়ের মধ্যে শিশুর সাথে মা'র বিচ্ছেদ ঘটলে এবং অন্য তত্ত্বাবধায়করা শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করলে শিশু তেমন প্রতিবাদ করে ওঠে না। কিন্তু তার পর থেকে শিশু মা'কে এবং ধীরে ধীরে বাবা বা অন্যদেরও স্পষ্টভাবে চিনতে শুরু করে। মানবজীবনের এই প্রারম্ভিক দিনগুলি শিশু এবং তত্ত্বাবধায়ক—উভয়ের কাছেই শিক্ষাবহ ও অভিজ্ঞতাসূচক। এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু গবেষণার উল্লেখ করতে পারি যাতে দেখা যায় যে পিতৃমাতৃ স্নেহ বর্জিত সন্তানদের কিছু দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রায় তিন দশক পূর্বে মনোবিদ্ জন বাওলবি (John Bowlby) দেখান যে, শৈশবে মার স্নেহ-ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা থেকে যদি শিশু বঞ্চিত হয় তাহলে পরিণত বয়সে তাকে গুরুতর মানসিক উত্তেজনা বা ব্যক্তিত্বের অন্যান্য সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়। বাওলবির এই তত্ত্বটি 'মাতৃ বঞ্চনার তত্ত্ব' (Theory of Maternal Deprivation) বলে আখ্যায়িত হয়।

বাওলবির সিদ্ধান্তকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হ্যারি হারলো (Harry Harlow) উত্তর ভারতের কিছু ক্ষুদ্র প্রজাতির বানরকে মাতৃস্নেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে গবেষণা চালান। এই গবেষণায়ও দেখা যায় যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবনে নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ কিছু বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। নিঃসঙ্গ ঐ বানরগুলি পরিণত বয়সে অন্যান্য স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা বানরকে ভয় পেত এবং বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন-পছন্দ করত। হারলো অবশ্য আরো লক্ষ্য করেন যে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েও যদি কোন বানর সমবয়সীদের সাথে বেড়ে ওঠে, তাহলে পরিণত বয়সে তার আচরণগত দুর্বলতা থাকে না। হারলোর এই সিদ্ধান্ত মানবশিশুর ক্ষেত্রে কতোটা প্রয়োজন তা বলা কষ্টকর। তথাপি প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, সুপ্রতিষ্ঠিত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিহীন ভাবে বেড়ে ওঠা শিশুদের বৌদ্ধিক ও ভাষাগত বিকাশ যথাযথভাবে ঘটে না এবং অন্যদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনেও তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মানবসংস্কৃতির অনুকরণ ও অনুসরণ অমলা-কমলা বা রামুর মতো অ-সামাজিকীকৃত সন্তানদের ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নি। মাতৃ-বঞ্চনার শব্দটি এক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হলেও নিবিড় বন্ধনহীনভাবে মানবশিশু সামাজিক হয়ে উঠতে পারে না—একথা বলা যেতে পারে। সামাজিকীকরণের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি প্রতিটি সংস্কৃতিক সমস্ত মানুষের সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

১০.৪.২ শিশুবিকাশ সংক্রান্ত কিছু তত্ত্ব

শিশুবিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তির বিকাশ সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিকদের মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সমাজতত্ত্বে একটি অতি আলোচিত বিষয় এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস হয়েছে। ব্যক্তির যে সমস্ত অন্তর্নিহিত উপাদান তার ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করে, তাকেই অধ্যাপক জনসন (Johnson) ব্যক্তিসত্তা বলে অভিহিত করেছেন (The self might be regarded as the internalized

object representing one's own personality)। ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা, ব্যক্তির মান-অপমান তথা আত্মসম্মানের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তখনই সম্ভব যখন অপরাপর মানুষ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা জন্মায়। নিজেকে অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক করে না নিতে পারলে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা জন্মাতে পারে না। ব্যক্তিসত্তা বিকাশের এই দু'টি প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশ কিভাবে ঘটে? আমরা এই প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান বক্তব্যের পর্যালোচনা করব। শিশুবিকাশ সম্বন্ধীয় এই তত্ত্বগুলি সামাজিকীকরণের বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় বক্তব্যের বিভিন্নতা প্রকট হয়ে পড়েছে। তথাপি, এদের সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে শিশুবিকাশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব।

১০.৪.৩ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা

মানব আচরণ সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় ভিয়েনাবাসী বিখ্যাত মনোচিকিৎসক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের নাম উল্লেখ করতেই হয়। ফ্রয়েডের চিন্তাভাবনা সমাজবিজ্ঞান থেকে শুরু করে কলা, সাহিত্য ও দর্শনকেও প্রভাবিত করেছে। 'মনঃসমীক্ষা' নামক যে চিকিৎসা-পদ্ধতি তথা বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার তিনি করে গেছেন তাতে রুগীর পূর্বেকার জীবন এবং বিশেষ করে শৈশবাবস্থার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়। কেননা ফ্রয়েড মনে করতেন যে, আমাদের আচরণের অনেক কিছুই অচেতন (Unconscious) মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শৈশবাবস্থা থেকেই আমাদের যাবতীয় পুঞ্জীভূত কামনা-বাসনাগুলি অচেতনে এসে আশ্রয় নেয়। চেতন (Conscious) মনের চেয়েও এই অচেতন মন ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি ও গতি নির্ধারণে অনেক বেশি নির্ণায়ক।

ব্যক্তিসত্তা ক্রমবিকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেন বলেন যে, মানবশিশুকে শুরু থেকেই তার বিভিন্ন চাহিদা ও ইচ্ছাকে প্রতিনিয়ত অবদমন করে রাখতে হয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু যখন সমাজসম্মত আচার-আচরণের অনুশীলন করে তখন তাকে সামাজিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয় এবং বিভিন্ন কামনা-বাসনার নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হতে হয়। বিশেষ করে মানবশিশুর কামাসক্তির (Erotic) চাহিদা (ফ্রয়েডের মতে খাদ্য স্থান গ্রহণ করে। এখানে 'কামাসক্তি' বলতে শিশুর অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ ও আনন্দদায়ক দৈহিক সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অচেতন মনের প্রধান অধিবাসী হ'ল সেই সমস্ত কামনা-বাসনা বা প্রবৃত্তি যা প্রতিনিয়ত সমাজজীবনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই ধরনের অবদমন সৃষ্টি করে বিভিন্ন কমপ্লেক্স বা মানসিক জটিলতার যেমন, উচ্চতা বা হীনতাভাব যা আমাদের সচেতন আচরণকে পরিচালিত করে। ফ্রয়েড বিশেষ করে ইডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus complex)-এর গুরুত্বের কথা বলেছেন যা ছেলের মা'র প্রতি এবং মেয়ের বাবার প্রতি আকর্ষণ থেকে সৃষ্টি হয়। সামাজিক বাস্তবতাবোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির যে 'অহং' বা Ego-এর সৃষ্টি হয় তাকে ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করে চলতে হয়। এই ত্রিবিধ শক্তিগুলি হ'ল —সামাজিক বাস্তবতা, ইড্ (ID) বা অতৃপ্ত কামনা-বাসনা এবং অধিসত্তা (Super-Ego)। এদের যে কোন একটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেই দেখা দেয় মানসিক বিপর্যয়।

১০.৪.৪ মিড-এর তত্ত্ব

জর্জ হারবার্ট মিড মূলত একজন দার্শনিক হ'লেও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে যথেষ্ট ছাপ রেখে গেছেন। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া (Symbolic interaction) সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়াও শিশুবিকাশের স্তর এবং বিশেষ করে ব্যক্তিসত্তার উদ্ভব সংক্রান্ত আলোচনায় মিডের অবদান অনন্য। এক্ষেত্রে ফ্রয়েডের বক্তব্যের সাথে

তাঁর কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হ'লেও মানবব্যক্তিত্বের গঠনে মিড মানসিক উত্তেজনা, কামাসক্তি ও অচেতন মনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেন নি।

মিডের মতে মানববিকাশের প্রথম স্তরে খেলাধূলার স্তর বা (Play stage) শিশু তার চারপাশের অন্যদের আচরণকে অনুকরণ করতে করতেই সর্বপ্রথম সামাজিক সত্তার বিকাশ শুরু করে। যেমন, খেলাধূলার মধ্যে শিশুরা বড়দের মতো রান্না করে। এই ধরনের উদ্যোগকে মিড ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম সোপান বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

ধীরে ধীরে শিশু শুধুমাত্র সহজ অনুকরণ নয়, জটিল প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত হয় এবং অন্যের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়। মিড এই স্তরকে প্রতিযোগিতামূলক স্তর (Game stage) বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই স্তরে একটি চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাকে বড়দের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন, অন্যদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার সময় শিশু অভিভাবক বা শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মিড এই প্রক্রিয়াটিকে 'অন্যের ভূমিকা গ্রহণ' (Taking the role of others) বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, শিশুবিকাশের এই পর্যায়েই একমাত্র ব্যক্তিসত্তার ধারণা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হতে পারে। শিশু তখন তার পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হবার সাথে সাথে অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে বিচার করতে শেখে। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই স্তরে শিশু বৃহত্তর সমাজের সাথে সম্পর্কিত হয় এবং 'আমি I ও সমাজের চোখে আমি' (Me)—এই দু'টির মধ্যের পার্থক্য করতে শেখে। এখানে মিড্ 'I' বলতে অসামাজিকীকৃত শিশু এবং 'Me' বলতে শিশুর সামাজিক সত্তাকে বুঝিয়েছেন। এই ধরনের পার্থক্য করার ক্ষমতা বিকশিত হ'লেই শিশু আত্মসচেতন হয়েছে বলে মনে করা হয়।

শিশুবিকাশের তৃতীয় স্তরটি আট-নয় বছর থেকে শুরু হয় যখন শিশু সংগঠিত বা দলগত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শেখে। এই স্তরে শিশুসমাজ জীবনের মূল্যমান ও নৈতিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে। সংগঠিত প্রতিযোগিতার অংশ নিতে গিয়ে সাধারণত খেলার নিয়মকানুন, ন্যায়পরায়ণতা, সমতার ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে তার ধারণা জন্মায়। মিড মনে করেন যে, শিশু এই স্তরে 'Generalized Other' বা সমাজের সাধারণ মূল্যবোধ ও নৈতিক নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত হয়।

১০.৪.৫ পিয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব

সুইশ চিন্তাবিদ্ জাঁ পিয়াজে (Jean piaget)-এর জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বটি সমাজবিজ্ঞানে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। ফ্রয়েড বা মিড শিশুর আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন নি। কিন্তু পিয়াজে তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় শিশু ও কিশোরদের জীবন আচরণ পর্যবেক্ষণে কাটিয়ে দেন।

পিয়াজে শিশুর প্রকৃতি সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তন করেছেন। তিনি শিশুকে একই সঙ্গে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বলে বিবেচনা করেছেন। কেননা শিশু তার অন্তর্নিহিত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধান চালায় এবং নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। অর্থাৎ, শিশু তার পরিবেশ থেকে কৌতূহল শূন্য ভাবে সবকিছু গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে পিয়াজে শিশুর আত্মপ্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পিয়াজে মনে করেন যে, আমাদের বৌদ্ধিক বা জ্ঞানমূলক বিকাশের কয়েকটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হ'ল সংবেদন ও সঞ্চালনমূলক চিন্তনের স্তর (Sensorimotor stage) যা শিশুর জন্ম থেকে দু'বছর বয়স পর্যন্ত টিকে থাকে। এই সময় পর্যন্ত শিশুর চিন্তা মূলত তার সংবেদন সঞ্চালনমূলক ক্রিয়া যেমন, স্পর্শ, দৃষ্টি বা শব্দের অনুভূতি ইত্যাদির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এই স্তরের শেষ পর্যায়ে শিশু তার বহির্জগতের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি স্থায়ী ধারণা গঠন করে এবং তার দৃষ্টির বাইরেও কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরটি হ'ল প্রাক্-ক্রিয়াগত স্তর (Preoperational Stage) যা দুই থেকে সাত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই স্তরে ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বস্তু বা তার প্রতিচ্ছবিকে শিশু সাংকেতিক ভাবে উপস্থাপন করতে শেখে। যেমন চার বছরের কোন শিশু মোটরগাড়ীকে বোঝানোর জন্য সংকেতের (যেমন দ্রুতবেগে গমন এবং মোটর গাড়ির মতো শব্দের সৃষ্টি) ব্যবহার করতে পারে। অবশ্য শিশুর এই আপাত ধারণা বা ক্রিয়াগুলি প্রকৃত ধারণার মতো হয় না। পিয়াজে তাই 'প্রাক্ ক্রিয়াগত' স্তর শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই স্তরে শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক হয় কেননা বহির্বিশ্বের বস্তু/ঘটনাকে তারা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে চায়। বাস্তব সক্রিয়তার স্তরটি (Conerete operational stage) শিশুর জীবনে অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অর্থবহ। এই স্তরে সাত থেকে এগার বছরের শিশুরা বিমূর্ত ও যুক্তিপূর্ণ ধারণা গঠন করতে পারে। জটিল শ্রেণীকরণ ও সম্পর্কের প্রভেদ করতে পারে এবং সংখ্যাগত জটিলতা দূর করতে শেখে। এই ধরনের ক্ষমতা তাদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ভাষা উপলব্ধি ও ভাষা প্রকাশের উন্নত ক্ষমতার সহায়তায় শিশু তখন বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যেও সম্পর্ক করতে সমর্থ হয়।

সর্বশেষে, নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তরে (Formal operational stage) এগার থেকে চোদ্দ বছরের কোন শিশু ধারণাভিত্তিক কোন ব্যবহারিক কাজে সমর্থ হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে যুবকেরা জটিল বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা অর্জন করে। এই সময়ে সে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বাইরে যুক্তির প্রকৃতি বা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের চিন্তাশক্তিকে পরিচালিত করতে পারে। প্রকল্প (Hypothesis) গঠনের ক্ষমতা এই পর্যায়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১০.৪.৬ তত্ত্বগুলির মূল্যায়ন

শিশুবিকাশের তিনটি আলোচিত তত্ত্বের মধ্যে ফ্রয়েডের তত্ত্বটি সব চাইতে বিতর্কমূলক। শিশুর কামাসক্তির চাহিদা থাকে—এই যুক্তি অনেকেই মানতে রাজী নন। তাছাড়া অচেতন মনের প্রভাব সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ থাকতেই পারে। তুলনামূলকভাবে মিড ও পিয়াজের বক্তব্য অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তথাপি ফ্রয়েডের তত্ত্বকে আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারি না এবং এই তিনটি তত্ত্বের বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব।

প্রথমত, এই তিনজন সমাজবিজ্ঞানীই মনে করেন যে, শৈশবের প্রারম্ভিক দিনগুলিতে শিশু বস্তুজগত বা সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে এমনকি তার পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকে না। আমাদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পূর্বে শিক্ষা অনেকক্ষেত্রেই সচেতনভাবে হয় না। ফ্রয়েড এক্ষেত্রে যথার্থই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, শিশুবিকাশের এই প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষ করে পিতা-মাতার সম্পর্কের সাথে যুক্ত উদ্বেগ বা উত্তেজনাগুলি আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরবর্তী স্তরকে প্রভাবিত করে।

আত্মসচেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে মিড বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে প্রায় একমত যে একটি সামাজিক পরিবেশে অপরাপর মানুষের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। তবে আত্মসচেতন কোন শিশু যে আত্মকেন্দ্রিক (Ego centric) ধ্যান-ধারণা বজায় রাখে তা পিয়াজে দেখিয়েছেন। আমরা জানি যে, শিশু তার তত্ত্বাবধায়কদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের চাহিদা (যেমন মাকে বা বাবাকে চাই) বা পছন্দ (বিশেষ খেলনা বা খাবারের প্রতি) প্রকাশ করে। এই ধরনের 'আমি চাই', 'আমি করেছি', 'আমি বলেছি' থেকেই 'অহং' বোধের বিস্তার ঘটে। তবে পৃথক ব্যক্তিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক চাঞ্চল্য বা আবেগজনিত সমস্যাও যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা মিড বা পিয়াজে উল্লেখ করেননি। ফ্রয়েডের তত্ত্ব এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে এই তত্ত্বগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কিভাবে সামাজিক জীবে পরিণত হই, কিভাবে আমাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটে এবং সমাজে অন্যদের সাথে আমরা কিভাবে মিথষ্ক্রিয়া করতে শিখি—এই সমস্ত বিষয় জানার ক্ষেত্রে শিশুবিকাশের তত্ত্বগুলি সহায়ক।

১০.৫ সামাজিকীকরণের মাধ্যম

সামাজিকীকরণের মাধ্যম বলতে আমরা সেই সমস্ত গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের কথা বুঝি যাদের ওপর সামাজিকীকরণের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই মাধ্যমগুলি বিশেষ বিশেষ ধরনের শিক্ষাদান সংক্রান্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কেননা, প্রত্যেকটি গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান তার বৈশিষ্ট্য সদস্যদের সম্পর্কের ধরন ও প্রয়োজন অনুসারে কাজ করে। সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যমগুলি কখনো পরস্পরবিরোধী মূল্যবানও সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তার নিজের ও সমাজের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন মাধ্যমগুলিকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করতে শেখে। যে কোন সমাজেই পরিবার হ'ল শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম এবং একটি প্রধান মাধ্যম। ব্যক্তির জীবনের পরবর্তী স্তরগুলিতে অন্যান্য মাধ্যম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আমরা এখন সামাজিকীকরণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করব।

১০.৫.১ পরিবার

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানবশিশু সাধারণত যেহেতু পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে সেহেতু তাঁর সামাজিকীকরণের প্রাথমিক ও মুখ্য দায়িত্ব রয়েছে পরিবারের। সমাজ, সংস্কৃতি ও সময় ভেদে মানব পরিবারের দায়িত্ব-কর্তব্যের সীমারেখার গণ্ডিতে যথেষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়েছে—একথা সত্যি। তথাপি যে কোন সমাজে মা ও সন্তানের সম্পর্কের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং পারিবারিক গণ্ডির নিশ্চয়তা শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। আধুনিক ছোট বা অণু (Nuclear) পরিবারে শিশু, বাবা ও মাকে দিনের অনেকটা সময় কাছে পায় না। অনেক ক্ষেত্রেই শিশুকে তখন পেশাদারী তত্ত্বাবধায়কদের (Baby sitter অথবা Creche) কাছে লালিত-পালিত হ'তে হয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পরিবারের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন—এক সন্তান পরিবার, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন পিতা-মাতা সৎ (Step) পরিবার, সমকামী পরিবার ইত্যাদি শিশুর প্রাথমিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত পরিবারের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা, স্থায়িত্ব ও নির্ভরশীলতা আমাদের মানসিক গঠনে পরিবারের ভূমিকা অনন্য। পরিবারের তুলনায় কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। তথাপি আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবারের ভূমিকা অনন্য। পারিবারিক সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা, স্থায়িত্ব ও নির্ভরশীলতা আমাদের মানসিক গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। শিশুর সামনে বহির্বিশ্বের বাতায়ন পরিবারই প্রথম উন্মুক্ত করে দেয়। শিশুকে ভাষা শিক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণ, মূল্যমান ও নীতি শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে পরিবার অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আবার শিশুর প্রতি পিতা-মাতার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার সামাজিকীকরণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে পরিবারের সদস্য হিসেবে আমরা যে সমস্ত ভালো বা মন্দ গুণগুলি অর্জন করি, তা বৃহত্তর জীবনে আমাদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করে।

ঐতিহ্যগত সমাজে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা অনেকক্ষেত্রেই পারিবারিক মর্যাদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে সামাজিক মর্যাদা জন্মসূত্রে নির্ধারিত না হলেও পারিবারিক সচ্ছলতা বা শ্রেণীগত মর্যাদা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই কারণের সমৃদ্ধ ও গরীব পরিবারের সংস্কৃতিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১০.৫.২ সঙ্গী-গোষ্ঠী

সঙ্গী-গোষ্ঠী বা (Peer group) আধুনিক সমাজে সামাজিকীকরণের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একই বয়সের শিশু ও কিশোরদের বন্ধু গোষ্ঠীকেই সাধারণত সঙ্গী-গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা হয়। ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিতে বৃহৎ যৌথ পরিবারের শিশুসন্তানদের মধ্যে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও বয়স্ক তত্ত্বধায়কদের 'কর্তৃত্বমূলক' নিয়ন্ত্রণে এই গোষ্ঠীগুলি সজীব হয়ে ওঠে না। পক্ষান্তরে, আধুনিক ছোট পরিবারের সন্তানদের কাছে সঙ্গী-গোষ্ঠী একটি স্বাভাবিক চাহিদা। শিশু-তত্ত্বাবধায়ক কেন্দ্রে (Creche), স্কুলে অথবা পাড়ার সমবয়সী বন্ধুদের সাথে যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার প্রকৃতি সাম্যভিত্তিক। মিড ও পিয়াজের শিশুবিকাশের তত্ত্বে বন্ধু-সম্পর্কের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পিয়াজে বিশেষ করে দেখান যে সঙ্গী-গোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পর্কে পারিবারিক সম্পর্কের চাইতে অধিক গণতান্ত্রিক। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সঙ্গী গোষ্ঠীতে তা সম্ভব নয় সঙ্গী-গোষ্ঠীর কোন না কোন সদস্য মানসিক বা শারীরিক ক্ষমতা বলে অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করলেও, এই ধরনের গোষ্ঠী পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ককে ভিত্তি করেই টিকে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, সমতার সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু অত্যন্ত সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়। একটি নতুন ধরনের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে শিশু মানবজীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শেখে। আজকের জটিল সমাজে এই শিক্ষা সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে খুবই অপরিহার্য। বৃহত্তর কর্মজীবনেও আমরা যে সমস্ত অ-বিধিবদ্ধ (Informal) গোষ্ঠী গড়ে তুলি, সেগুলিও সঙ্গী-গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করে।

১০.৫.৩ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে শিশু যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তার ভূমিকার বিস্তৃতি ঘটে। বিদ্যায়তনে বিধিবদ্ধভাবে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া কাজ করে। অবশ্য ঘোষিত পাঠক্রম যে শিক্ষা আমরা বিদ্যালয়ে লাভ করি তাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইভান ইলিচ (Ivan Illich)সহ অন্যান্যরা মনে করেন যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিস্তার কিছু বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলি হ'ল— তত্ত্বাবধায়কমূলক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, বিভিন্ন কর্মসংক্রান্ত ভূমিকার জন্য ব্যক্তিবর্গকে বিভাজিত করা, সমাজের প্রধান প্রধান মূল্যবোধগুলি শিক্ষা দেওয়া এবং প্রচলিত সামাজিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা। ইলিচ দেখান যে, বাধ্যতামূলক উপস্থিতির নিয়মের সহায়তায় স্কুলগুলি আজ এক ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সংগঠনে (Custodial organization) পরিণত হয়েছে। এই সংগঠনগুলি ব্যক্তিকে কর্মে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত চার-দেয়ালের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখছে। ইলিচ তাই মনে করেন যে, ঘোষিত পাঠ্যক্রমের বাইরে স্কুলের একটি 'গোপন পাঠ্যক্রম' (Hidden curriculum) রয়েছে যা শিশুদের ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। যেমন, স্কুলজীবনে আমাদের ক্লাসে শান্ত থাকতে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুশাসন মেনে চলতে, পড়াশুনায় যত্নবান হতে এবং স্কুলের নিয়মানুবর্তিতায় অভ্যস্ত হতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা পাঠ্যক্রমের কোথাও লেখা থাকে না। তথাপি, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এই 'গোপন পাঠ'গুলি প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী-শাসন-ব্যবস্থাকে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে আমাদের প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে সহায়তা করে।

১০.৫.৪ গণপ্রচার মাধ্যম

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় গণপ্রচার এবং বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংবাদপত্র সাময়িক পত্রিকা, পুস্তক, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, কম্পিউটার ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপ্রবাহ পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের জ্ঞান, মূল্যবোধ ও মানসিকতাকে আজ অনেকটাই প্রভাবিত করে। কেননা, যে কোন তথ্য, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, আলোচনা বা উপস্থাপনাকে ঘিরে থাকে কিছু যুক্তি, মূল্যমান, উদ্দেশ্য বা স্বার্থ। স্বাভাবিকভাবেই, মাধ্যমগুলি প্রতিষ্ঠিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বা ধর্মীর চেতনার পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি লিখতে বা পড়তে পারে না, তার কাছেও বৈদ্যুতিন মাধ্যম আজ পৌঁছে গেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, ঘটনা ও চিন্তা-ভাবনাকে আমাদের কাছে অতি সহজে পৌঁছে দিয়ে এই মাধ্যমগুলি বিশ্বায়ন (Globalization) প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছে। একে আবার অনেকে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ (Cultural imperialism) বলে ব্যাখ্যা করেছেন। টেলিভিশন ও সিনেমার পর্দায় যৌনতা ও হিংসার প্রদর্শন অনেক ক্ষেত্রে শিশুর আচরণে উগ্রতার প্রবেশ ঘটায়। এ সব সত্ত্বেও গণমাধ্যমবিহীন কোন জীবনের কথা আমরা আজ ভাবতে পারি না।

১০.৫.৫ অন্যান্য মাধ্যম

সামাজিকীকরণের অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে আমরা সর্বাগ্রে পেশাগত সংস্থার নাম উল্লেখ করতে পারি। যে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষান্তে কোন না কোন বৃত্তি বা পেশাভুক্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। ব্যক্তির জীবনে এই পরিবর্তন নিয়ে আসে এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা যা তার দক্ষতা, ভূমিকা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। কখনো কখনো কাজের পরিবেশ ব্যক্তির কাছে এতোটাই অপরিচিত হয় যে, তাকে নতুন করে অভ্যস্ত হতে হয়। এছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশী, গৌণ সংঘ (যেমন, ক্লাব বা ধর্মীয় সংগঠন), রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রীয় আইন কানুন, মডেল—ইত্যাদি ব্যক্তির সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে।

১০.৬ সামাজিকীকরণের পরিবর্তিত ধরন

একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) হিসেবে সামাজিকীকরণ সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে—এটাই স্বাভাবিক। যে কোন সমাজে মানুষের মূল্যবোধ, জীবন-আচরণ পদ্ধতি, আশা আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন অনুসারে সামাজিকীকরণের প্রণালী পরিচালিত হয়। স্বভাবতই, ঐতিহ্যগত সমাজে যে ভাবে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া পরিচালিত হ'ত, আধুনিক ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে তা সম্ভব নয়। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যৌথ বা বিস্তৃত পরিবারে শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পেশাদারী কর্তৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন হ'ত না। পরিবারের গণ্ডির বাইরে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনরাও শিশুর সামাজিকীকরণে অংশ নিত। কিন্তু, সমকালীন সমাজে শুধু পরিবারের কাঠামো ও কর্তৃত্বের ধরনেই নয়, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের ধরনেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, সন্তানদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। ফলে, শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের দায়িত্বগুলি বিভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক কেন্দ্র, সঙ্গী-গোষ্ঠী বা গণপ্রচার মাধ্যম অনেকটা ভাগ করে নিয়েছে। ঐতিহ্যগত সমাজে লোকাচারে, লোকনীতি, প্রথা বা ধর্মের প্রভাবে মানবজীবন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হ'ত। কিন্তু আধুনিক 'গণ-সমাজে' (Mass Society) ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন আচারবিশিষ্ট লোকের সম্বন্ধ বজায় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক ও আইনি মাধ্যমগুলি অধিক সক্রিয়।

সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলির ভূমিকার পুনর্বিন্যাসের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে সামাজিকীকরণের বিষয়বস্তু ও ধরনেও আজ পার্থক্য ঘটেছে। প্রাক্-শিল্পায়িত সমাজে সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নির্ধারি

হ'ত। বিখ্যাত ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমিল ডুর্কহাইম (Emile Durkheim) বলেন যে, প্রাচীন সমাজে জনগণের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাদৃশ্য বা যৌথ বিবেকবোধ (Collective conscience) পরিলক্ষিত হ'ত। ফলে, ঐ সমাজে সামাজিকীকরণ ছিল 'বাধ্যতামূলক' এবং যে কোন ধরনের বিচ্যুতিকে কঠোরভাবে দমন করে রাখা হ'ত। পক্ষান্তরে, আধুনিক সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব ঘটায় দমনমূলক বা বাধ্যতামূলক সামাজিকীকরণ পদ্ধতির পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি আবশ্যিক হয়ে পড়ে। পরিবার থেকে স্কুল পর্যন্ত শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত রাখাত্রিত রাখার ৪৩ব কমই বলপ্রয়োগকে বাঞ্ছনীয় এবং একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে করা হয়, যদিও বলপ্রয়োগের ভয় যে কোন কর্তৃত্বমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই থেকে যায়। বরং অন্তরঙ্গ ও ভালোবাসার সম্পর্ক, সমতামূলক সম্পর্ক এবং বোঝাপড়ার সম্পর্ক সামাজিকীকরণ প্রণালীকে সমকালীন সমাজে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আধুনিক সমাজে গণতান্ত্রিক সম্পর্কের গুরুত্ব যে কোন গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মকেই প্রভাবিত করে।

সামাজিকীকরণের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনকেও আমরা সামাজিকীকরণের ধরনে পরিবর্তনের একটি কারণ বলে উল্লেখ করতে পারি। শিল্প ও নগর-সমাজের মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সামাজিকীকরণের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন স্বাভাবিক। সর্বজনীন তথা তুলনামূলক শিক্ষার গুরুত্ব আজ এই কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক সমাজে পেশাগত বৈচিত্র্যের ফলশ্রুতি হিসেবে নতুন নতুন বিষয় ও পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিকে এই পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে নগরে, দেশ থেকে দেশান্তরে শিক্ষা, বৃত্তি বা পেশার সন্ধানে ছুটে যাবার যে কর্মযজ্ঞে আমরা সামিল হয়েছি তা সমকালীন সমাজকে অনেক সচল করে তুলেছে। এ ছাড়াও, বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির সহায়তায় বিশ্ব-সংস্কৃতির দ্বারা আজ আমাদের জন্য উন্মুক্ত। বর্তমান প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিদের চিন্তা-ভাবনা, আদব-কায়দা, রুচি বা আদর্শের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সামাজিকীকরণের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে। সর্বোপরি, আজকের সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন সমস্যা, এড্‌স্, সমকামীতা, একাকীত্ব, নেশা সমস্যা অপরাধপ্রবণতা, পরিবেশ দূষণ—এই সমস্যাগুলির কথা কয়েক দশক আগে বিশেষ শোনা যায় নি। বর্তমান প্রজন্মের মানুষের সম্পর্ক, চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম ও শিক্ষা এই সমস্ত বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া সর্বদাই গতিশীল। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই প্রক্রিয়া কাজ করে বলেই বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের কাছে সামাজিকীকরণ গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

১০.৭ সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতি ও সমাজ-কাঠামো

সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতি ও সমাজ-কাঠামোর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বর্তমান তা আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্যই হ'ল ব্যক্তিকে একটি সমাজের সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করা। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মানব-সংস্কৃতি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, সামাজিকীকরণের সার্থকতার ওপর সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা নির্ভর করে। অন্যদিকে, সামাজিকীকরণের বিষয়বস্তু ও ধরন সংস্কৃতি দ্বারা মূলত নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সংস্কৃতি থেকেই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ধারণা পেয়ে থাকে। মানব সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, তাই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াও প্রভাবিত হয়। একইভাবে,

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে সমাজ কাঠামো। সামাজিক লোকদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা যে সুসংবদ্ধ, জটিল ও নিবিড় সম্বন্ধ জালের সৃষ্টি হয়, তাকে সমাজ-কাঠামো বলে আখ্যা দেয়া হয়। আমাদের আচরণ ও সম্পর্কের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে সে সমাজ-কাঠামোর সৃষ্টি হয় তা একটি বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানদণ্ডেই টিকে থাকতে পারে। সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানগুলি, যেমন—নীতি, মূল্যবান, মর্যাদা ও ভূমিকা, সংস্কৃতি নির্ভর। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমরা প্রচলিত নীতি ও মূল্যমান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করি এবং উপযুক্ত মর্যাদা ও ভূমিকা গ্রহণে ব্রতী হই। অর্থাৎ, সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াই সামাজিক কাঠামোকে মূর্ত করে তোলে। আমাদের আচরণ বা সম্পর্কের স্থায়িত্ব তখনই সম্ভব হতে পারে যখন একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সেই আচরণকে আয়ত্ত করে নিই এবং সম্পর্কগুলিকে গ্রহণ করতে শিখি। অবশ্য সমাজ-কাঠামো যে সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে না তা নয়। ব্যক্তির ভালো মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ গোষ্ঠী-জীবনের যে সব নীতি, মূল্যমান ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেগুলি সমাজ-কাঠামোরই অন্তর্গত।

১০.৮ সারাংশ

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তি সামাজিক জীবে পরিণত হয়। সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য হ'ল শিশুকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং আদর্শ ও মূলবোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত করা। শুধু করা নয়, সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এর গুরুত্ব অসীম। এ প্রসঙ্গে 'অমলা কমলা', 'রামু' ও 'ক্যাসপার হসার'-এর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

শিশুর জন্ম থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিকীকরণ সাধিত হয়। পরিবার, সঙ্গী-গোষ্ঠী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গণপ্রচার মাধ্যম প্রভৃতি শিশুর সামাজিকীকরণে সহায়তা করে।

সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে সামাজিকীকরণ সমাজ-কাঠামোতে পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। ঐতিহ্যগত সমাজে যেভাবে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া পরিচালিত হ'ত আধুনিক ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলোর পুনর্বিন্যাসের সাথে সাথে সামাজিকীকরণের বিষয়বস্তু ও ধরনেও প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতি ও সমাজ-কাঠামোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

১০.৯ অনুশীলনী

১. সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝায়? সামাজিকীকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটি আলোচনা করুন।
৩. সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
৪. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   (ক) সামাজিকীকরণের প্রকারগুলি আলোচনা করুন।
   (খ) শিশুর প্রাথমিক বিকাশের স্তরগুলি আলোচনা করুন।
   (গ) শিশুবিকাশের সাধারণ তত্ত্বগুলির পর্যালোচনা করুন।
   (ঘ) সামাজিকীকরণের পরিবর্তিত ধরন আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
   (ঙ) সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতি ও সমাজ-কাঠামো কিভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত?

৫. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) প্রত্যাশামূলক সামাজিকীকরণ কি?

(খ) শিশু সামাজিকীকরণের পদ্ধতির সাথে প্রাপ্তবয়স্ক সামাজিকীকরণের পদ্ধতি পার্থক্য কোথায়?

(গ) পুনঃসামাজিকীকরণ কি?

(ঘ) ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায়?

(ঙ) 'অন্যের ভূমিকা গ্রহণ' বলতে মিড কি বুঝিয়েছেন?

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Anthony Giddens : Sociology

(২) Guy Rocher : A General Introduction to Sociology

(৩) পরিমল কর ঃ সমাজতত্ত্ব

(৪) অনাদি কুমার মহাপাত্র ঃ বিষয় সমাজতত্ত্ব।

একক ১১ ☐ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বিচ্যুতি

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য
১১.১ প্রস্তাবনা
১১.২ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা
১১.৩ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকার
১১.৩.১ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
১১.৩.২ নেতিবাচক ও ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
১১.৩.৩ বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
১১.৩.৪ সচেতন ও অচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
১১.৩.৫ পিতৃতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
১১.৪ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম
১১.৫ অনুক্রমণ ও বিচ্যুতি
১১.৬ বিচ্যুতির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
১১.৭ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিচ্যুতি ও সমাজ-শৃঙ্খলা
১১.৮ সারাংশ
১১.৯ অনুশীলনী
১১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি —

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন এবং তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব ও প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারবেন।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা ও ফলাফল নির্ণয় করতে পারবেন এবং
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের সীমা কতদূর তা বুঝতে পারবেন।

১১.১ প্রস্তাবনা

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সমাজস্থিত মানুষে উপর ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ বিনা সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন সম্ভব নয়। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই সামাজি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সামাজিক শৃঙ্খলা বলতে কি বোঝায়? এর অর্থ হ'ল সামাজিক কাজকর্ম সুচারুভাবে সম্পাদ করার জন্য নিয়মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যবস্থা। পূর্ব নির্ধারিত আচার-আচরণের ব্যব

ছাড়া কোন সমাজ যথাযথভাবে চলতে পারে না। পারস্পরিক অধিকার এবং কর্তব্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই রক্ষিত হয়।

১১.২ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা

নিয়ন্ত্রণহীন কোন গাড়ীর মত মানবসমাজও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে চলতে পারে না। সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজবদ্ধ মানুষ তাই সভ্যতার শুরু থেকেই অনুভব করে আসছে। ব্যক্তি ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের আচরণকে কিছু নিয়মনীতি ও পদ্ধতির সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত রাখার এই প্রয়াস মানব-সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক। মানবীয় আচরণের নিয়ন্ত্রণ তাই মানব-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা সামাজিক ভারসাম্য এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে সাহায্য করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে তাই মানবসমাজ ও সংস্কৃতির রক্ষাকবচ হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচার-আচরণ যদি কিছু বাঞ্ছিত ও আকাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালিত না হয় তাহলে সমাজ হয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল এবং বিশৃঙ্খল কোন সমাজ মানব প্রগতি ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম নয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ তাই সমাজ এবং সময়ভেদে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' বলতে সাধারণত সেই সমস্ত উপায় ও পদ্ধতিকে বোঝানো হয় যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ (R.M.MacIver & C.H.Page) বলেন যে, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সেই পদ্ধতিকে বোঝায় যার দ্বারা সমগ্র সমাজব্যবস্থা সুসংহত ও সংরক্ষিত থাকে এবং একটা পরিবর্তনশীল ভারসাম্য বজায় রেখে সামগ্রিকভাবে কাজ করে।" (By social control is meant the way in which the entire social order coheres—how it operates as a whole, as a changing equilibrium.) অধ্যাপক বটোমোরের মতে (T.B. Bottomore) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হ'ল বিশেষ কিছু সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আইন ও আদর্শের সৃষ্টি যার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীগত ও দলগত বিরোধের মীমাংসা হয় এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মূল্যমান ও নীতিবোধের কাছে আবেদনের মাধ্যমে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে উত্তেজনা বা দ্বন্দ্ব প্রশমনের প্রয়াস হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। বটোমোর অবশ্য মনে করেন যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সাধারণত মূল্য ও নীতির সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হ'লেও বল বা শক্তি প্রয়োগের ধারণাও এর সাথে যুক্ত। কেননা আধুনিক জটিল সমাজে মূল্যবোধ ও নীতির সহায়তায় মানবীয় আচরণকে সবসময় নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভবপর হয় না। অবশ্য মূল্যবোধ ও নীতিমানের সাহায্যে আচরণকে নিয়ন্ত্রণের উপর যারা গুরুত্ব দেন তারা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে সমগ্র সমাজের স্তরে বিবেচনা করেন এবং একটি অপেক্ষাকৃত সুষম, ঐক্যবদ্ধ ও স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেন। সহজ ও সরল সমাজের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এইভাবে সম্ভব হ'লেও বহু গোষ্ঠী সমন্বিত জটিল সমাজে এভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। কেননা এক্ষেত্রে প্রতিটি গোষ্ঠী তার নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমানকে সমগ্র সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে চায়; আধুনিক সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখার ক্ষেত্রে তাই শক্তির ভূমিকাকে লঘু করে দেখা উচিত হবে না। পুরস্কার প্রদান এবং শাস্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় বলে মূল্যবোধ ও নীতিমানের পাশাপাশি বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কতকগুলি পন্থা বা বিধিব্যবস্থার উল্লেখ করতে পারি, যা ব্যক্তিকে সমাজ ও গোষ্ঠীর অনুমোদিত আচরণ শিক্ষা ও অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে অথবা বাধ্য করে। অর্থাৎ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি প্রশিক্ষণমূলক অথবা প্রতিনিবৃত্তিমূলক হ'তে পারে। একদিকে লোকাচার, লোকনীতি, প্রথা, শিক্ষা, ধর্ম, আদ

বা বিশ্বাস আমাদেরকে সমাজ অনুমোদিত আচরণে অভ্যস্ত করে, অন্যদিকে সমাজ ও গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য আচরণ প্রণালীর থেকে বিচ্যুতির প্রতিষেধক হিসেবে দমনমূলক ব্যবস্থার উপস্থিতিও আমাদের নিয়ন্ত্রিত রাখে। অধ্যাপক অগবার্ন ও নিমকফ (W.F. Ogburn and M.F.Nimkoff) এই প্রসঙ্গে বলেন যে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে সমাজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের উপর যে ধরনের চাপ সৃষ্টি করে তাই হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে এবং সমাজপ্রবাহকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১১.৩ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকার

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতির অনুসরণ থেকে সম্ভব হ'তে পারে। প্রথা, লোকাচার, লোকনীতি ধর্ম, শিক্ষা, জনমত, আইন ইত্যাদির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক অথবা যুগ্মভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে সম্ভব করে তোলে। সমাজতাত্ত্বিকগণ এই সমস্ত পন্থা-পদ্ধতি বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণেরও প্রকারভেদ করে থাকেন।

১১.৩.১ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

কার্ল ম্যানহেইম (Karl Mannheim) এবং বটোমোর (T.B. Bottomore) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দুটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রকারগুলি হ'ল ঃ প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Social Control) এবং পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Indirect Social Control)। প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সেই সমস্ত ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়, যা ব্যক্তির জীবনধারাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরাসরি কার্যকর হয় বলে ব্যক্তির আচরণকে সুস্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণে এটি অধিক সক্ষম, যেমন—পরিবার, প্রতিবেশী, খেলার সঙ্গী এবং অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি তাদের সদস্যদের আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি তার পিতামাতা, সহকর্মী বা প্রতিবেশীদের আদর্শ ও মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তবে আধুনিক জটিল সমাজে ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনকে কোন একটি সংস্থা বা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিভিন্ন গঠন-গোষ্ঠী, কার্যালয়, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আংশিকভাবে এবং পৃথক পৃথক অবস্থায় আমাদের আচরণকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন—পুলিশ, প্রশাসন, আইন বা আদালত বিধিবদ্ধ ও প্রত্যক্ষভাবে আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু, ব্যক্তি তার জীবনে এই ধরনের বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ গণ্ডির বাইরেও কার্য সম্পাদনে উদ্যোগী হয়। এক্ষেত্রে আইন-আদালত বা প্রশাসনিক ক্ষমতার ভয় পরোক্ষভাবেও ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক নিয়মনীতি বা মূল্যবোধ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণার উন্মেষ ঘটানো, যাতে সে বিচ্যুতির পথে পা না বাড়ায়। অপ্রত্যক্ষভাবে লোকাচার, লোকনীতি, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতির সহায়তায় এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় বলে একে পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অনেকটাই আমাদের অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয় বলে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মত এটি ততটা সক্রিয় ও দৃঢ় নয়।

১১.৩.২ নেতিবাচক ও ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সমাজবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং (Kimball Young) ব্যবহারিক দিক থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দুটি প্রকারের কথা বলেছেন, এগুলি হ'ল ইতিবাচক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative)। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যখন স্বতঃস্ফূর্ত

ও স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিকে সমাজ শৃঙ্খলার প্রতি অনুগামী করে তোলে তখন তাকে ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। যেমন—সম্মানসূচক উপাধি প্রদান, আর্থিক পুরস্কার প্রদান, সামাজিক প্রশংসা ও প্রশস্তি ইত্যাদির সহায়তায় যখন ব্যক্তিকে সমাজস্বীকৃত বিধিবিধানসমূহের যথাযথ অনুসরণে উৎসাহিত করার চেষ্টা হয় তখন তা ইতিবাচকভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক নিয়মকানুনের বৈধতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দেয়। তখন সে এমন কোন কাজে লিপ্ত হ'তে চায় না যা সকলের চোখে নিন্দনীয়। সাধারণত, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শৈশব থেকে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা অন্যদের সাহচর্য ও সংস্পর্শে আমাদের মধ্যে সামাজিক আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। যে কোন সমাজেই ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তখনই উঠে যখন ইতিবাচক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যর্থ হয়, সমাজ যে শুধুমাত্র কতকগুলি আদর্শ গ্রহণে তার সদস্যদের উৎসাহিত করে তাই নয়, অসামাজিক কাজকর্মে তাকে বাধাদানেরও চেষ্টা করে। অর্থাৎ সমাজস্বীকৃত আচার-ব্যবহার বা পন্থা-পদ্ধতি উপেক্ষা করলে অথবা সমাজবিরোধী কাজকর্মে সামিল হলে সমাজ নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি প্রয়োগ করে। নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মৌখিকভাবে, যেমন—তিরস্কার, লাঞ্ছনা, নিন্দা, ধিক্কার প্রভৃতির মাধ্যমে অথবা শারীরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব হ'তে পারে। এছাড়াও অর্থদণ্ড বা সামাজিক বহিষ্কার নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করতে সহায়তা করে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে অনেকে গঠনমূলক (Constructive) ও শোষণমূলক (Oppressive) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে অভিহিত করেন।

১১.৩.৩ বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে বিধিবদ্ধ (Formal) ও অ-বিধিবদ্ধ (Informal)—এই দুইভাবে ভাগ করা যায়। বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ বলতে সেই নিয়ন্ত্রণকে বোঝায় যা কৃত্রিমভাবে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তেই সৃষ্ট হয়েছে। যেমন—সরকার, আইন, আদালত, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি কর্তৃক যে নিয়ন্ত্রণ তা বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ। অন্যদিকে অ-বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে বোঝায় যা সুস্থ ও সুসংহত সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত এবং যা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট নয়। যেমন— লোকাচার, লোকনীতি, প্রথা বা রীতিনীতি, স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করে। আধুনিক জটিল সমাজে অবশ্য অ-বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের তুলনায় বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ অধিক কার্যকর।

১১.৩.৪ সচেতন ও অচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের মতই সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে সচেতন (Conscious) এবং অচেতন (Unconscious)—এই দুই প্রকারেও ভাগ করা হয়ে থাকে। সচেতন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি ও প্রয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে রীতিনীতি, ঐতিহ্য বা প্রথার সহায়তায় অচেতনভাবে যে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া চালু থাকে তার প্রভাব বিশেষ করে সহজ-সরল সমাজে লক্ষ্য করা যায়।

১১.৩.৫ পিতৃতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ পদ্ধতির পার্থক্যের ভিত্তিতেও পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchai) ও গণতান্ত্রিক (Democratic) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। পরিবারে পিতার নিয়ন্ত্রণ, কারখানায় মালিকের নিয়ন্ত্রণ, ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরোহিতের নিয়ন্ত্রণ, সৈন্যদের উপর সেনানায়কের নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক দলে নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক

নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ভুক্ত। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যখন নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় তখন গোষ্ঠী বা সমাজের বৃহত্তর অংশের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং নিয়ন্ত্রণ একতরফাভাবে কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। আধুনিক সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অধিক কার্যকর বলে ভাবা হয়। যেমন—কারখানার শ্রমিক ও মালিকের যৌথ-ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অধিক ফলপ্রসূ হয় বলে দেখা গেছে। কিন্তু কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন—যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ বা এই ধরনের বিশেষ অস্থিরতার সময় পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একমাত্র কাম্য বলে ভাবা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, সমাজের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারেও পার্থক্য ঘটে। সাবেকী সমাজে ব্যক্তির আচার-আচরণ যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'ত, আধুনিক সমাজে তা সম্ভব নয়। বর্তমানকালে তাই নতুন নতুন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়, যা পরিবর্তিত সমাজ কাঠামো ও সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে অধিকমাত্রায় অর্থবহ এবং কার্যকর। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে কোন পরিবর্তনকে আমরা সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দ্যোতক বলেও গণ্য করতে পারি।

১১.৪ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম বলতে আমরা সেই সমস্ত ব্যবস্থাকে বুঝে থাকি যার দ্বারা কোন সমাজের নীতি, মূল্যবোধ, প্রথা, আদর্শ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এদের 'কার্যনির্বাহী সংস্থা' বলেও অভিহিত করা হয়, যেহেতু এদের মাধ্যমে নীতি বা মূল্যবোধগুলি অধিক সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এক অর্থে যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীকেই আমরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম বলে গণ্য করতে পারি, যেহেতু এই গোষ্ঠী তার সদস্যদের সমাজ অনুমোদিত আচরণ শিক্ষা দেয়। তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলি হ'ল ঃ পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, ধর্মীয়সংস্থা, শিক্ষায়তন, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

পরিবারের মধ্যেই শিশুর সামাজিকীকরণের কাজ শুরু হয় এবং সামাজিক বিধিসমূহ মেনে চলার উপযুক্ত মানসিকতা গঠন করার প্রয়াস করা হয়। কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদির ধরন শিশু পরিবারেই শেখে ব্যক্তিবিশেষকে সুপরিণত মানুষের রূপান্তরিত করার কাজে, আদিম প্রবৃত্তিকে মানব প্রকৃতিতে পরিণত করার কাজে পরিবারের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক বিধিসমূহ মেনে না চললে পরিবার প্রয়োজনে শাস্তিও প্রদান করে, তবে পরিবারের গঠনপ্রকৃতিতে পার্থক্যের দরুন নিয়ন্ত্রণের ধরনে কিছু হেরফের ঘটে। যেমন—যৌথ পরিবারগুলি ব্যক্তির আচরণকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আধুনিক একক পরিবারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থাতেও নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পরিবারের গণ্ডীর বাইরে পাড়া-প্রতিবেশী এবং সঙ্গী-গোষ্ঠীও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ন্যায়-অন্যায়ের মানযুক্ত লোকনীতি লঙ্ঘিত হ'লে পাড়ার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, তবে সমসাময়িককালে এই ধরনের প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সমাজে সঙ্গী-গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে অবশ্য কিছু দ্বিমত দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে, সঙ্গী-গোষ্ঠীগুলিতে সামাজিক আদবকায়দা শেখার পাশাপাশি বিচ্যুত ব্যবহার সম্পর্কে প্রারম্ভিক ধারণাও শিশু লাভ করে।

মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে ধর্মীয় অনুশাসন কার্যকর করার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক ধর্মীয় সংগঠন তার অনুগত ব্যক্তিদের কিছু

আচার-ব্যবস্থা অনুসরণ করতে নির্দেশ করে। এইসব বিধিনিষেধ এবং অনুশাসন মেনে চলার পিছনে ঈশ্বর, স্বর্গসুখলাভ ইত্যাদি ধারণা কাজ করে। প্রত্যেক ধর্মীয় সংগঠনই কিছু সামাজিক আচরণকে পুরস্কারিত ও অনুপ্রাণিত করে এবং কিছু আচরণকে অবমূল্যায়ন করে। তবে প্রাচীনকালের সমাজব্যবস্থায় সামাজিক নিয়ামক হিসেব ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা যতটা শক্তিশালী ছিল আজকের সমাজে তা প্রায় নেই বললেই চলে।

আধুনিক শিল্পসমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা অফিস-আদালতে নির্ধারিত নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন—সময়মত কাজে প্রবেশ, নির্দিষ্ট ব্যবহার, সঠিক পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান সম্মানীয় ব্যক্তির প্রতি বিশেষ আচরণ প্রদর্শন ইত্যাদি নিয়মনীতিগুলি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক দিক। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলির মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্বও কম নয়। ব্যক্তিমানুষের মধ্যে শিক্ষা, সততা, ন্যায় অন্যায়বোধ প্রভৃতি ধারণাকে বিকশিত করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে আমরা নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব, শৃঙ্খলার মূল্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি প্রসঙ্গেও সম্যক ধারণা লাভ করি। ইভান ইলিচ্ (Ivan Illich) মনে করেন যে, স্কুলগুলি হ'ল এক ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সংগঠন যা ব্যক্তিকে কর্মে প্রবেশ পর্যন্ত চার দেওয়ালের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখে।

ইদানিংকালে জনমত সৃষ্টি দ্বারা কোন বিশেষ নীতি বা মূল্যবোধকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের ভূমিকাও লক্ষণীয়। চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতি মাধ্যমগুলি দৈনন্দিন জীবনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যা, বিচার্য বিষয় বা বক্তব্যের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে আমাদের মূল্যবোধ ও মানসিকতাকে আজ যথেষ্ট প্রভাবিত করছে, যেমন—সাম্য, মৈত্রী, শান্তি, নারী-স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যতার মতো ধারণা বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একটি পরিবর্তনশীল সমাজে সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির প্রকাশমান নতুন স্বরূপগুলিকে গণমাধ্যম জনপ্রিয় করে তুলতে পারে।

সমাজের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিরূপে রাষ্ট্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন-প্রণয়ন করে এবং এই আইন অমান্য করলে আদালত শাস্তি দেয়। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ, মিলিটারী, জেলখানা ইত্যাদির সাহায্যে অসামাজিক বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে রোধ করতে সচেষ্ট হয়। আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণসাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে আইন-আদালত এবং সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বস্তুতপক্ষে, একটি অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অনন্য। পরিবার, বিবাহ, জাতিভেদ, নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয় থেকে শুরু করে আধুনিক মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই আইনের আওতার বাইরে নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রমের মাধ্যমগুলির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টায়। প্রাচীন সমাজে প্রাথমিক গোষ্ঠীভিত্তিক জীবনযাত্রার প্রাধান্য ছিল বলে সেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলি ছিল প্রধানত অ-বিধিবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক সমাজে গৌণ সম্পর্কের (Secondary relations) ক্রমবর্ধমান আধিক্যের কারণে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমগুলির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১১.৫ অনুক্রমণ ও বিচ্যুতি

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি কার্যকর হ'লে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাকে সমাজতাত্ত্বিকগণ অনুক্রমণ বা (Conformity) বলে অভিহিত করেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি বা নিয়মকানুনের অনুগামী হওয়াকে বলে অনুক্রমণ। অনুক্রমণ সমাজপ্রবাহকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। সমাজবদ্ধ মানুষের

কাছে এটি কোন ব্যতিক্রম নয়, কেননা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ সামাজিক অনুশাসন মেনেই সাধারণত নিয়ন্ত্রিত হয়। তথাপি অনুক্রমণের সহায়ক কিছু কারণের উল্লেখ করা যায়, যা এই প্রক্রিয়াটিকে স্বাভাবিক করে তোলে।

সাধারণত সামাজিক চাপ ও শাস্তির ভয়ে মানুষ সমাজস্বীকৃত রীতিনীতির অনুগামী হয়। যদিও অনুক্রমণের একমাত্র কারণ এটি নয়। কোন গোষ্ঠী বা সমাজের সদস্যরা যাতে সমাজস্বীকৃত নিয়মনীতিগুলি মানা করে চলে, সে ব্যাপারে গোষ্ঠী বা সমাজ নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে থাকে। এই ধরনের সামাজিক চাপের কাছে ব্যক্তিকে নতিস্বীকার করতেই হয়। ছোটখাটো বা গুরুত্বহীন বিষয়ে অল্পবিস্তর বিচ্যুতিকে সমাজে অগ্রাহ্য করলেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামাজিক বিচ্যুতিকে সহ্য করা হয় না, বিচ্যুতির পরিণতি যেখানে শাস্তিভোগ বা সামাজিক চাপ সেখানে অনুক্রমণ থেকে প্রশংসা বা পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে অনুক্রমণ একটি আকাঙ্ক্ষিত বিষয়।

সামাজিক নিয়মনীতি অনুসরণ করার পেছনে সামাজিকীকরণের ভূমিকাও অদ্বিতীয়। সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, এই প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটে এবং সমাজের আদর্শ, মূল্য ও নীতি গ্রহণে আমরা প্রবৃত্ত হই, সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করে এবং যৌথ জীবনযাত্রার উপযোগী করে তোলে। সামাজিকীকরণের ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের মধ্যে প্রচলিত বিধিব্যবস্থা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা বা ঔচিত্যবোধের ধারণার সৃষ্টি হয়, যা অনুক্রমণকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। সামাজিকীকরণকে তাই সামাজিক রীতিনীতিতে দীক্ষিতকরণ (Indocrrination) এবং অভ্যস্তকরণের (Habituation) একটি প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়। সামাজিক আচার-পদ্ধতির অনুসরণ যদি অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন তা স্বাভাবিকভাবে আমাদেরকে সেইসমস্ত আচার-পদ্ধতির প্রতি দীক্ষিত করে তোলে।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও গোষ্ঠীগত একাত্মতা এবং নীতি ও মূল্যমানের উপযোগীতাও অনুক্রমণকে সহজ করে তোলে। গোষ্ঠীর সদস্যপদ যদি সীমিত হয় এবং সেই সদস্যদের সম্পর্ক যদি ঘনিষ্ঠ হয়, তাহলে গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্থায়ী ও দৃঢ় হয়। এরূপ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর প্রথা-পদ্ধতি বা নিয়মনীতির অনুসরণ নিয়ে কোন তর্কের অবকাশ থাকে না। ব্যক্তি তার নিজ গোষ্ঠীর নীতিগুলিকে সানন্দে গ্রহণ করতে পারে এবং যে গোষ্ঠীর সে সদস্য নয় সেই গোষ্ঠীর নীতিগুলো তার কাছে তেমন আকর্ষণীয় কিছু নয়। আবার সামাজিক রীতিনীতিগুলো যদি প্রয়োজনীয় বা উপযোগী বলে মনে হয় তাহলেও মানুষ তাদের অনুগামী হয়। যেমন—রাস্তাচলাচলের নিয়মভঙ্গজনিত শাস্তির ভয়ের চেয়েও বরং উপযোগিতার উপলব্ধি আমাদের পরিচালিত করে।

অনুক্রমণ একটি স্বভাবসিদ্ধ প্রক্রিয়া হলেও সামাজিক বিচ্যুতির ঘটনাও সমাজে প্রায়শই ঘটে। কেননা, সব ধরনের বিচ্যুতিকে সমাজ নীতিবাচক বলে গণ্য করে না এবং ঐতিহ্যগত নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ যে কোন নতুন প্রজন্মের সদস্যদের কাছে একটি কৌতূহলী বিষয় বলে মনে হতে পারে। বিচ্যুতির ধারণাটি তাই অত্যন্ত ব্যাপক, যদিও প্রচলিত অর্থে কোন সাধারণ্যে স্বীকৃত বা গৃহীত পথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে বলা হয় বিচ্যুত। এন্থনি গিয়েন্স (Anthony Giddens)-এর ভাষায়, "কোন একটি সম্প্রদায় বা সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন নিয়মনীতি বা নিয়মনীতির সমষ্টির বিরোধিতাকে বিচ্যুতি বলে আখ্যা দেওয়া যায়।" (Deviance may be defined as non-conformity to a give norm or set of norms, which are accepted by a significant number of people in a community or society.) অনুক্রমণের মত বিচ্যুতিও একটি আপেক্ষিক বিষয়, কেননা সমাজ ও গোষ্ঠীভেদে নিয়মনীতির যেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি কোন বিশেষ সময়ের ও সমাজের বিচ্যুত ব্যবহার সকল সময় এবং সকল সমাজে বিচ্যুত বলে গণ্য হয় না। দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে বিচ্যুতির সংজ্ঞা ও ধরনে পার্থক্য ঘটে বলে সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে এটি একটি জটিল ও আকর্ষণীয় বিষয়।

এক সময়ে যে বিশেষ ব্যবহার সমাজে অস্বীকৃত বলে গণ্য হ'ত তা পরবর্তীকালে স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। যেমন, হিন্দু বিবাহিত রমণীদের শাখা-সিঁদুর পরিধান করার রীতিটি একসময় বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু সমসাময়িক সমাজে এই প্রথা অনুসরণ না করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয় না। আবার একটি সমাজে যা রীতিসম্মত, তা অন্য সমাজে অপরাধ বলে গণ্য হ'তে পারে। সুতরাং, বিচ্যুতিকে শুধুমাত্র একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা সমাজের মাপকাঠিতেই পরিমাপ করা চলে।

বিচ্যুতিমূলক আচরণের সংজ্ঞা নির্ধারণ বিশেষ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। যেমন, বিশেষ সামাজিক স্বার্থ, সামাজিক অবস্থা, সমাজের সহনশীলতা, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মানসিকতা প্রভৃতি কারণ বিচ্যুতির পরিমাপে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিভিন্ন সমাজ ও শ্রেণীভুক্ত মানুষের মূল্যবোধ ও জীবন আচরণগত পার্থক্যের দরুন সুরাপান বা নেশা একটি বিচ্যুতিমূলক অথবা স্বাভাবিক আচরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, কোন একজন ব্যক্তি পুরোপুরি অনুক্রমণকারী অথবা সম্পূর্ণ বিচ্যুত বলে গণ্য নাও হতে পারেন। যে ব্যক্তিটি সাধারণভাবে সামাজিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বলে পরিচিত, তিনিও বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজস্বীকৃত ব্যবহার থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। যেমন, কোন একজন পণ্ডিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন কলুষিত হ'তে পারে। বিচ্যুতি ধারণাকে ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে, সমাজের প্রায় প্রতিটি ব্যক্তি অল্পবিস্তর বিচ্যুত। কিন্তু, সমাজ সেই বিচ্যুতিকেই প্রশ্রয় দেয় না যা বৃহত্তর সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিছু সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে, 'বিচ্যুতি' শব্দটির ব্যবহার সেই সমস্ত পরিস্থিতির জন্যই সংরক্ষিত রাখা উচিত যে সব পরিস্থিতিতে মানুষের আচরণ একটি সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন ধরনের অপরাধমূলক কাজ, দুষ্ক্রিয়তা, অবৈধ মাদকদ্রব্য ব্যবহার, বা অত্যধিক সুরাপান, মানসিক অসুস্থতা, আত্মহত্যা প্রভৃতি বিচ্যুত ক্রিয়া বলে গণ্য হবে।

ব্যক্তিগত আচরণ ছাড়াও সমষ্টি বা গোষ্ঠীগত আচার-ব্যবহারও বিচ্যুতির পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে। কোন একটি সংস্কৃতিভুক্ত অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের আচরণ ও চিন্তাভাবনা যখন বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের আচরণ ও চিন্তাভাবনা থেকে অনেকটাই পৃথক বলে গণ্য হয়, তখন তা ঐ সমাজের মাপকাঠিতে বিচ্যুত বলে গণ্য হতে পারে। যেমন—ব্রিটিশ সমাজে 'হরেকৃষ্ণ গোষ্ঠী' বা কান্ট একটি বিচ্যুত উপসংস্কৃতির (Devience sub-culture) উপস্থাপনা করে।

আপাতদৃষ্টিতে বিচ্যুতি সমাজজীবনে নেতিবাচক বলে গণ্য হলেও বিচ্যুত ব্যবহার একটি সামাজিক তাৎপর্য্য রয়েছে; বিচ্যুতি নতুন নতুন মূল্যবোধ ও নীতির সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করতে পারে, যা সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে কখনও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন একটি সমাজে অধিকসংখ্যক মানুষ যখন বিচ্যুত ব্যবহারে সামিল হতে শুরু করে, তখন ঐ ব্যবহারটি আর বিচ্যুত বলে গণ্য হয় না। অর্থাৎ বিচ্যুত ব্যবহার সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করলে সৃষ্টি হয় নতুন নিয়মনীতির, যা পরবর্তীকালে অন্য আর একটি বিচ্যুত ব্যবহার দ্বারা পরিবর্তিত হ'তে পারে। এইভবে মানুষ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মকে যুগোপযোগী করে তোলে। বিচ্যুতি তাই সামাজিক পরিবর্তনের পথকে সুগম করে, তবে যে কোন ধরনের বিচ্যুত ব্যবহারের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা, সবরকমের বিচ্যুত ব্যবহার সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় বলে প্রতিপন্ন হয় না।

১১.৬ বিচ্যুতির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

বিচ্যুতির প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধানে শারীরতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমাজতাত্ত্বিকদের

অভিমতও গুরুত্ব পেয়েছে; কেননা, অপরাধ ও বিচ্যুতি বলতে কি বোঝায় তা কোন একটি সমাজের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সমাজতাত্ত্বিকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে অনুক্রমণ ও বিচ্যুতিজনিত অবস্থার মধ্যে কিছু অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন উপসংস্কৃতি (Sub-culture) অবস্থান যেহেতু স্বীকৃত সেহেতু একটি উপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক বলে গণ্য হয় তা অন্য ক্ষেত্রে বিচ্যুত বলে পরিগণিত হ'তে পারে। এছাড়াও, সম্পদ ও ক্ষমতাজনিত অসাম্য, যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করে, বিচ্যুত ব্যবহারের জন্য তা অনেকাংশে দায়ী। শারীরতত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী অবশ্য মনে করা হয় যে, মানুষ জন্মগত কিছু দৈহিক উপাদানের প্রভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এই ধরনের ব্যাখ্যা মানুষকে জন্ম থেকে অপরাধী বলে আখ্যা দেয়। ইতালির অপরাধবিজ্ঞানী সীজার লম্ব্রোসো (Cesare Lombroso) মনে করতেন যে, বেশিরভাগ অপরাধীই শারীরিকভাবে অক্ষম বা ত্রুটিপূর্ণ। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে, সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া অপরাধমূলক আচরণকে প্রভাবিত করে। লম্ব্রোসোর অমার্জিত সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে অগ্রাহ্য হ'লেও বিভিন্ন লেখার জন্মগত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাথে দুষ্ক্রিয়তার একটি সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, বিশেষ কয়েক ধরনের দুষ্ক্রিয়তার সাথে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সামান্য কিছু মিল থাকলেও ব্যক্তিত্বের গুণাবলী এবং বিশেষ করে অপরাধমূলক মানসিকতা এভাবে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয় বলে প্রমাণিত হয় নি।

একইভাবে মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বগুলিও বিচ্যুতিকে বিশেষ বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের গঠনের সাথে সম্পর্কিত করে আলোচনা করে। তবে এদের মতে বিচ্যুতির মূল কারণ হ'ল, অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা, অস্বাভাবিক জন্মগত উপাদান নয়, অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে পিতামাতার সাথে সন্তানের ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্কের ফলে গড়ে ওঠে ত্রুটিপূর্ণ চরিত্র বা সমন্বয়হীন ব্যক্তিত্ব, যার পরিণাম হ'ল বিচ্যুতি। ফ্রয়েডের (Frued) এর মতে, ব্যক্তির অহং যখন সামাজিক বাস্তবতা, ইড এবং অধিসত্তা —এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে সুসমন্বয়সাধনে ব্যর্থ হয়, তখন দেখা দেয় মানসিক বিপর্যয়। (সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।) বিচ্যুতির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সব ধরনের বিচ্যুতিকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ নয় এবং বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুত লোকদের একই ধরনের মানসিকতা রয়েছে বলেও সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন না। এমনকি কোন একটি বিশেষ ধরনের বিচ্যুতিও (যেমন—হিংসা) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঘটতে দেখা যায়। এছাড়াও কোন বিচ্যুত ব্যক্তি এবং বিচ্যুত গোষ্ঠীর (যেমন—দুর্বৃত্তের দল) মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়।

সুতরাং বিচ্যুতির কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে হ'লে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। অবশ্য সমাজতাত্ত্বিকদের অভিমতগুলিও যে এক্ষেত্রে একরূপ তা নয়, তথাপি বিচ্যুতির কিছু প্রধান সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি।

মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক সাদারল্যাণ্ড (Edwin. H. Sutherland) বিচ্যুতি ও অপরাধকে 'পার্থক্যজনিত সংঘ' (Differential association)-এর সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, বিভিন্ন উপসংস্কৃতি বিরাজমান কোন সমাজে কিছু সামাজিক পরিবেশ বা গোষ্ঠীসদস্যপদ অবৈধ কাজে উৎসাহিত করতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সুস্থ কোন ব্যক্তি কোন কুসঙ্গের প্রভাবে বিপদগামী হ'তে পারে। সাদারল্যাণ্ড মনে করতেন যে, বিচ্যুত আচরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং বিশেষ করে সঙ্গী গোষ্ঠীতে অর্জিত হয়। সুতরাং, সামাজিক নিয়মনীতিগুলি আমরা যেভাবে এবং যে পরিস্থিতিতে আয়ত্ত করে, বিচ্যুত আচরণও ঐ একই পরিস্থিতি ও প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যারা চুরি করে তারা চিরাচরত পেশায় নিযুক্ত লোকদের মতই সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্য থেকেই তা করে, যদিও তাদের কাজের পদ্ধতিটি পৃথক।

বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton)-এর মতে, বিচ্যুতি সমাজজীবন বহির্ভূত কোন

মানসিকতা বা দৈহিক উপাদানের প্রভাবে দেখা দেয় না, দেখা দেয় সমাজেরই সংস্কৃতি ও গঠন-কাঠামো থেকে। মার্টন এই প্রসঙ্গে বিধিশূন্যতার (Anomic) ধারণার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিচ্যুতিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিধিশূন্যতার ধারণাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুর্কহাইম (Emile Durkheim)। দুর্কহাইম দেখান যে, আধুনিক সমাজে প্রাচীন মূল্যবোধ ও নিয়মনীতির অবক্ষয় ঘটলেও নতুন মূল্যবোধ বা নিয়মনীতির আবির্ভাব ঘটে নি এবং বিধিশূন্যতার জন্ম তখনই হয়, যখন সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবীয় আচরণকে নির্দেশ করার মত স্পষ্ট আচার-সংহিতা থাকে না। বিধিশূন্যতাজনিত অবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ তা নির্ধারণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। দুর্কহাইম বিশ্বাস করতেন যে, বিধিশূন্যতা মানুষকে আত্মহত্যার পথে পরিচালিত করতে পারে।

দুর্কহাইমের বিধিশূন্যতার ধারণাটিকে পরিবর্তন করে মার্টন বলেন যে, কোন সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতিগুলি যখন সামাজিক বাস্তবতার বিপরীতে অবস্থান করে তখন ব্যক্তিকে অস্বাভাবিক চাপের মুখে পড়তে হয়। মার্টন এই অবস্থাকেই বিধিশূন্যতা বলে আখ্যা দেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, মার্কিন সমাজে (এবং অন্যান্য আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজেও) প্রচলিত মূল্যবোধগুলি বস্তুগত সাফল্যলাভ যেমন, অধিক অর্থ উপার্জন ও প্রতিষ্ঠা লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই সাফল্য লাভের উপায় হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কঠোর পরিশ্রমকে চিহ্নিত করে। এই বিশ্বাস অনুযায়ী প্রচণ্ড পরিশ্রমী ব্যক্তি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যতিরেকে সাফল্যলাভ করবে। কিন্তু বাস্তবজীবনে তা সবসময় সম্ভব হয় না। কেননা অনগ্রসর অংশের মানুষের পক্ষে উন্নতির সুযোগ-সুবিধাগুলি সীমাবদ্ধ থাকে। তথাপি, যাদের পক্ষে জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় না, তারা সমাজে নিন্দিত হয়। এমতাবস্থায়, সাফল্য লাভের স্বীকৃত নীতি বা পন্থার পরিবর্তে যে কোন উপায়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় ব্যক্তি বিপথগামী হয়।

মার্টন অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, সাফল্য লাভের স্বীকৃত নীতি ও মাধ্যমের মধ্যেকার দ্বন্দ্বজনিত পরিস্থিতিতে ব্যক্তি পাঁচরকমভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। প্রথমত, সমাজের বেশীরভাগ মানুষই প্রতিষ্ঠিত মূল্যমান ও সাফল্য লাভের স্বীকৃত মাধ্যমগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, যদিও সেগুলি বাস্তবিকভাবে লাভদায়ক বলে গণ্য নাও হ'তে পারে। মার্টন এই গোষ্ঠীর মানুষকে conformis বা 'অনুগামী ব্যক্তি' বলে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, 'প্রবর্তক' বা Innovators)-রা সামাজিক আদর্শগুলিকে গ্রহণ করলেও সেগুলি লাভ করার উপায় হিসেবে বে-আইনী বা অবৈধ পন্থা বেছে নেয়। চোর বা ডাকাতদল এই গোষ্ঠীভুক্ত। তৃতীয়ত, 'আচার-পরায়ণবাদী' বা (Ritualist-রা সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যমানগুলির উপর আস্থাশীল নন। তথাপি স্ব-ইচ্ছাতে তাঁরা নিয়মনীতিগুলিকে অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেন। কোন আচার-পরায়ণবাদী, যেমন, কোন আমলা, একঘেয়ে ও অলাভজনক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। আচার-পরায়ণবাদীরা নিয়মনীতির অনুসরণকেই তাদের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। চতুর্থত, 'পশ্চাদগামী' বা Retreatists-রা প্রতিযোগিতামূলক কোন কাজ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন এবং সাফল্য লাভের নীতি ও মাধ্যম—এই দু'টিকেই অস্বীকার করেন। পশ্চাদগামীরা তাঁদের অসন্তোষ প্রশমনের জন্য নেশাদ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্বশেষে, বিদ্রোহ বা rebellion যাঁদের প্রতিক্রিয়া তাঁরা শুধুমাত্র সাফল্যলাভের স্বীকৃত নীতি এবং মাধ্যমগুলিকে অস্বীকার করেন না, বিকল্প আদর্শ ও পন্থার মধ্য দিয়ে তাঁরা সমাজকে পুনর্গঠন করতে চান। বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা এই গোষ্ঠীভুক্ত। মার্টনের বিধিমূল্যতার এই তত্ত্বটি অবশ্য সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কেননা, বিপ্লবী বা আচার-পরায়ণবাদীদের আচরণ কোন্ অর্থে বিচ্যুত—তা একটি বিতর্কমূলক বিষয়। মার্টন ও সাদারল্যাণ্ডের তত্ত্বের সমন্বয়সাধনের মধ্য দিয়ে রিচার্ড ক্লোয়ার্ড (Richard A Cloward) এবং লয়েড ওলিন (Lioyd E. Ohlin) দেখান যে, কোন উপসংস্কৃতিভুক্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের আইনসম্মতভাবে সাফল্যলাভের সুযোগ যখন সীমিত থাকে তখন তারা বিচ্যুত হ'তে পারে। যেমন—কোন

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যখন বঞ্চিত হয়, তখন তাদের মধ্যে দুর্বৃত্তদলের (Gang) সৃষ্টি হয়। এইসব দুর্বৃত্তদলের সদস্যরা বস্তুগত সাফল্যের স্বীকৃত বাসনাকে কিছুটা গ্রহণ করলেও এই মূল্যবোধগুলিকে তারা নিজেদের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিচার করে। যে সমস্ত অঞ্চলে বিচ্যুত উপসংস্কৃতি (Deliquent Sub-culture) একটি অপরাধমূলক কাজকর্মেরও জ্ঞান বিস্তারে সক্ষম হয়, সেখানে একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে সাধারণ চুরির ঘটনা থেকে অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্মেও জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে এই ধরনের কর্মজাল বিস্তার সম্ভব হয় না, সেখানে দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্য লড়াই-ঝগড়া বা ধ্বংসের কৌশল গ্রহণ করে। আর যাদের পক্ষে আইনসম্মত পন্থা অথবা দুর্বৃত্তবৃত্তির কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়, তারা নেশা আসক্তির অন্ধকার জীবনে নিমজ্জিত হয়। ক্লোয়ার্ড ও ওলিন-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, অনুক্রমণ ও বিচ্যুতি দু'টি আপাতবিরোধী প্রক্রিয়া হ'লেও, এদের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমান। কেননা বিচ্যুত এবং বিচ্যুত নয়—এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে উপাদানটি সবচেয়ে বেশি পার্থক্য গড়ে দেয় তা হ'ল সাফল্যলাভের জন্য সুযোগ-সুবিধার অভাব। তবে দরিদ্র অংশের লোকদের সাফল্যলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধনবান অংশের জনগণের মত হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পক্ষান্তরে, সামাজিক বাস্তবতা দ্বারা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার মাত্রা অনেকটাই প্রভাবিত হয়। এছাড়াও, বিত্তবানদের মধ্যে অসফলতার হতাশা থাকে না—এমন নয়। যাঁরা আয়কর ফাঁকি দেন অথবা কলমজীবীরা (White Collar) যখন প্রতারণা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেন তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যেকার ব্যবধান বিচ্যুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিচ্যুত আচরণকে ব্যাখ্যা করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব হ'ল Labelling Theory বা লেবেল আরোপের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন হাওয়ার্ড বেকার (Howard S. Beeker)। এই তত্ত্ব বিচ্যুতিকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানের সমষ্টি বলে গণ্য করে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্যুতি হ'ল বিচ্যুত এবং স্বাভাবিক ব্যক্তিবর্গের মিথস্ক্রিয়ামূলক প্রক্রিয়ার একটি ফল। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন যে, কোন ব্যক্তিকে যখন বিচ্যুত বলে আখ্যায়িত করা হল তখন তার বিচ্যুত আচরণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এদের মতে মানবিক ক্রিয়াগুলি এমনিতে বিচ্যুত অথবা স্বাভাবিক নয়। পক্ষান্তরে, সমাজের কর্তৃত্বকারী বা প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গ বিচ্যুতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন এবং অন্যদের উপর তা আরোপ করেন। সাধারণত বিচ্যুতির সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত নিয়মকানুন সৃষ্টি করেন ধনীরা গরীবদের জন্য, পুরুষেরা নারীদের জন্য, বৃদ্ধরা যুবকদের জন্য, এবং সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ্যের জন্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে 'বিচ্যুত' বলে যদি কোন শিশু একবার আখ্যায়িত হয়, তখন সমাজের অন্যান্যরা তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে এবং একবার 'অপরাধী' বলে কোন লেবেল আরোপিত হ'লে সেই ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। কোন ব্যক্তির সামাজিক অনুশাসন ভঙ্গ করার প্রাথমিক ক্রিয়াকে এডুইন লেমার্ট (Edwin Lemert) প্রাথমিক বিচ্যুতি (Primary deviance) বলে আখ্যা দেন। দ্বিতীয় ধাপে সে যখন আরোপিত লেবেলটি গ্রহণ করে এবং নিজেকে বিচ্যুত বলে ভাবতে শুরু করে তখন তাকে বৃহত্তর বিচ্যুতি (Secondary deviance) বলে আখ্যা দেন।

লেবেল আরোপের এই তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত, যে প্রেক্ষাপটে বিচ্যুত লেবেলটি আরোপিত হয় তা সবক্ষেত্রে একতরফা নাও হ'তে পারে। যে আচরণটি কোন একটি সমাজে বিচ্যুতি বলে আখ্যায়িত হয়, তা সৃষ্টির পেছনে সামাজিকীকরণগত পার্থক্য, মনোভাব ও সুযোগসুবিধাগত পার্থক্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও লক্ষ্য করা গেছে। দ্বিতীয়ত, বিপথগামিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ধরনের লেবেল আরোপ কতটা দায়ী তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। প্রাথমিক বিচ্যুতি সবক্ষেত্রে ভয়ানক আকার ধারণ নাও করতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু কারণ যেমন, বিচ্যুতদের সাথে মিথস্ক্রিয়া বা অপরাধমূলক কাজের রোমাঞ্চ ব্যক্তির বিপথগামী করে তুলতে পারে। সর্বোপরি, লেবেল কিভাবে এবং কেন আরোপিত হয়, তা জানতে গেলে আধুনিক আইন-বিচার ও পুলিশ-ব্যবস্থার ইতিহাসও খুঁজে দেখতে হবে। এই সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও বিচ্যুত আচরণের কারণ বিশ্লেষণের

ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি যথেষ্ট উপযোগী। সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সমন্বিত হ'লে এই তত্ত্ব বিচ্যুতির ধরন ও প্রকৃতি ব্যাখ্যায় অধিক কার্যকর।

সামগ্রিক ভাবে বিচ্যুতি সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি দু'টি প্রধান বক্তব্য তুলে ধরে ; প্রথমত, এই তত্ত্বগুলি সমাজ অনুমোদিত এবং বিচ্যুত আচরণের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে তা ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয়ত ঃ সবগুলি তত্ত্ব স্বীকার করে যে, অপরাধমূলক কাজকর্ম সৃষ্টির পেছনে পারিপার্শ্বিকতার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থান বিচ্যুতির প্রকৃতি ও সংজ্ঞাকে অনেকটাই নির্ধারণ করে।

১১.৭ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিচ্যুতি ও সমাজ-শৃঙ্খলা

সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সর্বদেশে এবং সর্বকালে স্বীকৃত কেননা সমাজ পরিবর্তনশীল হ'লেও এমন কতগুলি মূল্যবোধ ও নিয়মনীতির প্রয়োজনীয়তা মানবসমাজে রয়েছে যা সুস্থ ও সুন্দর সমাজ জীবনযাপনের জন্য আবশ্যিক। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে তাই বিচ্যুতিকে একটি নিয়ন্ত্রিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা অনুক্রমণ আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হ'লেও বিচ্যুতি সম্পূর্ণ নঞর্থক নয়। মানবসমাজে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিসম্পন্ন উপগোষ্ঠীর অস্তিত্ব যেমন স্বীকৃত, তেমনি বিশেষ বিশেষ মূল্যবোধ ও চিন্তাভাবনার স্বকীয়তাকেও অস্বীকার করা হয় না। একটি বহুগোষ্ঠী সমন্বিত সমাজে সংখ্যাধিক্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতি থেকে পৃথক বা বিরুদ্ধ কোন প্রবণতাকে তাই 'বিচ্যুত' বলে গণ্য করা হয় না। সমাজতাত্ত্বিকগণ যেহেতু প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব প্রেক্ষাপটেই বিচার করে থাকেন (যা সাংস্কৃতিক আপেক্ষবাদ বা Cultural Relativism নামে পরিচিত), অতএব, বিচ্যুতির গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞা ঐ গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মানদণ্ডেই সম্ভব হ'তে পারে। এ ছাড়াও, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার স্বকীয়তার নিরিখেও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ (Cultural pluralsm) তখনই সম্ভব হ'তে পারে যখন সমাজ অল্পবিস্তর বিচ্যুতিকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে। সর্বোপরি, সামাজিক পরিবর্তন, সমাজ-সংস্কার এবং সামাজিক পূর্ণ গঠনের প্রক্রিয়াও 'বিচ্যুতি'র জন্ম দিতে পারে। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম বা রাজনীতির ক্ষেত্রে যখনই নতুন কোন মূল্যবোধ ও ধারণার জন্ম হয়েছে তখনই ও রক্ষণশীল সমাজ শাসকগোষ্ঠী তাকে সমাজবিরুদ্ধ বলে অবদমনের চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্যের মতো ধারাগুলি আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হ'লেও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আদর্শগুলিও সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য দাবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। একইভাবে, ভারতে জাতি ব্যবস্থার ক্ষতিকারক দিকগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল সেগুলি রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে 'বিচ্যুত' বলে আখ্যায়িত হ'লেও সামগ্রিকভাবে সামাজিক পুনর্গঠনের স্বার্থে সদর্থক।

প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা তথা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ অবশ্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বিশেষ করে এই ধরনের প্রয়াসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যথেষ্ট সাহস ও সঙ্কল্প ব্যতীত আকাঙ্ক্ষিত বিষয়কে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব নয়। এই কারণে 'বিচ্যুত' আচরণই অনেক সময় সামাজিক পরিবর্তনকে সম্ভব করে তুলতে পারে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সব ধরনের বিচ্যুতিই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। চূড়ান্ত অনুক্রমণ যেমন কোন সমাজ-কাঠামোকে অনমনীয় এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী করে তুলতে পারে, তেমনি কিছু কিছু বিচ্যুতি সমাজজীবনের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। যেমন, অত্যধিক মদ্যপান যে কোন সমাজ বা ব্যক্তির পক্ষেই ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিচ্যুতি এবং সমাজ শৃঙ্খলার ধারণাগুলিকে আমরা আপেক্ষিক বিষয় বলে ব্যাখ্যা

করতে পারে। বিচ্যুতির সৃষ্টির পেছনে যেমন, চূড়ান্ত অনুক্রমণের ভূমিকা থাকতে পারে, তেমনি চূড়ান্ত বিচ্যুতি অনুক্রমণকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সমাজ যখন অনুক্রমণের নিয়মগুলিকে কঠোরভাবে লঘু করে তখন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। যেমন কোন পরিবার যদি তার সদস্যদের আচরণকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তাহলে সঙ্গী-গোষ্ঠীতে তার ব্যবহার বিচ্যুত হ'তে পারে। সুতরাং অনুক্রমণ ও বিচ্যুতিকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা না করে এদেরকে সম্পর্কযুক্ত বলে ভাবতে হবে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, সমাজ তার সদস্যদের অত্যধিক স্বাধীনতা প্রদান করলেই সমাজ-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। এই যুক্তি অবশ্য সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতীয় কিছু উপজাতি গোষ্ঠীর (যেমন— হো, গোন্দ বা নাগা) মধ্যে প্রাক্-বিবাহ যৌন সম্পর্কের রীতি স্বীকৃত হ'লেও তা ঐ সমাজের শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে নি। এছাড়াও, ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে সমাজে অত্যধিক ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং বিচ্যুত আচরণকে যে সমাজ সহ্য করে (যেমন—হল্যান্ড), সেখানে হিংস্র অপরাধের মাত্রা যথেষ্ট কম বলে জানা গেছে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিধি সঙ্কুচিত হ'লে যে অপরাধ ও হিংসার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তা এশিয়া আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ইতিহাস থেকে জানা যায়। পরাধীনতা, বঞ্চনা ও বর্ণ-বিদ্বেষের কবলে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ ও অঞ্চল পড়েছে সেখানেই অপরাধ ও হিংসার ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং, সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য বিচ্যুত আচরণকেই শুধু দায়ী করা যায় না, বরং স্বাধীনতা, সাম্য বা সামাজিক ন্যায়ের মতো প্রশ্নে জনমানসে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হ'লে বিচ্যুতি ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সমাজ-শৃঙ্খলা ও বিচ্যুতি তাই পরস্পর বিবাদ নয়, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিচ্যুতি ও সমাজ-শৃঙ্খলার মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

১১.৮ সারাংশ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সাধারণত সেই সমস্ত উপায় ও পদ্ধতিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষিত হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। যেমন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, নেতিবাচক ও ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সচেতন ও অচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, পিতৃতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো হ'ল পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী সঙ্গী-গোষ্ঠী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন, প্রচার মাধ্যম, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত ও রাষ্ট্র।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আলোচনায় 'অনুক্রমণ ও বিচ্যুতি' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি কার্যকর হ'লে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে সমাজতাত্ত্বিকরা অনুক্রমণ বলেন। সাধারণত সামাজিক চাপ ও শাস্তির ভয়ে মানুষ সমাজস্বীকৃত রীতিনীতি অনুসরণ করে। অবশ্য, এক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। একে সামাজিক রীতিনীতিতে দীক্ষিতকরণ বা অভ্যস্তকরণও বলা যায়। তাছাড়া গোষ্ঠীগত একাত্মতা এবং রীতি ও মূল্যমানের উপযোগিতাও অনুক্রমণকে সহজ করে তোলে। অনুক্রমণ স্বভাবসিদ্ধ প্রক্রিয়া হ'লেও সামাজিক বিচ্যুতিও সমাজজীবনে স্বাভাবিক ঘটনা। সমাজস্বীকৃত ও গৃহীত পথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকেই বলা হয় বিচ্যুতি। অনুক্রমণের মত বিচ্যুতিও একটি আপেক্ষিক বিষয়। বিচ্যুতির প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধানে শারীরতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমাজতাত্ত্বিকদের মতামতও গুরুত্ব লাভ করেছে।

১১.৯ অনুশীলনী

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়? সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারগুলি আলোচনা করুন।
২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩। বিচ্যুতির সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি আলোচনা করুন।
৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   (ক) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব কি?
   (খ) অনুক্রমণের কারণগুলি কি কি?
   (গ) বিচ্যুতির সামাজিক তাৎপর্য কি?
৫। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   (ক) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি?
   (খ) বিচ্যুতি কি?
   (গ) বিচ্যুতি ও অনুক্রমণ কিভাবে সম্পর্কিত?
   (ঘ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য করুন।

১১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। টম বটোমোর ঃ সমাজবিদ্যা-তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা, পৃঃ ২২৩-২৮৯
২। অনাদি কুমার মহাপাত্র ঃ বিষয় ঃ সমাজতত্ত্ব
৩। অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ প্রসঙ্গ ঃ সমাজতত্ত্ব
৪। Anthony Giddens : Sociology
৫। Haralombos, Sociology : Themes and Perspectives.

একক ১২ □ সমাজ এক বিরামহীন প্রক্রিয়া-প্রবাহ

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ মূল পাঠ
১২.৩.১ সমাজ ও কাল-প্রবাহ
১২.৩.২ পারিপার্শ্বিক ও উপযোজন প্রক্রিয়া
১২.৩.৩ আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ঃ উত্তেজনার টান, বিরোধ
১২.৩.৪ সহযোগিতা ও বিরোধ
১২.৪ সারাংশ
১২.৫ অনুশীলনী
১২.৬ উত্তরমালা
১২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে মানবসমাজকে এক নিরন্তর পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে অনুধাবন করা যাবে। পাঠক এই সত্যটিও উপলব্ধি করবেন যে, সমাজজীবনে সহযোগিতার (Co-operation) গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি দ্বন্দ্ব-বিরোধমূলক (conflict) প্রক্রিয়াও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১২.২ প্রস্তাবনা

মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সেইসব সম্পর্কজাত নানারূপ গড়ন বা কাঠামো নিয়েই মানবসমাজ। পারস্পরিক সম্পর্কগুলি যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ বা সহযোগিতামূলক হতে পারে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুতাপূর্ণ বা বৈরীভাবাপন্ন সম্পর্কও দেখা যাবে। ফলত, মানবিক সম্পর্কের গড়ন বা কাঠামোগুলোর মধ্যে এই দ্বৈত প্রকৃতির (সহযোগিতা ও বৈরীতা) উপস্থিতি লক্ষণীয়। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হ'ল সম্পর্কগুলির অবিরাম পরিবর্তনশীলতা। তাই বর্তমান পাঠটিতে মানবসমাজকে এক বিরামহীন প্রবাহ বা পরিবর্তন প্রক্রিয়া হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। এটা জানানো হয়েছে যে, বিচিত্র গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যেই মানবসমাজের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত হয়। সহযোগিতা এবং সংঘাত-এর পাশাপাশি অন্যান্য যেসব প্রক্রিয়া সমাজপ্রবাহে বিশিষ্টতা আনে সেগুলোও এই এককটিতে আলোচিত হয়েছে।

মূল পাঠটি চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে সামাজিক প্রক্রিয়া-প্রবাহ সংক্রান্ত মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা করা হ'ল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল। চতুর্থ অংশে সামাজিক প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা বিশ্লেষণ রয়েছে।

১২.৩.১ মূল পাঠ (১ম অংশ) সমাজ ও কাল-প্রবাহ

প্রাচীনকালের মানুষের সমাজ সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি এবং এখনও বিদ্যমান অতি-প্রাচীন জীবনযাত্রা অনুসারী আদিবাসীদের সম্পর্কে যা জানতে পারছি তাতে আমরা আধুনিক সমাজের মানুষেরা বিস্মিত বোধ করি। ঐ সব সমাজজীবন আমাদের কাছে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক মনে হয়। আমরা মনে করি ওইগুলি হ'ল মানুষের অসভ্য ও বন্য অবস্থার জীবনধারা। আবার, আজ থেকে অনেক শতাব্দী পর মানুষের সমাজ কি হবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এই বিংশ শতকেই গত তিন-চার দশকের ব্যবধানে আমদের সমাজজীবন ধারায় যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, তাতে আগামী দিনের সমাজের সম্ভাব্য চালচিত্র নিয়ে কিছু না বলাই সঙ্গত। কিন্তু যে কথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি তা হ'ল এই যে, সমাজকে বুঝতে হয়, সমাজের বিশ্লেষণ অনুশীলন করতে হয়, এক অন্তহীন প্রবাহ হিসেবে, এক নিরবচ্ছিন্ন মানবজীবন ধারা হিসেবে।

আগামী দিনে পরিবার বা রাষ্ট্র, মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা, কিংবা অন্য কোন সম্পর্ক বা সম্পর্কের কাঠামো কিরূপ বৈচিত্র্য নিয়ে কি মাত্রায় প্রকাশ পাবে তা নিয়ে কোন কল্পচিত্র উপস্থাপিত না করাই শ্রেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা নিঃশর্ত ভবিষ্যৎবাণী তো করতেই পারেন না; শর্তাধীন প্রস্তাব রেখে আগামী দিনের সমাজের সম্ভাব্য প্রবণতা সম্পর্কে যা বলা হয় তাও অনেক ক্ষেত্রেই ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে রবার্ট ম্যাকআইভার ও চার্লস পেজ বলেন, "Men have in all ages played with social prophecies, but the distantly born future has always outwilled their dreams." (অর্থাৎ মানুষ সকল যুগেই সামাজিক ভবিষ্যৎবাণী করতে সচেষ্ট থেকেছে, কিন্তু বার বার দেখা গেছে দূরের ভবিষ্যৎ বর্তমানে রূপান্তরিত হওয়া মাত্রই মানুষের স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে, যার ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হচ্ছে)

সমাজের দ্রুতগতির পরিবর্তনের ফলে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি হয়। কেননা, পরিবর্তন-প্রক্রিয়া যত দ্রুতগতির হবে এবং পরিণামে সমাজে যতই নতুনত্ব ও মৌলিক কাঠামোগত অভিনবত্ব দেখা দেবে ততই সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যগুলো ক্ষণস্থায়ী পরিগণিত হবে। যেমন এক সময়ে (সত্তরের দশকে) আলভিন টফলার (Alvin Toffler) নামে আমেরিকার এক সমাজতাত্ত্বিক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, আমেরিকার মত আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজগুলিতে অচিরেই "পরিবার" নামক সামাজিক ব্যবস্থাটি বিলুপ্ত হবে। কিন্তু পরিবার-এর বিকল্প ব্যবস্থার প্রতি পশ্চিমী সমাজের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি এত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে যে টফলার মহাশয় নিজে তাঁর বক্তব্য সংশোধিত করেছেন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সংখ্যার পশ্চিমের মানুষেরা এখনও পরিবার ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে আছে। পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করছেন, পরিবার যতই ক্ষুদ্রায়তন হোক, এখনও তার গুরুত্ব অপরিসীম। আবার একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই হয়ত সমাজতত্ত্বে পরিবার সংগঠন নিয়ে আরও নতুন কোন চিন্তা উপস্থাপিত হবে, নতুন কোন ব্যাখ্যা গুরুত্ব পাবে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ব্যাপকতা ও তার পরিণতি এতটা মারাত্মক নয়। এমনকি সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছু জ্ঞান-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও (যেমন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ততটা সমস্যাসঙ্কুল নয়। মনোবিদ্ জানেন যে, গত কয়েক শ'বছরের মধ্যেও মানুষের ভাবভঙ্গী বা প্রকৃতির ক্ষেত্রে তেমন বড় মাপের ব্যবধান তৈরি হয়নি। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক যে ক্ষেত্রে বিচরণ করেন সেখানে গবেষণা চালানোর কালেই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যে কোন আধুনিক সমাজের সামাজিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির উল্লেখ করা যায়। এইসব ক্ষেত্রে গবেষকগণ যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এই কারণে দেখা যায়, প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা যেমন প্রাকৃতিক বা ভৌত বিষয় সংক্রান্ত নানাপ্রকার বিধি (যেমন নিউটনীয় বা আইনষ্টানীয় বিধিসমূহ) রচনা করতে পারেন, সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে সামাজিক বিষয়সংক্রান্ত অনুরূপ সর্বজনীন বিধি (universal laws) রচনা প্রায় অসম্ভব।

মানবসমাজে পরিবর্তনই হ'ল একমাত্র নিত্য বা নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু সেই নিয়মিত ঘটার বিষয়টিকেও যেন কোন নির্দিষ্ট বিধি বা নিয়মে বাঁধা যায় না। পশ্চিমের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক কার্ল মার্কস সমাজ পরিবর্তনের বিধি রচনার চেষ্টা করেছিলেন, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, সামাজিক শ্রেণীগুলোর নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর মধ্য দিয়েই সমাজের পরিবর্তন ঘটে থাকে। পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মত সমাজে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াও নিত্য। এই হিসেবে মনীষী কার্ল মার্কস মানব-জীবনধারার একটি প্রাথমিক সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কিন্তু দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগুলো বিভিন্ন দেশে ও কালে কি ধরনের রূপ নেবে, কোথায় কখন কি গতিতে পরিবর্তন ধারাটি পরিচালিত হবে, মানবগোষ্ঠীর তরফে সচেতন সংগঠিত প্রচেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো কতটা সম্ভব এইসব বিষয়ে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট কিছু বলার উপায় নেই বললেই চলে। (পরবর্তী কোন এককে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হবে)।

সমাজকে সামাজিক প্রক্রিয়াগত কাল-প্রবাহ (time process) হিসেবে গণ্য করতে হয়। সমাজের অস্তিত্ব কালক্রম হিসাবে। কোন অনমনীয় বিধির ভিত্তিতে কিংবা কোন অগ্রকথন (Prediction)-এর সাহায্য নিয়ে সমাজ-জীবনধারা অনুধাবনের চেষ্টা না করাই সঙ্গত। ম্যাকআইভার ও পেজ যথার্থই বলেছেন, "Society exists only as a time-sequence. It is a becoming, not a being; a process, not a product." অর্থাৎ সমাজ বিদ্যমান থাকে কাল-পরম্পরা অনুযায়ী; সমাজ হ'ল যেন মনুষ্য বিষয়ক অনেক কিছু হ'য়ে চলা বা হ'য়ে ওঠা (becoming) ; সমাজ কোন অবস্থাতেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন সত্তা (being) নয়। সমাজ এক নিরন্তর প্রক্রিয়া (process) ; সমাজ কোন উৎপন্ন দ্রব্য (product) কিছু নয়। সমাজকে কোন প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির তৈরী কোন ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা যাবে না। সমাজ হ'ল সামাজিক সম্পর্কের প্রবাহ। মানুষে মানুষে পারস্পরিক যোগাযোগজনিত, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াজনিত, সামাজিক (অর্থাৎ একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন যেসব মানুষ তাদের) দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহযোগিতাজনিত যে অন্তহীন প্রক্রিয়া-প্রবাহ, সেই কালগতক্রম বা বহমানতা হিসেবেই সমাজকে বুঝতে হবে।

১২.৩.২ মূল পাঠ (২য় অংশ) পারিপার্শ্বিক ও উপযোজন প্রক্রিয়া

জীবজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়া নির্দেশ করতে গিয়ে জৈবিক গঠনগুলোর সঙ্গে তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের নিত্য মিথষ্ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠনগুলোর বিকাশ ঘটতে থাকে; প্রতিটি গঠন-একক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় রসদ/শক্তি আহরণ করে তারা অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে। বা যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন বা প্রাথমিক স্তরে গঠনগুলো বিশেষভাবেই পারিপার্শ্বিক-নির্ভর। ওই স্তরে যে অভিযোজন-প্রক্রিয়া (adaptation) লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল মূলত জৈবিক প্রয়োজনগত। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে যখন মানুষ তার সমাজজীবন গড়ে তুলেছে তখনও পারিপার্শ্বিক-এর সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়া অব্যাহত। কিন্তু সামাজিক মানুষ ও তার পরিবেশের সঙ্গে যে মিথষ্ক্রিয়া সেখানে উত্তরোত্তর পরিকল্পনামাফিক সচেতন অভিযোজন-উপযোজন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। সামাজিক মানুষ তার বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী করে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার চেষ্টা করে। যখন যে অবস্থায় মানুষ বাস করছে যথাসম্ভব সেই অবস্থার উপযোগী করে নিজেকে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখা এটা মানুষের প্রকৃতি নয়। পারিপার্শ্বিকের কাছে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে না। মানুষের প্রকৃতি হ'ল নিজের প্রয়োজন, নিজের উদ্দেশ্যসাধনে, নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশের তাগিদে পারিপার্শ্বিককে ব্যবহার করা, পরিবেশের মধ্যে সহায়ক প্রক্রিয়া চালু করা। পারিপার্শ্বিক-এর সঙ্গে তার উপযোজন-অভিযোজন (Accommodation and adoptation) প্রক্রিয়াগুলোই তার জ্ঞান-বিজ্ঞান এর ভিত্তি। জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর বিকাশ তার সমাজ ও সভ্যতার

নিত্যনতুন স্তর গঠনপ্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। প্রকৃতির রহস্যগুলো অনুধান-উদ্‌ঘাটন-এর যে প্রক্রিয়া তা হ'ল তার জ্ঞান। অতঃপর সে জ্ঞানের ভিত্তিতে পারিপার্শ্বিক-এর বাধাগুলো অতিক্রম করে কিংবা পরিবেশকে নিজ প্রয়োজনমত ব্যবহার করে যে উপযোজন (adjustment/accommodation) ও অগ্রগমন (progress) প্রক্রিয়া চালু রাখা হয় তাহ'ল তার বিজ্ঞান। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেই মানুষের সমাজের নিরবচ্ছিন্নতা; যেমন কিনা পারিপার্শ্বিক-এর সঙ্গে উপযোজন-অভিযোজন প্রক্রিয়া বজায় রেখেই মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর বিকাশ।

পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক কেবল বিশ্ব-প্রকৃতিকে নির্দেশ করে না। একজন মানুষ বা একটি গোষ্ঠীর কাছে অন্যান্য মানুষেরা ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো পরিবেশ এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে কাজ করে। তাই এতক্ষণ যে উপযোজন-অভিযোজন প্রক্রিয়ার কথা বলা হ'ল তা মানুষে-মানুষে সম্পর্ককেও অন্তর্ভুক্ত করছে। সামাজিক মানুষের যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রক্রিয়া, আন্তঃমানবিক সম্পর্কের যে প্রবাহ, তার সবটাই যে মিলনাত্মক বা সহায়ক প্রক্রিয়া নয় তা অবশ্যই বোঝা প্রয়োজন। উপযোজন বা অভিযোজন প্রক্রিয়াতে মতান্তর, বিভেদ বা বিরোধগত ধারার অন্তর্ভুক্তির অবকাশ রয়েছে। সামাজিক ক্রিয়া ও মিথষ্ক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসামঞ্জস্য উভয় প্রকার ধারা ও প্রবণতাকে নির্দেশ করে। মানুষে-মানুষে সম্পর্কগুলো সবই প্রীতিপ্রদ, সুখ-নির্দেশক এটা মনে করার কোন কারণ থাকতে পারে না। প্রকৃতি যেমন সাহায্য করে আবার প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে এবং সেই হিসেবে প্রকৃতি-পরিবেশ-এর সঙ্গে উপযোজন হ'ল দ্বন্দ্ব-মিলন-এর যুগপৎ প্রক্রিয়া। একইভাবে বলা যায়, মানুষ তার সামাজিক পারিপার্শ্বিক-এর সঙ্গেও যেভাবে উপযোজিত হয় তাতে সংঘাত ও সামঞ্জস্য উভয় প্রকার প্রক্রিয়ারই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে।

সমাজে বন্ধুত্ব, মিত্রতা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে বৈরীতা ও সংঘর্ষ। দু'জন মানুষের সম্পর্ক আজীবন বন্ধুত্বের এমন দেখা যায় না; মাঝে মাঝেই বিরহ-বিচ্ছেদ বা অভিমান-অভিযোগের পালা দেখা যায়। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। বিবাহ-বিচ্ছেদ-এর মত চরম অবস্থা ছাড়াও এই সম্পর্কের মধ্যে নানা মাত্রার ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সখ্যতার ভাব থাকবে, কলহ মোটেই থাকবে না এটা ভাবা যায় না। আর কিছু না হোক, দৈনন্দিন জীবন নানা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার কালে, নানান উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি-কৌশল অবলম্বন-এর প্রশ্নেই মতান্তর ও মতবিরোধ দেখা দেয়। এটাই স্বাভাবিক সামাজিক অবস্থা। অতএব পারিপার্শ্বিক-এর সঙ্গে উপযোজন প্রক্রিয়ার মিলন ও সংঘাত-এর মিত্রতা ও বিরোধ-এর এক মিশ্র-প্রবাহ প্রকাশ পাবে।

সামাজিক উপযোজন অভিযোজন প্রক্রিয়ার এই দ্বান্দ্বিক প্রকৃতিটি উপলব্ধি করার সহজতম উপায় হ'ল রাজনৈতিক সম্পর্কে উদাহরণ নির্দেশ করা। রাজনীতির উৎসই হ'ল বহুমুখিতা, ভিন্নতা ও ব্যবধান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, রাজনীতির অর্থই হ'ল বহুত্ব বৈচিত্র্য থেকে অদ্ভুত নানাবিধ দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর উপযোজন (Process of accommodating conflict that stems from deversity)। মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনীতি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর ক্রিয়া বা কোন সীমিত ক্ষেত্রের ক্রিয়া নয়। রাজনীতি হ'ল সামাজিক মানুষের এক সর্বজনীন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা যেমন থাকে (যেমন দু'টি বা তথোধিক দল-এর কোয়ালিশন) তেমনি সংঘাত ও বিরোধই হ'ল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রকৃতি। একটা স্তরে বা সময়ে যেমন মিলনের ও মৈত্রীর প্রাধান্য থাকতে পারে তেমনি অন্য পর্যায়ে বা ভিন্ন সময়ে প্রাধান্য পেতে পারে বিরোধ ও সংঘর্ষ। সামাজিক প্রক্রিয়ার সামগ্রিক উপযোজনগত চরিত্রটি ঠিকমত অনুধাবন করার জন্য মানুষে-মানুষে সম্পর্কের অভ্যন্তরস্থ এই টান টান অবস্থা (Strain) বা ঘাত-প্রতিঘাত-এর ধারাটি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১২.৩.৩ মূল পাঠ (৩য় অংশ) আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ঃ উত্তেজনার টান; বিরোধ

সমাজ যেন আন্তঃমানবিক সম্পর্কের জটাজাল। মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর গড়ন জটিল ও বিচিত্র ধরনের। জটিলতার উৎস নিহিত রয়েছে এইসব সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত-এর মধ্যে। বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে সম্পর্কগুলোর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে। মানুষের নানাবিধ সম্পর্কের জটিল বৃত্তাকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, কখনও বা আপাত সরল-রৈখিক প্রবাহ হিসেবে, সমাজ ও সামাজিকতার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। একদল সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন সমাজের এইসব আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলো, সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন ধরনগুলো, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাই সমাজতত্ত্বের মূল বিষয়। পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত নিত্য নানা ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে, কোন ক্ষেত্রে বা উদ্দীপনা আনে, আবার কোথাও হয়ত হতাশার, গ্লানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিরোধ, সহযোগিতা বা উত্তেজনার টান (strain) সৃষ্টিকারী এই সম্পর্কগুলো সুনির্দিষ্টরূপে শ্রেণীবিভক্ত (classification) করে উপস্থাপিত করা সমাজতাত্ত্বিকের প্রধান দায়িত্ব বলে বিবেচিত হতে পারে। সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে যাঁরা অবয়ববাদী গোষ্ঠী নামে (formal school) পরিচিত তাঁরা এরূপই বিবেচনা করেন। জর্জ সিমেল, ফার্দিনান্দ টয়েনিস, লিওপোল্ড ফন হ্বিজে প্রমুখ জর্মন সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মতে মানবিক সম্পর্কের রূপ বা আকারগুলোই তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তঃমানবিক সম্পর্ক থেকে যে বিশেষ-বিশেষ বিন্যাস বা নির্মিতির প্রকাশ ঘটে, যে বিচিত্র গঠন বা অবয়ব-এর বিকাশ হয়, সেগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সমাজ-জীবনধারার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

ফন হ্বিজে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ত্রিবিধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দেশ করেছেন। মিলনাত্মক সম্পর্ক (Associative), বিচ্ছেদমূলক সম্পর্ক (disassociative) এবং মিশ্র (Mixed) সম্পর্ক—এরূপ তিনটি শ্রেণীতে মানবিক সম্পর্কগুলোকে ভাগ করা হয়েছে। সম্পর্কগুলো প্রক্রিয়া-প্রবাহ সৃষ্টি করে। আবার সম্পর্ক বলতে বোঝায় মানবিক ক্রিয়াকলাপগত ধারা। সুতরাং ক্রিয়া থেকেই প্রক্রিয়া, প্রবাহ (Processes are actions); ক্রিয়া থেকেই সম্পর্ক বা সম্পর্কের কাঠামো (relating through action)। কোন ক্রিয়া সদর্থক, সহযোগিতাপূর্ণ হতে পারে—হতে পারে—বন্ধুত্ব বা মিত্রতা সৃষ্টিকারী হতে পারে। তখন সেগুলি Associative বা মিলনাত্মক সম্পর্ক হিসেবে চিহ্নিত হবে। আবার, ক্রিয়াকলাপগুলো শত্রুতার প্রক্রিয়া চালু করতে পারে—বিরোধ বা ব্যবধান সৃষ্টিকারী সম্পর্ক হিসেবে অভিহিত হ'তে পারে। তখন সেগুলিকে বিচ্ছেদমূলক (disassociative) সম্পর্ক/প্রবাহ বলা হবে। কিন্তু, প্রায়শই দেখা যাবে, কোন সম্পর্কের ধারা বা প্রবাহ চরম রূপ পরিগ্রহ করছে না। কিছু সময় আগেও যা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তা বিরোধমূলক হয়ে উঠেছে। নানা কারণে পুরানো সখ্যতা নষ্ট হতে পারে, বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন দেখা দিতে পারে। নতুন কারো আগমনে বা নূতন কোন উপাদানের আবির্ভাবে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। যেমন ঘটে নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধুলাভ হ'লে পুরোনোদের প্রতি অবহেলা, উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শনের প্রবণতার ক্ষেত্রে। আবার এমনও হয় দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কোন তৃতীয় পক্ষের আগমনে। আর এই ধরনের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী স্তরগুলো মিশ্র সম্পর্ককে (মিলন ও বিচ্ছেদের অন্তর্বর্তী অবস্থা) নির্দেশ করে।

মিলনাত্মক বা Associative সম্পর্ক হ'ল সামাজিকতা প্রসারকারী সম্পর্ক। তাই সমাজজীবনে এই ধরনের সম্পর্কগুলো সদর্থক সম্পর্ক—নানাপ্রকার সহযোগিতা, সখ্যতা ও সহমর্মিতার মধ্যে এরূপ সম্পর্কের প্রকাশ। ফন হ্বিজে যথার্থই বলেছেন যে, মিলনাত্মক প্রবণতারও বিভিন্ন মাত্রা বা স্তর আছে। যেমন, এরূপ সম্পর্কের প্রাথমিক স্তরকে বলা যায় Advance বা আগ্রহ প্রকাশ—অর্থাৎ সম্পর্ক গড়ে তুলতে এগিয়ে আসা। অতঃপর, নিত্যনতুন মাত্রায় সেই সম্পর্ক উন্নত ও গভীর হতে পারে। যেমন, অপেক্ষাকৃত উন্নত সম্পর্কের স্তর হ'ল Adjustment বা সমন্বয়সাধন, যাকে উপযোজন প্রক্রিয়াও বলা যায়। আরও উন্নত মাত্রা হ'ল Accordance

বা মতৈক্যে পৌঁছানোর চেষ্টা, ক্রিয়াকলাপে সঙ্গতিসাধনের উদ্যোগ। ফন হ্বিজের মতে, মিলনাত্মক প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ ধাপ বা মাত্রা হ'ল পূর্ণাঙ্গ মিলন, যাকে বলা যাবে Amalgamation বা একত্রীকরণ, সংযুক্তিকরণ।

বিচ্ছেদমূলক বা disassociative সম্পর্ক হ'ল সামাজিকতা প্রসারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নানাপ্রকার বিরোধমূলক সম্পর্ক। ফন হ্বিজের মতে এই ক্ষেত্রেও দেখা যাবে বিরোধের বিভিন্ন স্তর বা মাত্রা রয়েছে। যেমন, বলা যায়, প্রতিযোগিতা হ'ল প্রাথমিক স্তরের বিরোধ। প্রতিযোগিতার ধরন অনুযায়ী বিরোধের মাত্রা বাড়তে পারে। দূরত্ব (Social distance) বৃদ্ধি পাওয়া বিচ্ছেদমূলক সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত উন্নত মাত্রা। Conflict বা দ্বন্দ্ব হ'ল বিরোধের সর্বোন্নত মাত্রা যা War বা যুদ্ধের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

যে কোন সমাজেই উপরিউক্ত মিলনাত্মক ও বিচ্ছেদমূলক সম্পর্কের বিভিন্ন স্তরের এক জটিল আবর্ত লক্ষ্য করা যাবে। কখন কোন্ সম্পর্ক এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাবে তা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। এই কারণেই মিশ্র সম্পর্কের প্রকাশ হয় ঘন ঘন। ব্যক্তিমানুষের মনোজগতের প্রক্রিয়াগুলোও এর সঙ্গে যুক্ত। যেমন, বলা যায়, সম্পর্কের ধরন কতটা মিলনাত্মক হবে তা নির্ভর করবে কতকগুলি পূর্বশর্তের উপর। আপোষ করার আকাঙ্ক্ষা, সহ্য করা প্রবণতা বা সহনশীলতা, ভিন্ন মত উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি পূর্বশর্ত পূরণের মধ্য দিয়েই মিলনাত্মক সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। বলা বাহুল্য, এগুলি না থাকলে এবং এইসব প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা প্রকট হ'লে সম্পর্ক বিচ্ছেদমূলক হ'তে থাকবে। এই কারণেই সমাজের অভ্যন্তরে, সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার সর্বক্ষণেই উত্তেজনার টান (Strain) থাকে।

মিলন ও বিচ্ছেদ-এর যুগপৎ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজ-জীবনধারার প্রকাশ। কোন একটি প্রক্রিয়াই দীর্ঘসময় ধরে একভাবের প্রবাহ সৃষ্টি করে না। নানান উদ্দীপক, উত্তেজনার মিশ্রণ ও ঘাত-প্রতিঘাত-এর মধ্য দিয়ে সমাজের, সামাজিক সম্পর্কের, সামাজিকতার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। মিলনেও উদ্দীপনা, বিচ্ছেদেও উত্তেজনা—স্থির, অচঞ্চল কোন সামাজিক সম্পর্ক হয় না। যে সমাজকে আমরা স্থির, অচলায়তন বলি সেটা কথার অলঙ্কার মাত্র, পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রার নির্দেশ মাত্র।

১২.৩.৪ মূল পাঠ (৪র্থ অংশ) সহযোগিতা ও বিরোধ

মিলনাত্মক সম্পর্কের সর্বপ্রধান রূপ হ'ল co-operation বা সহযোগিতা। বিচ্ছেদমূলক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ হ'ল বিরোধ-সংঘর্ষ (conflict)। 'সমাজ' উভয় প্রকার সম্পর্ক-প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। কেবলমাত্র সহযোগিতা কিংবা কেবলমাত্র বিরোধ নিয়ে সমাজজীবন প্রবাহিত হয় না। অবিরাম সংঘর্ষের অর্থ হ'ল সমাজজীবনের বিলুপ্তি। আবার নিরবচ্ছিন্ন, অবিমিশ্র, সহযোগিতার ধারণাটি সমাজজীবনের বাস্তবসম্মত ধারণা নয়। যাঁরা বলেন বিরোধ হ'ল ধ্বংসের (conflict is the road to death) পথ এবং সহযোগিতা হ'ল অস্তিত্ব বজায় রাখার রাস্তা (co-operation is the path of survival), তাঁরা বিষয়টির গভীর বিশ্লেষণে অপারগ। উপরিতলগত বিচারে মনে হবে, যেহেতু সংঘর্ষ বা সংঘাত সামাজিকতা বিনাশকারী প্রক্রিয়া সেই হেতু সহযোগিতাই হ'ল একমাত্র সমাজগত প্রক্রিয়া। কিন্তু উপরিতল থেকে গভীরে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে, সহযোগিতার পাশাপাশি সংঘর্ষমূলক প্রক্রিয়া বিরাজ করছে। প্রাথমিকভাবে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই নিজেদের প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু, নানা কারণে সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ দেখা দেয়। এটাই বাস্তব। দ্বন্দ্ব-বিরোধ নিয়ন্ত্রণ করা এবং সংঘাতমূলক ক্রিয়া প্রশমিত করার মাধ্যমে মানুষ সহযোগিতা তথা মিলনাত্মক ক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থই হ'ল বিরোধ বা সংঘাতমূলক ক্রিয়ার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া, বিরোধমূলক প্রক্রিয়ার বাস্তবতাকে স্বীকার করা।

সমাজতাত্ত্বিকগণ সহযোগিতা ও বিরোধকে সমাজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেন। তাঁদের মতে এই

দু'টি হ'ল মানবজীবনের সর্বজনীন উপাদান। সামাজিক মানুষের বহুবিচিত্র এদের যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে। ম্যাক্আইভার ও পেজ (MacIver & Page) বলেন, "Co-operation crossed by conflict marks society wherever it is revealed" অর্থাৎ যেখানেই সমাজ সেখানেই দেখা যাবে সহযোগিতা ও বিরোধ মুখোমুখি অবস্থান করছে।

সহযোগিতার বিভিন্ন রূপ আছে আবার দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এরও ধরন থাকে। সহযোগিতা প্রত্যক্ষ রূপ নেয় খেলাধূলা, পূজা-অর্চনা, শ্রমদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। যে কাজ ব্যক্তির পক্ষে একা সম্পন্ন করা অসম্ভব সেই ধরনের কাজ স্বাভাবিক, অনিবার্যভাবে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা গড়ে ওঠে। অপ্রত্যক্ষ সহযোগিতা দেখা যায় বৃহদায়তন কর্মক্ষেত্রে, যেমন বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র, কল-কারখানাগুলিতে। যাকে আমরা Division of Labour বা শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া বলি তার মধ্য দিয়েই অপ্রত্যক্ষ সহযোগিতা (indirect co-operation) প্রকাশ পায়। একইভাবে দেখা যায় দ্বন্দ্ব-বিরোধও প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উভয় প্রকাশ হতে পারে (একক ২ দ্রষ্টব্য)।

সমাজ-জীবনধারা দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার মিশ্রণে পরিচালিত মানবিক সম্পর্কের জটিল ধারা। বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী সি. এইচ্ কুলি (Cooley) বলেন, "...Conflict and co-operation are not separable things, but phases of one process which always involves something of both." (অর্থাৎ বিরোধ ও সহযোগিতা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দু'টি বিষয় নয়; বরং দেখা যাবে একই প্রক্রিয়ার মধ্যেই উভয়ে বিদ্যমান, প্রক্রিয়াটি এক একটি পর্যায়ে তাদের পূর্বাপর, কিংবা যুগপৎ উপস্থিতি) অভিন্ন উদ্দেশ্য বা অভিন্ন স্বার্থ থাকলে সহযোগিতা যেমন গড়ে উঠতে পারে তেমনি অনুরূপ লক্ষ্য বা স্বার্থপূরণের সুযোগ সীমিত হ'লে বিরোধও দেখা দিতে পারে। তাই কোন্ অবস্থাটা বিরোধ সৃষ্টি করবে, কি অবস্থায় কতটা সময় ধরে সহযোগিতা থাকবে এটা নিশ্চিত করে আগে থেকেই বলা যায় না।

ইতর প্রাণীদের মধ্যেও একসঙ্গে থাকার, পরস্পরের সহায়তা নিয়ে যূথবদ্ধ হয়ে থাকার সহজাত প্রবণতা দেখা যায়। সুতরাং, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবল উপস্থিতি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই গণ্য। মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক (by nature social) বলার কারণটিও তাই সহজেই বোধগম্য। Co-operation বা সহযোগিতার প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে সমাজজীবনের কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, conflict বা দ্বন্দ্ব-বিরোধের প্রক্রিয়াটিও অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়, সমাজবহির্ভূত কোন ঘটনা নয়। এটা ঠিকই যে, বিরোধ এবং সহযোগিতা হ'ল দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়া। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, কিভাবে উভয়কে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা যাবে; সমাজজীবনের স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে নির্দেশ করা যাবে। এর উত্তরে বলা যায় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা যেমন আমাদের মনোজগতের স্বাভাবিক ধারা, আশা-নিরাশা যেমন ব্যক্তিজীবনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা, তেমনি সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াগুলোও সমাজের বাস্তব অবস্থাকেই নির্দেশ করে।

ছাত্র-ছাত্রীরা যখন শ্রেণীকক্ষে ধীরস্থির ভাবে নিবিষ্ট মনে শিক্ষকের ভাষণ শোনে, শিক্ষক যেভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন তা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বে সুশৃঙ্খলভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের আচরণকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যাবে। আবার, যখন কোন অফিসে কর্মচারীরা নিজ নিজ দায়িত্ব সযত্নে পালন করে চলেন তখন তাঁরা একে অপরের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না থাকলেও বাস্তবে পরোক্ষ সহযোগিতা (indirect co-operation) করছেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বা কর্মচারীদের মধ্যেকার এই সম্পর্ক যে কোন মুহূর্তেই বিরোধমূলক চরিত্র পরিগ্রহ করতে পারে। আসলে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখনই মনে করে যে তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন তথা বিপরীত ধরনের তখন তাদের ক্রিয়াকলাপ পরস্পরের ক্ষতিসাধনকারী বা বিরোধমূলক হয়ে উঠবে। উদ্দেশ্য অভিন্ন হ'লেও বিরোধ হতে পারে; যেমন, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার লক্ষ্যে। এইসব ক্ষেত্রে বিরোধিতার রূপকে বলা প্রতিযোগিতা (competition)। প্রতিযোগিতা যখন বিকৃত রূপ নেয় অর্থাৎ যখন অসাধু উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চলে তখন তা 'Conflict' বা প্রকৃত

দ্বন্দ্ব-বিরোধের পথ নেয়। এইভাবে, সমাজে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াগুলো পাশাপাশি চলে। স্বার্থগুলো, উদ্দেশ্যগুলো, অনন্য চরিত্রের এবং বিপরীতধর্মী হলেই সংঘাত-সংঘর্ষ তথা দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রক্রিয়া শুরু হবে। কোন সম্পর্ক সহযোগিতার স্তর থেকে সহজেই প্রতিযোগিতার স্তরে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আর প্রতিযোগিতা মানেই এক ধরনের অ-প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব। সুতরাং সমাজ হ'ল দ্বন্দ্ব-মিলন-এর এক জটিল প্রবাহ। সহযোগিতা ও বিরোধ-এর সম্মিলিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কগুলো।

সামাজিক প্রক্রিয়া-প্রবাহ-এর দ্বান্দ্বিক প্রকৃতির কথা মনে রেখে অতঃপর যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তা হ'ল সমাজ-জীবনধারায় 'বিরোধ'-এর গুরুত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত। অনেকে বলতে পারেন 'বিরোধ' বাস্তব ঘটনা হ'লেও তা কাম্য নয়। যা বাস্তব তা কাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে (ঠিক যেমন কাঙ্ক্ষিত বিষয় মাত্রেই বাস্তবায়িত বিষয় নয়)। যেহেতু দ্বন্দ্ব-বিরোধ কাম্য বা কাঙ্ক্ষিত নয়, সুতরাং বাস্তব হলেও তার বিলুপ্তি প্রয়োজন। সামাজিক মানুষ সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করবে, বিরোধের কারণগুলো নির্মূল করবে। সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য শাস্তি পেতে হয় যেই যুক্তিতে সেই একই যুক্তিতে দ্বন্দ্ব-বিরোধমূলক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সম্ভব হলে নির্মূল করা প্রয়োজন। যুক্তিটি হ'ল সামাজিকতার (sociality) শক্তিকে সুদৃঢ় করা, সমাজের সকলেরই বিকাশের পথ মুক্ত রাখা। কিন্তু, ভিন্ন যুক্তি হাজির করে বলা যেতে পারে, বিরোধ মানেই সামাজিকতা বিনাশকারী শক্তি নয়। দ্বন্দ্ব-বিরোধ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে তার মুক্তির, তার উন্নতির পথকেই সুগম করে তুলতে পারে। যেমন, বলা যায় competition বা প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়াকলাপের কথা। প্রতিযোগিতা সমাজের সুস্থ, স্বাভাবিক, ক্রিয়াকলাপ হিসেবেই চিহ্নিত। প্রতিযোগিতা না থাকলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটে না। ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-এর মধ্য দিয়ে বুদ্ধি ও যুক্তি তীক্ষ্ণতর হয়, নতুন ও বিচিত্র পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সমস্যা হ'ল প্রতিযোগিতার প্রকৃতি নিয়ে, সংঘাত-এর মাত্রা নিয়ে। প্রতিযোগিতা হ'ল অ-প্রত্যক্ষ বিরোধ (indirect conflict)। যে কোন সময় এই পরোক্ষ বিরোধ সন্দেহ, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদির মাত্রা বৃদ্ধি করে শত্রুতামূলক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। প্রতিযোগিতা কোন্ মাত্রায় পৌঁছে Violent বা হিংস্র ও ধ্বংসাত্মক রূপ নেবে তা কোন সমাজই আগে থেকে নির্ধারণ করতে পারে না। তাছাড়া, একদল মানুষ বলতে পারেন, যেমন যারা বিপ্লববাদী, বিরোধ প্রত্যক্ষ এবং হিংসাত্মক হ'লেও তাকে অস্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা, সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যারা শোষণ, দমন-পীড়ন ও অত্যাচার চালিয়ে আসছে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীরা স্বাভাবিক যুক্তিতেই সশস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক সংগ্রমে লিপ্ত হতে পারে। শেষ পর্যন্ত কোন সমাজ ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া সমর্থন করুক বা না করুক বিরোধিতা ও সংঘাত-এর গুরুত্ব সংক্রান্ত এইসব যুক্তি, পাল্টা-যুক্তি ও মতপার্থক্য এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে সহযোগিতা ও বিরোধ উভয়ই সমাজ-জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১২.৪ সারাংশ

১ম অংশ ঃ সমাজ এক অন্তহীন প্রবাহ। তাই সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে কোন ভবিষ্যৎবাণী না করাই সঙ্গত। বিশেষত, বর্তমান যুগে সামাজিক সম্পর্কগুলো এত দ্রুত পাল্টাচ্ছে যে সমাজতাত্ত্বিক সেই সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। অনেক সময় দেখা যাবে গবেষণা শেষ হওয়ার কালেই সিদ্ধান্তগুলো 'সেকেলে' (obsolete) হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং পরিবর্তনই একমাত্র নিত্য ঘটনা। পরিবর্তনের কারণও নানাবিধ এবং নতুন নতুন ধরনের। তাই সামাজিক পরিবর্তন নিয়েও কোন বিধির উপস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মনে হয়। সমাজ বলতে কেবল এটাই নিশ্চিন্তে বোঝান যায় যে, এটা হ'ল মানুষে-মানুষে অবিরত মিথস্ক্রিয়াজনিত এক অন্তহীন প্রক্রিয়া-প্রবাহ।

২য় অংশ ঃ সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ও বিবর্তন প্রক্রিয়ার অভিযোজন-উপযোজন-এর বিশেষ গুরুত্ব অনুভূত হয়। প্রথমাবস্থায় জৈবিক প্রয়োজনে এবং অপেক্ষাকৃত পরিণত স্তরে সচেতন অভিযোজন-উপযোজন-এর মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে উপযুক্ত করে তোলে। পারিপার্শ্বিক-এর সঙ্গে উপযোজন-অভিযোজন-এর মাধ্যমেই তার জ্ঞানের বিকাশ। আবার এই উপযোজনপ্রক্রিয়া সংঘাত ও সামঞ্জস্য উভয় প্রকার ধারাকে নির্দেশ করে।

৩য় অংশ ঃ সমাজের অভ্যন্তরে মানুষে মানুষে বিরোধ ও সহযোগিতা তথা উত্তেজনার টান সৃষ্টিকারী সম্পর্কের জটিল ধারা লক্ষ্য করা যাবে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সামাজিক সম্পর্কগুলোকে মিলনাত্মক, বিচ্ছেদমূলক এবং মিশ্র মিলন-বিচ্ছেদমূলক এরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করেছেন। এদের প্রত্যেকের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন, বলা যায়, যুদ্ধ হ'ল বিচ্ছেদমূলক সম্পর্কের সর্বোচ্চ স্তর। সমাজজীবন প্রকাশ পায় মিলন ও বিচ্ছেদ-এর যুগপৎ মধ্য দিয়ে।

৪র্থ অংশ ঃ মিলনাত্মক প্রক্রিয়া হিসেবে সহযোগিতা এবং বিচ্ছেদমূলক সম্পর্ক হিসাবে বিরোধ—এই দুইয়ের মধ্য দিয়েই সমাজের 'স্বাভাবিক' প্রবাহ লক্ষ্য করা যাবে। দ্বন্দ্ব-বিরোধ কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়; অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর হিংসাত্মক প্রকাশকে দমন ও নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সমাজে দেখা যাবে। তবে বিরোধ-এর নানা মাত্রা আছে। কোন কোন বিরোধ, যেমন প্রতিযোগিতা, সমাজজীবনের সুস্থ অবস্থারই পরিচায়ক।

১২.৫ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (Ö) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

	ঠিক	ভুল
(ক) প্রাচীনকালের মানুষের জীবনযাত্রা আমাদের কাজে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।	☐	☐
(খ) সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যগুলো ক্ষণস্থায়ী, শর্তাধীন।	☐	☐
(গ) সামাজিক বিষয়-সংক্রান্ত সর্বজনীন বিধি রচনা প্রায় অসম্ভব।	☐	☐
(ঘ) সমাজ হ'ল এক অন্তহীন প্রক্রিয়া-প্রবাহ।	☐	☐
(ঙ) পারিপার্শ্বিক-এর সঙ্গে উপযোজন-অভিযোজন প্রক্রিয়াগুলো মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করে।	☐	☐
(চ) আন্তঃমানবিক সম্পর্কগুলো মিলনাত্মক।	☐	☐
(ছ) বিচ্ছেদমূলক সম্পর্কগুলো অ-সামাজিক।	☐	☐
(জ) রাজনীতির উৎস হ'ল বহুমুখিতা, ভিন্নতা ও ব্যবধান।	☐	☐
(ঝ) মিলনাত্মক প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্তর-এর নাম Amalgamation বা একত্রীকরণ, সংযুক্তিকরণ।	☐	☐
(ঞ) প্রতিযোগিতা হ'ল একপ্রকার অ-প্রত্যক্ষ বিরোধ।	☐	☐

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লিখুন ঃ

(ক) সামাজিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়? সমাজকে কাল-প্রবাহ হিসেবে গণ্য করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(খ) উপযোজন-অভিযোজন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(গ) অবয়ববাদীদের অনুসরণে সামাজিক সম্পর্কগুলোর শ্রেণীবিভাজন করুন।
(ঘ) সহযোগিতা বলতে কি বোঝায়? সহযোগিতার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দিন।
(ঙ) "যেখানেই সমাজ সেখানেই সহযোগিতা ও বিরোধ-এর মুখোমুখি অবস্থান"—উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

১২.৬ উত্তর মালা

১. (ক) ভুল ; (খ) ঠিক ; (গ) ঠিক ; (ঘ) ঠিক ; (ঙ) ঠিক ; (চ) ভুল ; (ছ) ভুল ; (জ) ঠিক ; (ঝ) ঠিক ; (ঞ) ঠিক।

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. R.M. MacIver and C.H. Page : Society (An introductory analysis) (London, MacMillan & co. Ltd.)
2. P. Gisbert : Fundamentals of Sociology. (Orient Longman, Calcuta/Bombay/New Delhi)
3. L. Von Wiese & H. Hecker : Systematic Sociology. (New York, John Wiley & Sons).
4. পরিমলভূষণ কর ঃ সমাজতত্ত্ব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৫।

একক ১৩ □ সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য
১৩.২ প্রস্তাবনা
১৩.৩ শিল্প-বিপ্লব
১৩.৩.১ দ্বন্দ্ব-বিরোধ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া
১৩.৩.২ দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর নানা রূপ
১৩.৩.৩ কার্ল মার্কস-এর অবদান
১৩.৩.৪ মিথষ্ক্রিয়া, দ্বন্দ্ব ও বিরোধ
১৩.৪ সারাংশ
১৩.৫ অনুশীলনী
১৩.৬ উত্তরমালা
১৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.১ উদ্দেশ্য

দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা এই এককের প্রধান উদ্দেশ্য, এখানে দ্বন্দ্ব বিরোধ-এর নানা ধরন বা শ্রেণীর কথাও উল্লেখ করা হ'ল। বিশেষভাবে নির্দেশ করা হ'ল কার্ল মার্কস-এর শ্রেণী তত্ত্বের কথা, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কথা। সকল সমাজেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর সর্বজনীন উপস্থিতি। তাই এই একক-এর মূল লক্ষ্য হ'ল শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও অন্যান্য দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর সর্বজনীন উপস্থিতির প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করা এবং তার ভিত্তিতে পাঠককে সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার অনিবার্যতা সম্পর্কে অবহিত করান।

১৩.২ প্রস্তাবনা

বাস্তব সমাজজীবনে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রক্রিয়াকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। সমাজে Conflict বা দ্বন্দ্ব-বিরোধ এক অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য, অনতিক্রম্য প্রক্রিয়া। বহুবিচিত্র কারণে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ উপস্থিতি সামাজিক মানুষের কিছু অভিন্ন প্রকৃতি এই দ্বন্দ্বে-বিরোধ প্রক্রিয়াকে সর্বজনীন চরিত্র দিয়েছে। মাত্রা ও তীব্রতার বিচারে, উৎস এবং ফলাফলের বিচারে দ্বন্দ্ব-বিরোধ নানা ধরনের হয়। আবার এই প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির সংখ্যাগত ও সামাজিক অবস্থানগত বিচারে ও দ্বন্দ্ব বিরোধের তারতম্য ও বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হবে।

দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর সর্বজনীন চরিত্র নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তবে দ্বন্দ্ব-বিরোধ বহু বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করলেও তার মধ্যে কোন কোন বিরোধ প্রধান বা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর লক্ষ্য করা যাবে। এ প্রসঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করা যায় বিশিষ্ট সমাজ-চিন্তানায়ক কার্ল মার্কস-এর শ্রেণী-দ্বন্দ্ব তত্ত্ব। শ্রেণী-সংগ্রাম বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়াকে তিনি সমাজ-জীবনের তথা মানুষের ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি বলে গণ্য করেছেন। অপরদিকে, মার্কসীয় তত্ত্বের সমালোচকগণ মনে করেন

সামাজিক প্রক্রিয়া-প্রবাহকে দুই প্রধান শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-বিরোধজনিত প্রবাহ হিসেবে গণ্য করলে সামাজিক বাস্তবতার এক অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। তবে অগষ্ট কেঁৎ বা তাঁরও আগে সাঁ সিমঁ-এর পজিটিভিষ্ট বা দৃষ্টিবাদী (বিজ্ঞানবাদী) সমাজতত্ত্ব থেকে শুরু করে বিংশ শতকের শেষে উত্তর-আধুনিক (Post-modern) সমাজতত্ত্ব পর্যন্ত সকল প্রকার সমাজতাত্ত্বিক ভাবনাতেই conflict বা দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রক্রিয়াটি গুরুত্ব পেয়েছে।

মূল পাঠটির বিভিন্ন অংশে এইসব ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা রয়েছে। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া কিভাবে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রকাশ করে, সেগুলি প্রশমিত/নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টায় মানুষ অহরহ কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে এবং তা সত্ত্বেও কেন দ্বন্দ্ব-বিরোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না—এইসব প্রসঙ্গ বিভিন্ন পাঠ্যাংশে আলোচিত হয়েছে।

১৩.৩.১ মূল পাঠ (১ম অংশ) ঃ দ্বন্দ্ব-বিরোধ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া

সমাজতাত্ত্বিকদের দু'একটি মহলে এরূপ প্রচলিত আছে যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং ভারসাম্য বজায় রাখাই হ'ল সমাজের মূল প্রকৃতি। সামাজিক প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পেলে তাকে যেন অস্বাভাবিক অবস্থা বলেই গণ্য করতে হবে; দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রক্রিয়া যেন সামাজিক বিচ্যুতি বা সামাজিক ব্যাধিরই প্রকাশ মাত্র। সমাজতত্ত্বে যারা কাঠামো-কার্যবাদী (Structural-functional) তত্ত্বের সমর্থক বা তার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ট্যালকট পারসনস্ (Talcott Parsons)-এর অনুগামী তারাই মূলত এ ধরনের বক্তব্য হাজির করেন। অপরদিকে বিশিষ্ট জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ রালফ্ দাহ্রেনদরফ (Ralf Dehrendorf) এরূপ কার্যবাদী ব্যাখ্যাকে অবাস্তব utopia বলে সমালোচিত করেছেন। প্রখ্যাত ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড্ লক্উড্ (David Lockwood) পারসনীয় কার্যবাদ-এর সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বলেন, সমাজে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার অনিবার্যতা ও অপরিহার্যতার কথা স্বীকার না করলে সমাজ-জীবনধারার প্রকৃতি সঠিক অনুধাবন করা যাবে না।

সমাজ দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর উপস্থিতিকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না এমনকি যারা কার্যবাদী তারাও দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর অস্তিত্ব রয়েছে এটা মানছেন। তবে তাঁদের বক্তব্য হ'ল দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলো অসুস্থ অবস্থায় পরিচয় বহন করছে। উপরন্তু, কার্যবাদীদের বিশ্বাস, প্রত্যেক সমাজেই এইসব অস্বাভাবিক অবস্থা ও প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজের ভিতর থেকেই নানা ধরনের ব্যবস্থা (নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি) গড়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন ও সামাজিক কাঠমোগুলোর পারস্পরিকতা এবং সকলের তরফে সামাজিক ঐক্যসাধনে তৎপরতা—এরূপই যেন সকল সমাজের স্বাভাবিক ধারা বা প্রবণতা।

বুঝতে অসুবিদা হয় না উপরোক্ত কার্যবাদী গোষ্ঠীর লেখকগণ সামাজিক সংহতি (social integration) উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এছাড়া তারা মনে করেছেন দ্বন্দ্ব-বিরোধ অনিবার্যভাবেই সংহতি বিনষ্ট করে। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিরোধ বহু বিচিত্র ধরনের হতে পারে এবং যে কোন বিরোধই সংহতি বিনষ্ট করে এমন বলা যায় না; বরং লুই কোজার (Lewis Coser) যেমন বলেছেন, কোন কোন দ্বন্দ্ব বিরোধ সংহতিসাধনকারী ও অভিযোজনকারী (integration and adaptation) ভূমিকাও পালন করতে পারে। দাহ্রেনদরফ্ বলেছেন, যে কোন সমাজেরই দু'টোই চেহারা আছে—একটি হ'ল ঐকমত্য বা সম্মতিভিত্তিক জীবনযাত্রার চেহারা; অপরটি হ'ল দ্বন্দ্ব-বিরোধমূলক জীবন-এর চেহারা। দু'টোই সত্য, সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বিবিধ রূপ। কেবল কার্ল মার্কস বা মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিক গোষ্ঠী নয়, ম্যাক্স ওয়েবর, জর্জ সিমেল থেকে শুরু করে রাইট্ মিলস্, দাহ্রেনদরফ, কলিনস্, কোজার প্রমুখ নানা গোষ্ঠীর, নানা সময়ের, সমাজতাত্ত্বিকগণ এই সত্যটি উপলব্ধি করেছেন; সামাজিক প্রক্রিয়ার এই দ্বিবিধ রূপ-এর কথা তাঁরা বলেছেন।

সুতরাং দ্বন্দ্ব বিরোধ একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া, একটি স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়া—একথা মনে রাখা প্রয়োজন।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন কেটেছে নানাপ্রকার বিবাদ, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একথা ঠিক যে, দ্বন্দ্ব বিবাদ এর পরিণতি কখনই আরামদায়ক নয়। দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর ফলে জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হতে পারে, দুর্দশা বৃদ্ধি এবং মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস ও ঘৃণার বিস্তার ঘটতে পারে। অবশ্য প্রতিটি মানুষ যে প্রতি মুহূর্তে সুখ, আরাম চাইছে একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। কবি যেমন দুর্যোধনের ইচ্ছা হিসাবে জানিয়েছেন, "সুখ চাহি নাই মহারাজ, জয়-জয় চেয়েছিনু" (গান্ধারীর আবেদন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। আর যদি কেউ নিরন্তর সুখ কামনাও করেন তিনি যে তা পারেন এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "দুঃখ শোক মানুষের জীবনে নিত্য ঘটনা; সুখ মাঝে মধ্যে উঁকি দেয় মাত্র।" ঠিক তেমনি বলা যায় সখ্যতা, মিত্রতা, বন্ধুত্ব, স্বার্থত্যাগ, ভালবাসা, সহযোগিতা এইসব প্রক্রিয়া সমাজে মাঝে মাঝে প্রাধান্য পায় মাত্র; নতুবা সমাজজীবনে নিত্য প্রক্রিয়া হ'ল ভেদাভেদ, সন্দেহ, শত্রুতা, বৈপরীত্য, শোক-দুঃখ, বিবাদ-বৈরীতা, ব্যবধান, মতান্তর, স্বার্থপরতা, অসহযোগ তথা দ্বন্দ্ব-বিরোধ।

লুড্‌ভিগ্ গুম্প্লোভিৎস্ (Ludwig Gumplowicz) নামে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেছিলেন, সমাজজীবনে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ারই প্রাধান্য থাকে। ডারউইনীয় ব্যাখ্যা অনুসরণ করে তিনি আরও বলেন, জীবজগতের সকলেই বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেকেই যেন নিজেকে বেঁচে থাকার যোগ্য বলে প্রমাণ দিতে বদ্ধপরিকর। নৃতত্ত্ববিদ্ ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌দেরও বক্তব্য হ'ল মানবসমাজের সূত্রপাত হয়েছে আদিম অবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রাম পরিচালনার নিজ নিজ ক্ষেত্র হিসেবে। মানুষ কোন আদিম, অপরিবর্তনীয়, জঙ্গী আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তারা সামাজিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রাধান্য এনেছে কিনা তা ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব কিংবা বড়জোর সামাজিক মনস্তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হতে পারে। কিন্তু সমাজতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে আমরা এরূপ কোন মৌল প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ না এনে কেবল সমাজের বাস্তব চিত্র হিসেবে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর উল্লেখ করব। অতঃপর দ্বন্দ্ব বিরোধ-এর বিভিন্ন রূপ বা প্রকরণ-এর (typology) উল্লেখ করে বুঝবার চেষ্টা করব কেন এই বিরোধের প্রক্রিয়াগুলো সর্বজনীন সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে।

১৩.৩.২ মূল পাঠ (২য় অংশ) দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর নানা রূপ

সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের নানাবিধ উৎস সামাজিক প্রক্রিয়া-প্রবাহ এর বিচিত্র রূপকে নির্দেশ করে। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রক্রিয়া তার ব্যতিক্রম কিছু নয়। অর্থাৎ বহু বিচিত্র উৎস বা কারণ থাকার দরুণ সমাজের দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলো নানা ধরনের হয়। বিরোধের উদ্দেশ্য ও তীব্রতা অনুযায়ীও রূপ বদলাতে পারে। তাছাড়া কি ধরনের মানুষ বা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে লিপ্ত তার ভিত্তিতেও এই বিরোধজনিত প্রক্রিয়ার শ্রেণীবিভাজন করা যায়।

অধ্যাপক টমাস নিক্সন কারভার বিবাদের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী নানা ধরনের দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। প্রথমত, এক ধরনের দ্বন্দ্ব রয়েছে যেগুলি ধ্বংসমূলক; যেমন, মারামারি, অন্তর্ঘাত, ডুয়েল, ডাকাতি, যুদ্ধ ইত্যাদি। এগুলি হ'ল স্থূল, আদিম এবং পাশবিক ধরনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ। দ্বিতীয়ত, প্রতারণামূলক বিরোধ যেমন চুরি, জোচ্চুরি, মিথ্যা বিজ্ঞাপন, ভোগ্যদ্রব্যে ভেজাল ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে প্রথম ধরনটির মত খোলাখুলি বিরোধ যতটা না প্রকাশ পাবে তুলনায় অনেক বেশী প্রকাশ পাবে বুদ্ধি ও চাতুর্যের প্রয়োগ। তৃতীয়ত, প্ররোচনামূলক দ্বন্দ্ব-বিরোধ যেমন, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, আইনজীবীদের দ্বন্দ্ব, স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ঘটিত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। অবশ্য এই তৃতীয় ধরনের দ্বন্দ্ব কখনও কখনও দ্বিতীয় ধরনের মাত্রা পেতে পারে; এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে এই ধরনের দ্বন্দ্ব (যেমন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব) প্রথম পর্যায়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত পেতে রূপও নিতে পারে। চতুর্থত, অর্থনৈতিক

প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব-বিরোধ। যে কোন প্রতিযোগিতাই কালক্রমে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আকার নিতে পারে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপজনিত দ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার প্রকাশ পেতে পারে। দরকষাকষি (bargaining) থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পরিণত হতে পারে।

দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রকাশ পেতে পারে বিনোদনমূলক ক্রিয়া থেকেও; যেমন, নাট্যশিল্পীদের প্রতিযোগিতা বা নানা ধরনের খেলাধূলা বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এইসব প্রতিযোগিতা চূড়ান্তস্তরে খেলাখুলি বিরোধ-এর রূপ নিতে পারে। সহযোগিতার পথ ধরেই বিরোধ ও সংঘাতমূলক সম্পর্কে পৌঁছানো যায়। কেননা, দুই প্রতিযোগী গোষ্ঠীর মানুষেরা আলাদাভাবে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা সুদৃঢ় করে, একে অপরকে উৎসাহিত করে প্রতিযোগী শক্তির বিনাশসাধনের জন্য। আবার দেখা যায়, অভিন্ন শত্রু বা প্রতিযোগীর বিনাশের পর পুরানো সহযোগীদের মধ্যে নতুন করে দ্বন্দ্ব-বিরোধ দেখা দিচ্ছে। এইসব কারণেই সমাজতাত্ত্বিকগণ দ্বন্দ্ব-বিরোধকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বলে ঘোষণা করেছেন। দ্বন্দ্ব-বিরোধ হ'ল সামাজিক শক্তিসমূহের সংঘাত, সংঘর্ষ। তাই এর তাৎপর্য বিকাশ ঘটতে পারে, নানা রূপে শক্তিসমূহের প্রকাশ হতে পারে।

সামাজিক কার্যকলাপের বিভিন্ন প্রকৃতির ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর নানা ধরন ও পর্যায়ের কথা বলা যাবে। প্রথমত, কোনপ্রকার সহযোগিতা না করা পরোক্ষভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ারই সামিল। যেমন কিনা গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন; ওটা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষণা। দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর আর একটি পর্যায় প্রকাশ পায়। প্রতিযোগিতা যে কোন সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হতে পারে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠা মুহূর্তের ব্যাপার। তৃতীয়ত, প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বা প্রত্যক্ষ সংঘাত হ'ল সরাসরি বিরোধিতা রূপ যা যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যাবে। একে মৌলিক বা প্রাথমিক দ্বন্দ্বও Primary conflict) বলা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য সরাসরি প্রতিপক্ষকে অবদমিত করা বা সরাসরি জয়লাভ করা। দুই মুষ্টিযোদ্ধার লড়াই এরূপ দ্বন্দ্ব-বিরোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কোন কোন দ্বন্দ্ব-বিরোধকে অসম দ্বন্দ্ব বলা যেতে পারে, যখন কোন বৃহৎ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারই অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র অংশ কিংবা বাইরের কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য বাহ্যত এরূপ অসম দ্বন্দ্বে ক্ষুদ্র ভাগটিও জয়ী হতে পারে। কেননা, সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও ঐ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা এবং অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতা থাকতে পারে যার জোরে শেষ পর্যন্ত তারাই সংখ্যাগুরু অংশকে পরাজিত করতে পারে।

ম্যাকআইভার ও পেজ লিখেছে, "Conflict expresses itself in numerous ways and in various degrees and over every range of human contact. Its modes are always changing with changing social and cultural conditions" অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-বিরোধ বহুভাবে এবং বিচিত্র মাত্রায় প্রকাশ পেতে পারে; মানুষে-মানুষে সম্পর্কের প্রতিটি স্তরেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ সম্ভব। আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে দ্বন্দ্ব-বিরোধের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়। তবে, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দু'ভাবেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটছে বলা যাবে। যখন কোন অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই অন্যদের অতিক্রম করতে, ধ্বংস করতে বা নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হয় তখনই তা প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত হবে। যুদ্ধ, শ্রেণীসংগ্রাম বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা এরূপ দ্বন্দ্বের উদাহরণ। যেখানে এরূপ খোলাখুলি সংঘাতে না গিয়েও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এমনভাবে আচরণ করে যা অন্যদের তরফে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানর পথে সমস্যা তৈরী করছে, সেই অবস্থাকে পরোক্ষ দ্বন্দ্ব বলা যাবে। দরকষাকষি এরূপ দ্বন্দ্বের উদাহরণ। কোন ব্যবসায়ী যখন দর কমিয়ে একই পণ্যের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের তুলনায় দ্রুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে বা সুবিধাজনক বাণিজ্য করে তখন তা পরোক্ষ দ্বন্দ্বের রূপ নেয়।

সর্বশেষে কিঙ্গস্‌লে ডেভিস (Kingsley Davis) যেমন দ্বন্দ্ব-বিরোধকে আংশিক ও সামগ্রিক এরূপ দুইভাগে ভাগ করেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডেভিস লিখেছেন, "Conflict is an ever-present process

in human relations. It may be solved at one level, as when there is agreement on ends, and bread out a new over the question of means. Such partial conflict however is different from total conflict." অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-বিরোধ হ'ল মানবিক সম্পর্কে সদা বিরাজমান প্রক্রিয়া। কোন এক স্তরে যদিও বা দ্বন্দ্বের নিরসন হ'ল (যেমন হতে পারে যদি লক্ষ্য নিয়ে ঐকমত গড়ে ওঠে) তবে দেখা যাবে নতুন করে অন্যত্র দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে, যেমন কিনা লক্ষ্যে পৌঁছানর উপায় বা মাধ্যম নিয়ে দ্বন্দ্ব। অবশ্য এসব হ'ল আংশিক দ্বন্দ্ব। সামগ্রিক দ্বন্দ্ব একেবারে আলাদা ব্যাপার। যখন দেখা যাবে সম্পর্কে বা কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের বা গোষ্ঠীদের মধ্যে কোন স্তরেই কোন অভিন্নতা বা সমমত নেই তখনই সামগ্রিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রকাশ ঘটবে। এবং সেই ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ তথা দমন-পীড়নই হ'ল একমাত্র পথ/পদ্ধতি।

১৩.৩.৩ মূল পাঠ (৩য় অংশ) ঃ কার্ল মার্কস-এর অবদান

সমাজতত্ত্বে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর এই প্রবণতার মূলে রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট চিন্তানায়ক কার্ল-মার্কস-এর অবদান। বস্তুত, সমাজতত্ত্বে দ্বন্দ্ব তত্ত্ব (Conflict theory) হিসেবে যা বিকাশ লাভ করেছে তা প্রাথমিকভাবে কার্ল-মার্কস-এরই সৃষ্টি। কোন কোন হলে তো মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বকে 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব' নামেই পরিচিত দেওয়া হয়। কোন সন্দেহ নেই 'শ্রেণীদ্বন্দ্ব', 'শ্রেণীসংগ্রাম', 'প্রলেতারীয় শ্রেণীর বিপ্লব' এইসব কথার মধ্য দিয়ে মার্কস ও মার্কসবাদ-এর বিশেষ পরিচয় নিহিত। কার্ল মার্কস সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার সর্বজনীনতার ভিত্তি নিয়ে এবং বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রধান অংশটাই ব্যয় করেছেন। বোধ করি, অন্য কোন চিন্তানায়কের তত্ত্ব-ভাবনার সঙ্গে বাস্তব সমাজচিত্রের এতটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা যায় না, যা আমরা মার্কস-এর ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। সাম্প্রতিককালের সমাজে ও রাষ্ট্রে যদি মার্কসীয় (প্রলেতারীয়) বিপ্লবের সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেও মনে হয়, তথাপি এইসব সমাজের অভ্যন্তরস্থ দ্বন্দ্ব-বিরোধ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কসীয় শ্রেণীদ্বন্দ্ব তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্বের মূল বক্তব্যগুলো নিম্নরূপ সংক্ষেপে উপস্থাপিত করলাম।

মার্কস ও মার্কসবাদীরা মানুষের প্রাচীনতম সমাজজীবনে একপ্রকার সমভোগবাদী অবস্থার অস্তিত্বের কথা বলেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে সমাজজীবনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়া ছিল না। খাদ্যদ্রব্য আহরণ ও তৈরীর এক বিশেষ উন্নত পর্যায়ে মানুষে-মানুষে অবস্থান ও মর্যাদাগত ব্যবধান দেখা দেয়। বলা যেতে পারে, প্রধানত ভোগ্যবস্তু ও সম্পদের আপেক্ষিক অপ্রতুলতার জন্যই মানুষের ঐ আদিম পর্যায়ের কোন এক স্তরে ধীরে ধীরে উচ্চ-নীচ ব্যবধান বা সম্পদের নিয়ন্ত্রণজনিত ভেদাভেদ গড়ে ওঠে। অতঃপর অবস্থান ও ক্ষমতার তারতম্য এবং সর্বোপরি সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য অনিবার্যভাবেই সমাজে দ্বন্দ্ব-বিরোধের সূত্রপাত ঘটায়। সুতরাং, বলা যায়, মার্কস ও মার্কসবাদীদের মতে সামাজিক সম্পর্কে বিরোধ ও সংঘাতের প্রক্রিয়া৪ শুরু হয়েছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে, ভোগ্যদ্রব্য আহরণ/উৎপাদন ও বণ্টন কর্মকে কেন্দ্র করে। উপরন্তু, তাঁদের মতে, এই বিরোধ ও সংঘাতমূলক সম্পর্কগুলো প্রধানত সম্পত্তিশালী ও সম্পত্তিহীন তথা শোষক ও শোষিত বা নিপীড়ক এরূপ দুই বিপরীত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সম্পর্ক হিসেবেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আবার এই শ্রেণীসংঘাতই, তাঁদের মতে মানব-ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি। আর একটু বিশদভাবে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যাক।

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তেহার' পুস্তিকার নামক পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই পুস্তিকাটির দুই রচনাকার মার্কস ও এঙ্গেলস ঘোষণা করেছেন, "এযাবৎকাল পৃথিবীতে যতরকম সমাজের কথা জানা গেছে তাদের সকলেরই ইতিহাস হ'ল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।" আদিম সমাজ থেকে দাস-সমাজ, দাস-সমাজ থেকে সামন্ত-সমাজ কিংবা সামন্ত-সমাজ থেকে পুঁজিবাদ-সমাজ এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের যে ইতিহাস আমরা লক্ষ্য করি তার মূলে রয়েছে শ্রেণী-সম্পর্কে বিস্তার ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের মাত্রাগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন। মার্কস ও তাঁর

অনুগামীরা বলেন, ইতিহাস এই সত্যটি বারবার উদ্‌ঘাটিত করে যে মানুষ গোষ্ঠীগতভাবে তথা শ্রেণীগতভাবে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নিজেদের বিকাশসাধন করে। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় ঐ শ্রেণীদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়গুলিতে এবং সেইসব বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে নতুনভাবে প্রকাশিত ও বিকশিত করে; নতুন পর্যায়ের সভ্যতা সৃষ্টি করে। তাই সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ধ্বংসাত্মক ও সৃজনশীল; পুরানো ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন ও নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় এই শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই পরিণতি হিসেবে।

কার্ল মার্কস-এর এই শ্রেণী-দ্বন্দ্ব তত্ত্ব মানব-ইতিহাসের এক বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে নির্দেশ করে। উপরন্তু মার্কস-এর এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এক বিশিষ্ট পদ্ধতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে—যে পদ্ধতির নাম দ্বন্দ্ববাদ বা Dialectics। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক (Dialectical) গতি নির্ধারিত হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের প্রকাশের ফলে। সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব বলতে বোঝায় উৎপাদন শক্তি তথা শ্রমশক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক তথা সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণজাত সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। উৎপাদন-ব্যবস্থার এই দুই অংশের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব তারই বহিঃপ্রকাশ হ'ল শ্রেণীদ্বন্দ্ব। বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

কার্ল মার্কসই প্রথম একথা স্পষ্ট করে বলেন যে, শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার নির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বাড়তেই থাকবে এবং সেই ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-সংঘাত শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে। পূর্বোপরি মার্কস আশা করেছিলেন, আগামী দিনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলো মেহনতী মানুষ তথা প্রলেতারীয় শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অগ্রসর হবে।

মার্কস-এর বন্ধু ও সহযোগী চিন্তানায়ক এঙ্গেলস লিখেছেন, "What is left of history when the class concept is eliminated but the record of insignificant is trivialities." অর্থাৎ মানব-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি আলোচনায় শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত হলে যা পড়ে থাকবে তা তুচ্ছ কিছু ঘটনাবলীর অসংলগ্ন সমাবেশ মাত্র। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণাকে বর্জন করে যদি কোন দেশের ইতিহাস রচিত হয় তবে তাতে ঐ দেশের আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও জীবনবোধের বিবর্তনের ধারাটি ধরা পড়বে না—এক কথায়, সমাজটাকেই জানা যাবে না।

সমালোচকগণ বলেন, কার্ল মার্কস সামাজিক সম্পর্ককে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর দ্বন্দ্বসম্পর্ক হিসেবে নির্দেশ করে সমাজ-ইতিহাসের অতিসরলীকরণের দায়ে দুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু মার্কস-এর নানা গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায়, এই সমালোচনা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, মার্কস সামাজিক প্রক্রিয়ায় দুই মূল বিরোধী শ্রেণী ও শ্রেণীস্বার্থের বাইরেও নানাবিধ সামাজিক গোষ্ঠীর উপস্থিতির কথা বলেছেন। এমনকি 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তেহার' নামক পুস্তিকাতেও নানা ধরনের মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর (Intermediate classes) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মনে রাখতে হবে, কার্ল মার্কস পেশার ভিত্তিতে বা উপার্জনের বিচারে 'শ্রেণী'র ধারণাটি হাজির করেন নি। 'শ্রেণী'র ধারণাটি হাজির করেন নি। 'শ্রেণী'র ধারণা গঠনে বিষয়গত (objective) এবং বিষয়ীভূত (subjective) উভয় দিক-এর কথাও বিচার করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন কাঠামোভিত্তিক শ্রেণী-গঠন প্রক্রিয়াটি বিবেচনা করার কালে প্রতিটি শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের মানসিক বা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিরও বিচার করতে হবে। objective বা পার্থিব জীবনগত অবস্থানের ভিত্তিতে কোন মানুষকে শোষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু দেখা যাবে তার মানসিক প্রস্তুতি তথা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সে হয়ত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্নে শাসক ও শোষক কুলের সমর্থক হিসেবেই কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, চলমান শ্রেণী-সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে নতুন প্রজন্মের মানুষেরা তাদের শ্রেণীগত অবস্থান গড়ে তুলতে পারে। মূল সামাজিক দ্বন্দ্বটি হ'ল দুই বিপরীত শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব যা প্রাথমিকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই যুক্ত। অতঃপর

সেই দ্বন্দ্ব চলাকালীন বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিভাবে কোন পক্ষ অবলম্বন করছে তার ভিত্তিতেই তাদের শ্রেণী-চরিত্র নির্ধারণ করা যাবে। হয়ত এ কারণেই Ernst Fischer নামে এক বিশিষ্ট মার্কবাদী লেখক বলেছেন, "A class is born is class struggles"—অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। সুতরাং শ্রেণীর ধারণাটি ব্যাখ্যার সময়ে শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী-সচেনতার (class consciousness) বিষয়টি নির্দেশ করা প্রয়োজন।

কার্ল মার্কস-এর শ্রেণীদ্বন্দ্ব-তত্ত্ব মানবসমাজ ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার কোন সরল ব্যাখ্যা হাজির করেনি। দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর জটিল প্রক্রিয়ায় তিনি শ্রেণীস্বার্থের ও শ্রেণীসচেতনার বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে তিনি শ্রেণীস্বার্থের সংগ্রাম এবং শ্রেণীগত মতাদর্শের সংঘাতকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

১৩.৩.৪ মূল পাঠ (৪র্থ অংশ) ঃ মিথস্ক্রিয়া, দ্বন্দ্ব ও বিরোধ

সমাজচিন্তার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সামাজিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আলোচনা-বিশ্লেষণ। সমাজকে আমরা আন্তঃমানবিক সম্পর্কের জটিল বিন্যাস বলেই নির্দেশ করেছি। বিশ্লেষণ করতে গেলেই দেখা যায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো আপাতদৃষ্টিতে সরল, স্বচ্ছ মনে হলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে নানা প্রভাব, প্রবণতা ও ঝোঁক-এর পরিণতিস্বরূপ সম্পর্কগুলো জটিল ও বিচিত্র রূপ নিয়েছে। নানাপ্রকার দায়-দায়িত্ব, নানা ধরনের মর্যাদাগত অবস্থান এবং নানাবিধ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এই বৈচিত্র্যের এবং জটিলতার কারণ বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। দুই বা ততোধিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রবাহ সৃষ্টি করে তাতে লক্ষ্য ও উপায়ের দ্বান্দ্বিকতাজনিত জটিল ধারা প্রকাশিত হয়, সম্পর্কে লিপ্ত ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা/স্তর ও প্রকৃতি নির্দেশক কাঠামোগুলোর বিরোধিতাও প্রকট হয়। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর লক্ষণগুলো এরূপ প্রকট না হ'লে হয়তো সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এতটা গুরুত্ব পেত না।

কিংস্‌লে ডেভিস (Kingsley) সঠিকই বলেছেন, "...the forms of interaction...conflict, competition and co-operation are all interdependent. They are ever-persent aspects of human society." অর্থাৎ দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা, সামাজিক সম্পর্কের এই ধরনগুলো সবই পরস্পর নির্ভরশীল। মানবসমাজে এই সম্পর্কগুলো সবই নিত্য বিদ্যমান। ডেভিস-এর মতে, যে কোন সামাজিক ক্ষেত্রে বা বস্তুগত অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ঐ ত্রিবিধ সম্পর্কই পরস্পরগ্রন্থিত হয়ে আছে। এমন কোন সহযোগিতার প্রক্রিয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মধ্যে দ্বন্দ্বের উপাদান অন্তর্নিহিত নেই। এমন কোন সহযোগিতা নেই যা ভিন্নতর বা উচ্চতর ক্ষেত্রে সহযোগিতার ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। এমনকি দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর প্রক্রিয়াটিও একরৈখিকভাবে অন্তহীন কোন প্রক্রিয়া নয়। সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার তীব্রতা সকল পর্যায়ে একরকম থাকে না। দেখা যাবে, অপেক্ষাকৃত মৃদু দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে সাময়িকভাবে মিত্রতা বা সহযোগিতা ব্যবস্থা হচ্ছে। যেমন দেখা যায় প্রতিযোগী দুই সতীর্থের মধ্যে কিংবা নানা ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী একই এলাকার দুই গোষ্ঠীর (দুটি ক্লাব বা সাংস্কৃতিক সংস্থা) মধ্যে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া হ'ল মানুষে-মানুষে নানাপ্রকার যোগাযোগ (communication) গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। বেঁচে থাকার তাগিদ তথা খাদ্যসংগ্রহের তাগিদ ছাড়াও, এমনকি পরিধেয় বস্তু সংস্থান বা বাসস্থান তৈয়ার-এর মত জরুরী প্রয়োজন ছাড়াও, মানুষ নানা কারণে, নানান গৌণ তাগিদে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক তথা যোগযোগ গড়ে তোলে। অন্যের আচরণ, যেমন অন্য ব্যক্তির কথা, ইঙ্গিত বা অবস্থান, লক্ষ্য করে আর এক ব্যক্তি তার বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে। এটাই যোগযোগের সূত্রপাত। শুরু থেকেই প্রত্যেকে প্রত্যেকের

কথা, ইঙ্গিত বা অবস্থানকে নিজের মত করেই বুঝে নিচ্ছে। আর সেখানেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর বীজ কেনা হচ্ছে। অন্যজন তার বক্তব্য, অবস্থান বা ইঙ্গিতগুলোর যেরকমই ব্যাখ্যা দিক, আর এক ব্যক্তি তা একশ' ভাগ মেনে নেবে না—সে তার নিজস্ব ব্যাখ্যাই বহাল রাখতে চাইবে। আর এই বিরোধী ব্যাখ্যাগুলো কালক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর রূপ নিয়ে থাকে। সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার এই বিষয়ীভূত (Subject) বা মনস্তাত্ত্বিক দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র বিষয়গত বা বস্তুগত স্বার্থজনিত (objective) বিরোধের কথা নির্দেশ করলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রক্রিয়ার সর্বজনীন চরিত্রটি অনুধাবন করা যাবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রক্রিয়াটি মানুষের সমাজে নিন্দনীয়, ক্ষতিকারক এবং বর্জনীয় বলে গণ্য সেটা কি করে সর্বজনীন চরিত্র পরিগ্রহ করছে। কোন সন্দেহ নেই যে, বিরোধ-সংঘাত-এর প্রক্রিয়া এক পক্ষের বা উভয় পক্ষের ক্ষতিসাধন করে। খুন, জখম তো বটেই, বিরোধের ফলস্বরূপ কোন পক্ষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, অপদস্থ হওয়া বা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার মত ঘটনাগুলো সমাজে নিন্দনীয় ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত। উপরন্তু প্রত্যেক সমাজেই প্রধানদের তরফে নবীনদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এটাও শেখানো হয় যে, তারা যেন দ্বন্দ্ব-কলহ বর্জন করে; বন্ধুত্ব ভালবাসা ও সহযোগিতার নীতিকেই যেন সকলে অনুসরণ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, কোন সমাজেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়া অবসানের কোন লক্ষণ নেই। দ্বন্দ্ব-বিরোধ লোকাচারসম্মত না হয়েও কি করে সর্বজনীনতা পেল তার উত্তর খুঁজতে হ'লে সমাজ-জীবনের মূল প্রকৃতির দিকে নজর দিতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মানবসমাজ দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ কোন অবস্থা নয়; সমাজব্যবস্থাকে সাধারণভাবে ঢিলেঢালা সংগঠনই বলা যায়। যাঁরা জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের তুলনা করেছেন (organic analogy) তাঁরা সমাজ-সংগঠনের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করেননি। সমাজে যখন যেটুকু সংহতি থাকে তা সামাজিক মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও বোধ-বুদ্ধির স্তরেই থাকে। সেই কারণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও নানাপ্রকার সামাজিক সংগঠন তৈরীর মধ্যে সেই সংহতিসাধনকারী মানসিকতারও প্রকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু জীবদেহের মত সমাজের নির্দিষ্ট কোন শরীর বা অবয়ব নেই তাই ঐ সংহতির বাঁধনটি খুবই শিথিল, নড়বড়ে। অত্যন্ত সচেতনভাবে, পরিকল্পনামাফিক ঐ সংহতি গড়ে তুলতে হয়, বজায় রাখতে হয়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সদস্যদের তরফে অভিন্ন স্বার্থ গড়ে তোলা এবং নিজ নিজ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্যের জন্য নিজেদের নিযুক্ত রাখা। বলা বাহুল্য, বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে এ কে অসাধ্য সাধনের দায়িত্ব। নিয়মিতভাবে দীক্ষিতকরণ (Indoctrination), উৎসাহদান (Inspiration), পুনরুল্লেখ (repetetion) ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ দুর্লভ ঐক্য ও সংহতি আনার চেষ্টা চালাতে হয়। কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে এক গোষ্ঠী যেভাবে, যে আদর্শে, দীক্ষিতকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে অপর গোষ্ঠী তার বিরোধিতা করছে। অর্থাৎ সংহতিসাধন কর্মও দ্বন্দ্ব-বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। আর সংহতির অনুপস্থিতিতে তো দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকবেই। এই কারণেই আমরা বলেছি সমাজে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়া এক সর্বজনীন ধারা।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে Men think differently as they live differently অর্থাৎ মানুষ যেমন ভিন্নভাবে জীবনযাপন করে তেমনি মানুষের চিন্তা ভাবনাও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। আর এই ভিন্নতা থেকে আসে মতান্তর, বিরোধ, সংঘাত ও সংঘর্ষ। মনে রাখতে হবে, ভিন্নভাবে জীবনযাপন মানে কেবল ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাপন নয়, একই স্থানে একই আস্তানাতেও দু'টি মানুষ দুটো ভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রদর্শন করতে পারে, দু'টো ভিন্ন ও বিরোধী জীবনবোধ প্রকাশ করতে পারে। তাই তো আমরা দেখি এই ভারতীয় সমাজেই কত বিরোধী বোধ-বুদ্ধির প্রকাশ। ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, জাতিগোষ্ঠীগত নানা কারণে পাশাপাশি বসবাসকারী ভারতীয়রা একে অপরের শত্রুর মত ব্যবহার করছে। Ethnic conflict বা জাতিগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব তার এক প্রকট ও দুঃখজনক নিদর্শন।

প্রত্যক্ষ, মুখোমুখি সংঘাত সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। যেমন, শান্তিচুক্তির যুদ্ধের অবসান হয়; কিংবা দলীয় বা সরকারী প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কিন্তু ছোট খাট আংশিক সংঘাত চলতেই থাকে। বন্ধুমহলে, পরিবারের মধ্যে, অফিস-আদালতে নানা মাত্রার দ্বন্দ্ব-বিরোধ অবিরাম প্রকাশিত হচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বিরোধমুক্ত সমাজজীবনের কথা আমরা ভাবতেই পারি না। দ্বন্দ্ব-বিরোধ এক অপরিহরণীয়, অনিবার্য, সামাজিক প্রক্রিয়া। দ্বন্দ্ব-বিরোধ সমাজের অনুচ্ছেদনীয় অংশ। যে বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্য সমাজের অর্থ প্রকাশ করে তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হ'ল বিরোধ। সমাজ থাকলে দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকবে। ডেভিস্ সঠিকই বলেছেন, "Conflict is a part of human society because of the kind of thing human society is." অর্থাৎ মানবসমাজের প্রকৃতিগত কারণেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৩.৪ সারাংশ ঃ (মূল পাঠ-এর চারটি অংশ একত্রে)

১ম অংশ ঃ সমাজতাত্ত্বিকদের একাংশ দ্বন্দ্ব-বিরোধকে সমাজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে গণ্য করতে অনিচ্ছুক। টালকট পারসন্স-এর মত কার্যবাদীরা যেমন সমাজের ভারসাম্য বিনষ্টকারী যে কোন প্রক্রিয়াকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেন। কার্যবাদীদের অভিমত হ'ল সামাজির সংহতি রক্ষাকল্পে দ্বন্দ্ব-বিরোধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অপরদিকে লুই কোজার-এর মত লেখকগণ বলেন, অবস্থা-বিশেষে দ্বন্দ্ব-বিরোধ, সংহতি ও অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সাহায্যও করতে পারে। দ্বন্দ্ব-বিরোধ অনেক ক্ষেত্রে হয়ত ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তবুও দেখা যায়। ভেদাভেদ, শত্রুতা, শোক-দুঃখ, বৈপরীত্য এ সবই সামাজিক বস্তুসত্য হিসেবে বিরাজ করছে। নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা থেকেও জানা যাচ্ছে মানবসমাজের আদিম অবস্থায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠীবিরোধই ছিল নিত্য ঘটনা।

২য় অংশ ঃ বহু বিচিত্র উৎস ও কারণের জন্য সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলো নানা রূপ পরিগ্রহ করে। অধ্যাপক কারভার বিরোধের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী—ধ্বংসমূলক, প্রতারণামূলক, প্ররোচনামূলক, প্রতিযোগিতামূলক এরূপ চার প্রকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেন। সহযোগিতার রাস্তা ধরেও দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রকাশ ঘটতে পারে। যুদ্ধ হ'ল প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। অসহযোগ-এর মত ক্রিয়াকলাপগুলো পরোক্ষ দ্বন্দ্বের প্রকাশ। মানবিক সম্পর্কের যে কোন স্তরেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটতে পারে। সামগ্রিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ হয় সার্বিক দমন-পীড়ন ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে। আংশিক দ্বন্দ্ব তো নিত্যকার ঘটনা।

৩য় অংশ ঃ সমাজতত্ত্বে দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা কার্ল মার্কস। মূলত পুঁজিবাদী সমাজের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বটি প্রকট হয়েছে। শ্রেণীসংঘাতকেই তিনি ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি বলে নির্দেশ করেছেন। দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়া যেন একই সঙ্গে ধ্বংসাত্মক ও গঠনমূলক, শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়, যে প্রগতির সূচনা হয়, তাতেই দ্বন্দ্বের এই দ্বৈত রূপ (বিনাশসাধনকারী এবং সৃজনশীল) প্রকাশ পাবে। মার্কস আসা করেছিলেন, এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সাম্যবাদী ব্যবস্থার আবির্ভাব হবে। সমালোচকগণের মতে কার্ল মার্কস-এর শ্রেণীদ্বন্দ্ব তত্ত্ব সমাজব্যবস্থা ও ইতিহাসের অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। কিন্তু কার্ল মার্কস-এর রচনাবলীর সনিষ্ঠ অনুশীলনে দেখা যাবে যে তিনি শোষক ও শোষিত দুই মূল শ্রেণী ছাড়াও মধ্যবর্তী স্তরের নানা শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু তিনি শ্রেণীর ধারণাটি বিজ্ঞানসম্মত করার উদ্দেশ্যে তার বিষয়গত বা objective দিক ছাড়াও বিষয়ীভূত বা subjective স্তরের শ্রেণী-

চেতনার কথা বলেছেন। মার্কসীয় তত্ত্বে 'শ্রেণী'র ধারণা গঠনে শ্রেণী-সচেতনতার উপাদানটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

৪র্থ অংশ ঃ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো আপাতদৃষ্টিতে স্বচ্ছ ও সরল মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নানা প্রবণতা ও ঝোঁক-এর প্রভাবে সম্পর্কগুলো জটিল আকার ধারণ করে। আবার সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর সম্পর্কগুলোই প্রকট। সমাজে দ্বন্দ্ব, সহযোগী ভাব ও প্রতিযোগিতার ধারাগুলো পরস্পর-গ্রন্থিত হয়ে থাকে। মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তি হল যোগাযোগ। যোগাযোগ গড়ে তোলার কালে বিভিন্ন কথা, ইঙ্গিত বা আচরণের বিভিন্ন অর্থ নির্দেশিত হতে পারে। আর সেই ভিন্নতা থেকেই বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। বিরোধ-সংঘাত যতই অপছন্দের হোক, যতই তা ক্ষতিকারক মনে হোক, বাস্তব সমাজজীবনে তার উপস্থিতি সর্বজনীন ব্যাপ্তি অর্জন করেছে। সমাজব্যবস্থা জীবদেহের মত সুসংহত নয়। সমাজকাঠামো ঢিলেঢালা ধরনের। তাই দেখা যায়, সংহতি সাধনকারী শক্তিগুলোর তুলনায় সংহতি বিনাশকারী শক্তি বা উপাদানগুলো যেন বেশী সক্রিয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবনযাপনের পরিতিস্বরূপ মানুষে-মানুষে বোধবুদ্ধিগত ভিন্নতা, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং আদর্শগত ব্যবধান ও বিরোধ দেখা দেয়, তাই সামগ্রিকভাবে না হ'লেও অন্তত আংশিকভাবে সমাজে সবসময়ই দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়া চলছে।

১৩.৫ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (Ö) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

	ঠিক	ভুল
(ক) যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রক্রিয়াকে সামাজিক ব্যাধি বলে গণ্য করতে হবে।	☐	☐
(খ) লুই কোজারের মতে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর অভিযোজনকারী ভূমিকা আছে।	☐	☐
(গ) নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে মানবসমাজের আদিম পর্যায়ে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল না।	☐	☐
(ঘ) বিনোদনমূলক ক্রিয়া থেকেও দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রকাশ পেতে পারে।	☐	☐
(ঙ) অসহযোগ আন্দোলন পরোক্ষ দ্বন্দ্বের উদাহরণ।	☐	☐
(চ) দরকষাকষি প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের উদাহরণ।	☐	☐
(ছ) দ্বন্দ্ব-বিরোধ বিশ্লেষণের মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্ব একটি দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করে।	☐	☐
(জ) শ্রেণীদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।	☐	☐
(ঝ) শ্রেণী-সচেতনতা শ্রেণীদ্বন্দ্ব পরিচালনায় অপরিহার্য নয়।	☐	☐
(ঞ) জীবদেহের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার সাদৃশ্য নির্দেশ মোটেই যুক্তিযুক্ত বা বিজ্ঞানসম্মত নয়।	☐	☐

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লিখুন ঃ

(ক) টালকট্ পারসন্‌স ও তাঁর অনুগামীরা সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রক্রিয়া কিভাবে বিচার করেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) দ্বন্দ্ব-বিরোধকে কি কারণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলা হবে তা ব্যাখ্যা করুন।

(গ) অধ্যাপক কারবার কিভাবে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা আলোচনা করুন।

(ঘ) প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের সঙ্গে পরোক্ষ দ্বন্দ্বের এবং সামগ্রিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে আংশিক দ্বন্দ্বের পার্থক্য নির্দেশ করুন উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে।

(ঙ) কার্ল মার্কস-এর দ্বন্দ্বতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত করুন।

(চ) শ্রেণীদ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝায়? শ্রেণীদ্বন্দ্বের সঙ্গে শ্রেণীসচেতনতার কি সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করুন।

(ছ) সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় কিভাবে দ্বন্দ্ব-বিরোধ অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায় তা বুঝিয়ে লিখুন।

১৩.৬ উত্তরমালা

(ক) ভুল; (খ) ঠিক; (গ) ভুল; (ঘ) ঠিক; (ঙ) ঠিক; (চ) ভুল; (ছ) ঠিক; (জ) ঠিক; (ঝ) ভুল; (ঞ) ঠিক।

১৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Kingsley Devis : Human Society (Macmillan, 1949).
2. Emory S. Bogardus : The Development of Social Thought. (vakils, Feffer & Pimons. 1969).
3. Ernst Fischer : Marx in his own words. (Penguin, 1970).

একক ১৪ ☐ সামাজিক গতিময়তা

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য
১৪.২ প্রস্তাবনা
১৪.৩ মূলপাঠ
১৪.৩.১ গতিময়তার অর্থ ও প্রকারভেদ
১৪.৩.২ গতিময়তা ও স্তরবিন্যাস
১৪.৩.৩ আনুগত্য ও বিচ্যুতির প্রক্রিয়া
১৪.৩.৪ সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও গতিময়তা
১৪.৪ সারাংশ
১৪.৫ অনুশীলনী
১৪.৬ উত্তরমালা
১৪.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১৪.১ উদ্দেশ্য

সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি অনুধাবনে গতিময়তার বিচার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই এককটিতে সামাজিক গতিময়তার অর্থ নিরুপণের পাশাপাশি গতিময়তার নানা রূপ বা ধরন-এর উল্লেখ থাকবে। এছাড়া, এই এককটি পাঠ করে গতিময়তার সঙ্গে স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক কিরূপ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিকীকরণ কিভাবে সামাজিক গতিময়তার সঙ্গে যুক্ত থাকে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও পাঠক অবহিত হতে পারবেন।

১৪.২ প্রস্তাবনা

আমরা বর্তমান পর্যায়ের প্রথম এককটিতে সমাজকে এক বিরামহীন প্রক্রিয়া-প্রবাহ হিসেবে জেনেছি। সমাজ হ'ল আন্তঃমানবিক সম্পর্কের এক নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। সম্পর্কগত পরিবর্তনশীলতা সামগ্রিকভাবে সমাজে গতিময়তা (mobility) নির্দেশ করে কিনা তা আলোচনার অবকাশ রাখে। সমাজভেদে গতিময়তার মাত্রা যে ভিন্ন ভিন্ন হয় তা নিয়ে অবশ্যই কোন বিতর্ক নেই। একই দেশে স্থান-কাল ভেদে গতিময়তার মাত্রাভেদ লক্ষ্য করা যায়। সমাজতাত্ত্বিকগণ দেখিয়েছেন সামাজিক গতিময়তা কিভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। স্তরবিন্যাসে যত অনমনীয় হবে ততই নিম্নমাত্রার গতিময়তা প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ সামাজিক গতিময়তা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত নমনীয় সামাজিক স্তরবিন্যাস।

সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সঙ্গেও সামাজিক গতিময়তার সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিক গতিময়তা বাধাপ্রাপ্ত হবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য। একইভাবে বলা যায়, সামাজিকীকরণ যথাযথ না হ'লে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবনে গতিময়তার প্রকাশ ঘটবে না।

বর্তমান এককটির চারটি বিভিন্ন অংশে উপরিউক্ত বিষয়গুলির বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হ'ল। সামাজিক

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে পৃথকীকরণ ও স্তরভেদ-এর পরিণতিস্বরূপ এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। এই প্রক্রিয়া হ'ল সামাজিক দূরত্ব (Social Distance) সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া নানাভাবে সামাজিক গতিময়তাকে প্রভাবিত করবে। দূরত্ব যেমন বৃদ্ধি পাবে, সম্পর্কগুলো জটিলতর হবে, গতিময়তাও তেমনি রুদ্ধ হবে।

ব্যক্তিমানুষের সামাজিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও জটিল। নানা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ হয়। কোন কোন দেশে পরিকল্পিত দীক্ষিতকরণের প্রক্রিয়া সামাজিকীকরণের স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করে। আবার কোথাও সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলো নঞর্থক ভূমিকার জন্য এবং সামাজিক অভিযোজন প্রক্রিয়ার দুর্বলতার জন্য সামাজিক বিচ্যুতি (Devience) ঘটতে পারে। সামাজিক বিচ্যুতি সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণকে নির্দেশ করে। তখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Control)-এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধরন এবং সামাজিকীকরণের অপর্যাপ্ততার মাত্রা সামাজিক গতিময়তাকে প্রভাবিত করবে।

বর্তমান এককটিতে স্তরবিন্যাস, সামাজিকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ-এর প্রক্রিয়াগুলোর ক্রমপর্যায়ে বিশ্লেষণ করে সামাজিক গতিময়তার প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা হয়েছে।

১৪.৩.১ মূলপাঠ (১ম অংশ) ঃ গতিময়তার অর্থ ও প্রকারভেদ

সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগত প্রক্রিয়াগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এক এক ধরনের সম্পর্ক এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। একজন ব্যক্তির বা একটি গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্কগুলো নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিয়েই বিস্তারলাভ করে। প্রত্যেক মানুষেরই যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলো, কর্মক্ষেত্রগুলো কর্মক্ষেত্রের অন্তর্গত সম্পর্কগুলো, কম-বেশি সুনির্দিষ্ট থাকে। বিভিন্ন সংঘ-সমিতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিশেষ বিশেষ গণ্ডীর মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার কারণ কেবল ভৌগোলিক দূরত্ব নয়। কোন মানুষ ইচ্ছা করলে তার শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী পায়ে হেঁটে যে কোন দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু, যে কোন মানুষ যে কোন পেশায় বা যে কোন প্রকার কর্মক্ষেত্রে ইচ্ছেমত নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারে না। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই সমাজের অন্য যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে সহজ ও নিয়মিত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। দেখা যাবে, মানুষের সম্পর্কগুলো নানাপ্রকার সামাজিক ব্যবধানজাত সীমাবদ্ধতার অধীন।

সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল সামাজিক এককগুলির তরফে পরস্পরের অবস্থা ও অবস্থান-এর মূল্যায়ন এবং সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ। প্রায় প্রত্যেক মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সমাজের কিছু মানুষ তার তুলনায় উচ্চমানের এবং বেশ কিছু মানুষ অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। প্রত্যেক ব্যক্তি উক্তরূপ মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিজেকে উভয়প্রকার মানুষ (বা মনুষ্যগোষ্ঠী) থেকে পৃথকীকৃত রাখে। অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চস্তরের লোকেরা তাকে উপেক্ষা করতে পারে ভেবে যে যেমন তাদের এড়িয়ে চলবে, তেমনি যাদের সে নিজে উপেক্ষণীয় মনে করে তাদের সঙ্গেও সে নিত্য সহজ মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত হয় না। দেখা যাবে, স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্কগুলো সমান ও সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই গড়ে উঠেছে। ফলত সমাজের মানুষের গতিবিধির মধ্যে, মানুষের সামাজিক আচরণের মধ্যে, একপ্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ও সীমাবদ্ধতা কাজ করে; সামাজিক গতিময়তা (Social mobility) বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভৌগোলিকভাবে আমাদের গতিবিধি যতই উন্মুক্ত থাক, সামাজিকভাবে গতিময়তা (সামাজিক সচলতা) সদা নিয়ন্ত্রিত।

সমাজে গতিময়তা নির্দেশিত হয় সামাজিক মানুষের অবস্থান (ও অবস্থার) পরিবর্তনের সুযোগ-সম্ভাবনার মাত্রা অনুযায়ী। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি অপেক্ষাকৃত সহজে তথা অপেক্ষাকৃত অবাধে তার সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে তবে সমাজে গতিময়তা রয়েছে বলা যাবে। কিরূপ শক্তি বা উপাদান ব্যক্তির (বা গোষ্ঠীর) সামাজিক

অবস্থান পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে, পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলো কি ধরনের গঠন (Structure) সৃষ্টি করছে, মানুষের বস্তুগত অবস্থার এবং সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের ফলাফলগুলো কি— এই সব বিষয়ের আলোচনাই হ'ল সামাজিক গতিময়তার আলোচনা।

পরিপূর্ণভাবে গতিময় বা নিখুঁতভাবে গতিময়—(Perfectly mobile) কোন সমাজের কথা ভাবা যায় না কেন না, কোন দেশেই সম্পূর্ণ অবাধ সামাজিক পরিবেশ বলে কিছু নেই। নানা দেশে, নানাভাবে গতিময়তা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, রুদ্ধ হচ্ছে, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কোথাও জাত-পাত এর বাধা, কোথাও রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ, কোথাও বা শ্রেণীগত বিভেদ-বন্ধন। সকলের আঙিনায় প্রত্যেকের আনাগোনা বা প্রত্যেকের আঙিনায় সকলের আনগোনা—এ কবির কল্পনামাত্র। ভৌগোলিকভাবে সম্ভব হলেও সামাজিকভাবে তা বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। সমাজের আপেক্ষিক আবদ্ধতাই এই সীমাবদ্ধ গতিময়তার কারণ। তবে সম্পূর্ণ গতিময় সমাজ যেমন দেখা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ রুদ্ধ (wholly immobile) সমাজ বলেও কিছু নেই। মানুষে-মানুষে উচ্চ-নীচ ভেদভেদ বা স্তরভেদ যেমন গতিময়তাকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, তেমনি সামাজিক সম্পর্কগুলোর বৈচিত্র্য ও অনির্দিষ্ট গতি কোন না কোন ভাবে সমাজের বন্ধনগুলোকে আল্‌গা করে দেবে।

সামাজিক গতিময়তা সাধারণভাবে উল্লম্ব ও অনুভূমিক এই দু'প্রকারের বলা যেতে পারে। গতিময়তার দিক্ নির্ণয়-এর ভিত্তিতে উল্লম্ব গতিকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করে উচ্চ-নীচ বা ঊর্ধ্ব-অধঃ এরূপভাবে বোঝান যায়। আনুভূমিক সচলতা যে কোন সমাজেই লক্ষ্য করা যাবে। সমাজের একইরূপ স্তরে; সমাজকাঠামোর মধ্যে একইরূপ অবস্থান বজায় রেখে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তরফে যে সচলতা প্রকাশ পায় তাকেই আনুভূমিক সামাজিক গতিময়তা বলা হয়। যেমন, কোন শ্রমিক যখন একই ধরনের কাজ নিয়ে এবং প্রায় একই রূপ বেতনে তার পছন্দমত কলকারখানায় যোগ দিয়ে থাকে, যখন একইরূপ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন দু'টি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় তখনও এই আনুভূমিক সচলতা পরিদৃষ্ট হয়।

উল্লম্ব সচলতার প্রকাশ ঘটে অপেক্ষাকৃত মুক্ত সামাজিক পরিবেশে। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়-এর মাধ্যমে যদি কোন ব্যক্তি কাম্য অবস্থান অর্জন করে, যদি সে তার নিজের ও তার পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানের উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়—তবে তাকে উল্লম্ব গতিময়তার একটি উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যাবে। উচ্চতর মর্যাদা অর্জন যেমন উল্লম্ব গতিময়তার পরিচায়ক, তেমনি কোন কারণে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'লে বা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নেমে গেলে তাকেও উল্লম্ব সচলতার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করতে হবে। কোন ব্যক্তি কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়-এর মাধ্যমে কোন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থার উচ্চপদে আসীন হলেন। আবার পরবর্তী কোন পর্যায়ে ওই উচ্চ পদটির সুযোগ নিয়ে আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত চাকুরী থেকে বরখাস্ত হলেন। এই উচ্চ-নীচ দু'প্রকার অবস্থানই উল্লম্ব গতিময়তার প্রকাশ।

উপরিউক্ত তিন প্রকার সচলতা (ঊর্ধ্ব, অধঃ ও আনুভূমিক) সামাজিক গতিময়তার একটিমাত্র মাত্রাকে (dimension) নির্দেশ করছে। কিন্তু গতিময়তার আরও নানান মাত্রা রয়েছে। আসলে সামাজিক গতিময়তার বিষয়টি রীতিমত জটিল বিষয়। বিষয়টি বহুমাত্রিক। গতিপথ-এর ভিত্তিতে যেমন সচলতার ত্রিবিধ প্রকারভেদ করা হ'ল, তেমনি আবার কালগত মাত্রার ভিত্তিতে দু'রকমের গতিময়তার উল্লেখ করা সম্ভব। কালগত মাত্রার নিরিখে (time dimension) দুই প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক গতিময়তার উপস্থিতির কথা বলা যেতে পারে। পিতা-মাতা বা সমতুল্যদের সঙ্গে পুত্র-কন্যাদের সামাজিক সম্পর্কগত প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করলেই এইসব প্রজন্মগত সচলতার প্রকৃতি অনুধাবন করা যাবে। এ কথা এখন নিশ্চয় বলা যায় যে, বর্তমান যুগে উক্ত দুই প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক যত সহজ হয়েছে এবং তার ফলে সামাজিক গতিময়তা যেরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে তা দু'এক প্রজন্ম আগে অভাবনীয় ছিল। একই প্রজন্মের মধ্যেও সচলতা (Intragenerational or career mobility) বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষত, যে সব সমাজে উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে সেখানে কম-বেশী সকলেই পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ পাচ্ছে। আজকাল একই বয়সী তরুণ-তরুণীরা নানাধরনের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চাইছে। ভারতীয় সমাজেও দেখা যাচ্ছে একসময় জাত-পাত-এর অনুশাসন অনুযায়ী অধিকাংশ মানুষ যেভাবে বংশানুক্রমিক নির্দিষ্ট পেশায় নিজেদের আবদ্ধ রাখত এখন আর সেইভাবে তাদের জীবনযাত্রা সীমিত থাকছে না। পেশার সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে, পেশার বৈচিত্র্য আসছে এবং তার ফলে প্রতিযোগিতার সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে। সবকিছু মিলে একই প্রজন্মের মানুষদের জীবনে সামাজিক গতিময়তা তীব্রতর হচ্ছে।

গতিময়তার আর একটি মাত্রা হ'ল স্থানগত বা পরিপ্রেক্ষিতগত (contextual dimension)। কখনও দেখা যাবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই গতিময়তা প্রসারিত হচ্ছে। আবার কোন সময়ে দেখা যাবে বিভিন্ন ধরনের পেশা বা কর্মক্ষেত্রগুলিই হ'ল সামাজিক সচলতার পটভূমি। বস্তুগত সম্বল ও সম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী হ'লে তার ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া তার পরিবারভুক্তদের জীবনও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পাবে।

সচলতা অর্জনের মাধ্যমে বা ব্যবস্থাগুলো সামাজিক গতিময়তার অন্য এক মাত্রাকে নির্দেশ করে। গতিময়তার মাধ্যম বলতে যেমন কৃতিত্ব অর্জনকারী নানাবিধ প্রক্রিয়াকে (achievement process) বোঝান হবে, তেমনি দেখা যাবে, পারিবারিক অবস্থান ও পরিবেশগত মর্যাদা আরোপণকারী প্রক্রিয়াগুলোও সামাজিক গতিময়তা বজায় রাখতে সাহায্য করছে।

সামাজিক গতিময়তার অর্থ ও প্রকরণ নিরূপণে আরও দুটি বিষয় বিবেচ্য। একটি হ'ল সচলতার মূল একক (unit of mobility) সংক্রান্ত। কোন দেশে হয়ত সমগ্র সমাজই গতিময়তায় উজ্জ্বল। যেখানে সমাজ-বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে এরূপ সার্বিক সচলতা দেখা যাবে। কোথাও সচলতার মূল একক হ'ল পরিবার বা সামাজিক স্তর। সামন্ত সমাজে যেমন দেখা যায়, অভিজাত পরিবারগুলো বা অভিজাততান্ত্রিক সামাজিক স্তরগুলো নিজেদের মধ্যে অনুভূমিক গতিময়তা বজায় রাখে। ওইসব সমাজে স্বতন্ত্রভাবে কোন ব্যক্তি হয়ত উল্লম্ব-সচলতার প্রকাশ ঘটাতে পারে; কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে সামন্ত-সমাজের মানুষেরা স্থিতাবস্থাই পছন্দ করে বলা যায়।

সর্বশেষ পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলো প্রকৃতই সামাজিক গতিময়তা প্রকাশ করছে কিনা তা জানার জন্য গতিময়তার বিষয়গত (objective) এবং বিষয়ীগত (subjective) দিক্-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। যথেষ্ট পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি পেলে একজন ব্যক্তির জীবনে বিষয়গত অর্থে গতিময়তার প্রকাশ ঘটবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি হয়ত মনে করতে পারে এই বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে তার সামাজিক মর্যাদার কোন হেরফের হ'ল না। কোন পদমর্যাদাগত উন্নতি ছাড়াই হয়ত বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল। কিংবা যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার আর্থিক উন্নতি হয়েছে, দেখা যাবে তার সমগোত্রীয় (সম অবস্থানগত) সকলেরই অনুরূপ উন্নতি হয়েছে একই প্রক্রিয়ায়। ফলে মানসিকভাবে ওই ব্যক্তি তার অর্থকরী উন্নতিকে প্রকৃত গতিময়তার প্রকাশ বলে মেনে নিতে পারছে না। যাকে ঊর্ধ্বগতি ভাবা গিয়েছিল দেখা গেল তা কোন উন্নতি বা প্রগতি নয়। সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণে এই বিষয়ীভূত (subjective) উপলব্ধির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৪.৩.২ মূলপাঠ (২য় অংশ) ঃ গতিময়তা ও স্তরবিন্যাস

সামাজিক গতিময়তার হার অনেকাংশেই নির্ভর করে সামাজিক স্তরবিন্যাস-এর প্রকৃতির উপর। সামাজিক স্তরবিন্যাস যত অনমনীয় হবে, সমাজ যতই আবদ্ধ ধরনের হবে, সমাজের গতিময়তা তত হ্রাস পাবে। যেখানে সামাজিক স্তরগুলো অপেক্ষাকৃত মুক্ত ও খোলামেলা সেখানে সামাজিক সচলতাও প্রকট। আর সেই সমাজে একটা স্তর থেকে অন্য কোন স্তরে, বিশেষত উচ্চতর কোন স্তরে, অবস্থান গ্রহণের সহজ সুযোগ নেই, অর্থাৎ যেখানে

সামাজিক গতিময়তার তেমন প্রকাশ নেই, সেখানে সমাজব্যবস্থা অচলায়তন স্বরূপ। ভারতীয় সমাজের জাত-পাত কাঠামো এই ধরনের অচলায়তনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স্তরভেদ সব সমাজেই পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক সমাজেই মানুষেরা কোন না কোন (বা একাধিক) মাপকাঠি বা মানদণ্ড অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে থাকে। স্তরবিন্যাস হয়ে জীবনযাপন করার পরিণতিস্বরূপ মানুষের মধ্যে নিজ নিজ স্তর-সংক্রান্ত ভাবাবেগজনিত ও অভ্যাসজনিত কিছু আসক্তি/অনুরাগ জন্মায়। এর সঙ্গে ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক কিংবা মান-মর্যাদাগত উপাদান যুক্ত হ'লে (যেমন জাতপাত, শ্রেণী বা মর্যাদাগত অবস্থান—ইংরাজীতে যথাক্রমে Caste, Class ও Status) দেখা যাবে প্রতিটি স্তরভুক্ত মানুষদের মধ্যে অন্য স্তরের মানুষদের সম্পর্কে একধরনের বিরোধিতার ও সন্দেহের মনোভাব দানা বেঁধেছে। এইভাবে স্তরের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব তৈরী হয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য সামাজিক দূরত্বের (Social distance) ধারণাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ভৌগোলিক ব্যবধান-এর ধারণা দিয়ে সামাজিক ব্যবধানকে বোঝান যাবে না। অবশ্য, জাত-পাত ব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাবে সামাজিক ব্যবধান ভৌগোলিক ব্যবধান-এর সাহায্যেও বজায় রাখা হচ্ছে, যেমন, যারা প্রান্তিক গোষ্ঠী, ব্রাত্য বা অন্ত্যেবাসী। সাবেকী গ্রামসমাজে দেখা যাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের মানুষদের বাবস্থান থেকে অনেক তফাতে, গ্রামের একেবারে প্রান্তে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা বাস করছে। যাদের চণ্ডাল বা পঞ্চম বর্গের মানুষ বলা হয় তাদের সঙ্গে তো উচ্চবর্ণের মানুষেরা মুখোমুখি সম্পর্কেই আসবেন না। কেরালার যেমন ইজাভা বা পুলায়া গোষ্ঠীর মানুষদের দায়িত্ব হ'ল চলাফেরার সময় তারা যেন ড্রাম বা ওই ধরনের কিছু বাজিয়ে তাদের সশব্দ উপস্থিতির কথা জানায়। নতুবা উচ্চবর্ণের কোন মানুষ তাদের সামনে এসে পড়লে সেটা তাদের তরফে গর্হিত, পাপ কাজ বলে চিহ্নিত হবে এবং সেই কারণে তাদের শাস্তিও পেতে হবে।

সাধারণভাবে বলা যায়, সামাজিক দূরত্ব সামাজিক সম্পর্কগত ব্যবধানকে নির্দেশ করে। সম্পর্ক না থাকা, সম্পর্কের অবনতি হওয়া বা সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধানিষেধ থাকা, এই সবই সামাজিক দূরত্বের প্রকাশ। সুতরাং সামাজিক দূরত্ব আর সামাজিক গতিময়তার প্রকৃতি একেবারে বিপরীতধর্মী। সামাজিক দূরত্ব যত বাড়বে সামাজিক গতিময়তা তত হ্রাস পাবে। সামাজিক গতিময়তা বৃদ্ধির উপায় হ'ল সামাজিক দূরত্ব কমিয়ে আনা। সামাজিক স্তরভেদ সামাজিক দূরত্বের নানান মাত্রা নির্দেশ করে। দু'জন মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান বা জ্যামিতিক দূরত্ব খুব বেশী থাকলেও সামাজিক অবস্থান-এর বিচারে কোন দূরত্ব নাও থাকতে পারে যদি তারা একই শ্রেণীভুক্ত বা একইরূপ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়। যেমন দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুই সেনাধ্যক্ষ। আবার বিপরীতভাবে দেখা যাবে একই গৃহে অবস্থানকারী দু'টি মানুষের মধ্যে কোনপ্রকার জ্যামিতিক দূরত্ব না থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সামাজিকভাবে দুস্তর ব্যবধান থাকতে পারে। যেমন প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক। প্রভুর সঙ্গে তার পদসেবক ভৃত্যের কোন জ্যামিতিক দূরত্ব নেই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব যেমন লক্ষ্য যোজন। স্বভাবতই, এরূপ দু'টি অবস্থানের মধ্যে কোন সামাজিক গতিময়তা পরিদৃষ্ট হবে না।

পিতিরীম সরোকিন (P. Sorokin)-এর মত কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ্ লেছেন, স্তরবিন্যাসবিহীন সমাজব্যবস্থার কথা নিছক কল্পনা বা অতিকথন মাত্র (Unstratified society is a myth)। আর স্তরবিন্যাস যদি অনিবার্য হয় তবে সামাজিক গতিময়তাও সর্বত্র নানাভাবে বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এটা ধরে নেওয়া যায়। মূল্যায়ন ও পৃথকীকরণ-এর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে স্তরভেদ সৃষ্টি হয় তা দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও চর্চার ফলস্বরূপ বিরোধ ও বিভেদের প্রাচীর তৈরী করে। যতই না কেন উদারনীতি ও গণতান্ত্রিকতার হাওয়া স্তরগুলোকে বাহ্যত উন্মুক্ত রাখুক, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে বিভেদের প্রাচীরগুলো অনেকের কাছেই দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই সামাজিক গতিময়তাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

জাত-পাত-এর কাঠামোর দ্বারা যেভাবে গতিময়তা বাধাপ্রাপ্ত তা হিন্দু সমাজে অপেক্ষাকৃত মন্থর জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। আধুনিক ভারতে জাত-পাত-এর ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধনগুলো অনেক আলগা হয়ে

এসেছে। ফলে সামাজিক গতিময়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যে জাত-পাত গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক বর্গ (Political Category) হিসেবে নতুন ভূমিকা পরিগ্রহ করছে এবং তাতে নতুন ধরনের সামাজিক সংঘর্ষের প্রকাশ ঘটছে। বলা যায়, এইসব ক্ষেত্রে গতিময়তা বৃদ্ধি পেলে সামাজিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ-এর প্রক্রিয়াটিও প্রকট হতে থাকবে।

জাত-পাত ব্যবস্থার মত অযৌক্তিক এবং গতিময়তা বিরোধ স্তরবিন্যাস পৃথিবীতে আর নেই বললেই চলে। অবশ্য শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবধানের ঘটনাটিও একইপ্রকার অযৌক্তিক এবং এটা কৃষ্ণাঙ্গদের তরফে গতিময়তা বিরোধী ব্যবস্থা। দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘকাল যেভাবে বর্ণবিদ্বেষ নীতি (Apartheid) অনুসৃত হয়েছে তাতে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাভাবিক সমাজজীবন ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে অনেক বাধা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে দেখা যায় নতন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গ নেলসন ম্যাণ্ডেলার অভিষেক হওয়ার কয়েক বছর পরও দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের চমকপ্রদ কোন উন্নতি বা গতি-প্রবণতার খবর আমরা পাচ্ছি না।

কোন কোন মহল মনে করেন, জাত-পাত ব্যবস্থা সচলতার প্রতিবন্ধক হলেও মূল বর্ণভেদ প্রথা গতিময়তার পথে বাধা সৃষ্টি করেনি। কেননা, চতুর্বর্ণের যুক্তি হ'ল গুণ ও কর্ম অনুযায়ী মূল্যায়ন ও পৃথকীকরণ। তার ফলে, নিজ প্রয়াস এবং উৎকর্ষ প্রদর্শনের সাহায্যে যে কোন ব্যক্তি, যে কোন উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তত্ত্বগতভাবে এই বক্তব্য সঠিক মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে আদৌ কখনও বর্ণপ্রথা অনুসৃত হয়েছে কিনা এবং কেনইবা চতুর্বর্ণ ভেঙে গিয়ে অসংখ্য (কয়েক সহস্র প্রায়) জাত-পাত গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল তার সহজ তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে কেবল ভারতে নয়, আর্যরা যেখানেই গেছে সেখানেই তারা বর্ণভেদ এর মত কিছু তৈরি করেছে এবং তার ফলে সেখানেও সচলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর্যদের ইরানীয় শাখার ক্ষেত্রে এরূপ জাত-পাত-এর বিভেদ পরিদৃষ্ট হয়। বিশিষ্ট পণ্ডিত গবেষক শ্রীযোগীরাজ বসু জরাথুস্ট্রধর্ম সম্পর্ক লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন, "হিন্দুধর্মের চতুর্বর্ণের ন্যায় ইরানীয় সমাজে তিনটি বর্ণ বা জাতি ছিল। ইরানীর অথ্রবন্ (পুরোহিত) ও রথিষ্টার (যোদ্ধা) যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য। এতদ্‌ব্যতীত কৃষিজীবী ও শিল্পী ইত্যাদির সমবায়কে তৃতীয় বর্ণ বলা হ'ত। পরবর্তীকালে যখন শিল্পী থেকে কৃষকদের পৃথক করা হ'ল তখন তাদের দু'টি বর্ণ ধরে সর্বসমেত চতুর্বর্ণের উল্লেখ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়।" তবে শ্রীবসু তুলনা করতে গিয়ে এটাও বলেছেন। "অবশ্য হিন্দুসমাজের মত জাতিভেদের উগ্ররূপ কোন সময়ে ইরানে ছিল না।"

যে সব সমাজে (যেমন পশ্চিমের গণতান্ত্রিক সমাজগুলোতে) জাত-পাত-এর উগ্রতা নেই, যেখানে গতিময়তা অনেক প্রবল, সেখানেও স্তরবিন্যাস রয়েছে। উপরন্তু, স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা যতই নমনীয় হোক না কেন, উচ্চ নীচ ব্যবধান নানাভাবে নিম্নস্তরের মানুষদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করবেই। সম্পূর্ণ মুক্ত সমাজ বলে কিছু নেই। তাই পরিপূর্ণ গতিময় সমাজের ধারণাও অবাস্তব। জাত-পাত-এর বিভেদ না থাক, আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস জাতবিভেদ, সামাজিক মর্যাদাগত বিভেদ কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতাগত বিভেদ সামাজিক গতিময়তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উন্নত দেশগুলোতেও সকলেই তাদের সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান বা মর্যাদাগত অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ পায় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শহরে যে সব 'ঘেটো' (ghetto) এলাকা আছে, যে সব এলাকায় সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষেরা বাস করে এবং সাধারণভাবে আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়গুলো যে আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অর্থনৈতিক উন্নতি হ'লেই সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে বা সামাজিক গতিময়তা প্রসারিত হবে এমন নয়। সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তার স্তরবিন্যাস ও গতিময়তার ধরন নির্ধারিত। যেখানে অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্তরভেদ ও সচলতার পরিবর্তন হয় না। যেমন, অতি আধুনিক ইংল্যাণ্ডে এখন রাজতন্ত্রের মত ব্যবস্থা রয়েছে ; রাজপরিবারের মানুষেরা আরোপিত সামাজিক মর্যাদা ভোগ করছেন। তেমনি, অনেক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলীয়

ক্ষমতা বা শাসনক্ষমতার মানুষদের আত্মীয়-স্বজনেরা সমাজে বিশেষ সুযোগ ও মর্যাদা পেতে থাকে। তাই স্তরবিন্যাস-এর উন্মুক্ততার ধারণা, বা সামাজিক গতিময়তার ধারণা, সব ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক।

১৪.৩.৩ মূলপাঠ (৩য় অংশ) ঃ আনুগত্য ও বিচ্যুতির প্রক্রিয়া

সমাজের স্বচ্ছন্দগতি বজায় রাখার জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে তার মধ্যে অন্যতম হ'ল আনুগত্য (Conformity) দেখান যে আনুগত্য প্রদানের প্রক্রিয়া। একই কারণে বলা যায় যে প্রক্রিয়াটি সমাজজীবনের সাবলীল ধারাকে বিনষ্ট করে, সমাজের স্বচ্ছন্দগতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা হ'ল বিচ্যুতির (Deviance) প্রক্রিয়া। সমাজে উভয় প্রক্রিয়ারই যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, সামাজিক মানুষের বড় অংশই আনুগত্য প্রদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিচ্যুতির প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা সমাজের ক্ষুদ্র অংশ।

বাহ্যত সব সমাজেই রক্ষণশীলতার প্রবণতা প্রাধান্য পায়। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে চলুক এটাই যেন সমাজের কাম্য। অনেকটা যেন গ্রীক সমাজ দার্শনিক প্লেটোর ন্যায়নীতির তত্ত্বের মতই (Theory of Justice) সমাজের কাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়াটি হ'ল সুনির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী প্রত্যেকের তরফে কর্তব্য-কর্ম সাধন। আসলে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, বিরোধ এর সব বিস্তার লাভ করলেই অনেকে শঙ্কিত বোধ করেন। স্থিতাবস্থা বা বিদ্যমান সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে মানুষ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে চায় না। সুতরাং সমাজের প্রথা, রীতিনীতি ও নানান অনুশাসন মেনে চলাটাই সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। আবার সেই কারণে সামাজিক আচার-ব্যবস্থা ও রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের (Conformity) প্রক্রিয়াকে সমাজের সর্বপ্রথম প্রক্রিয়া বলেই গণ্য করা হয়।

সামাজিক বিধি মান্য করার প্রক্রিয়া যে কারণে প্রাধান্য পেয়ে থাকে সেই কারণে সামাজিক বিধি অমান্য করা তথা সামাজিক বিচ্যুতি (Deviance) ঘটানোর প্রক্রিয়াগুলোও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বয়সের এই বিচ্যুতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। যেমন স্কুল-পালানো ছেলে বা কিশোর অপরাধী (Truant boy) কিংবা তরুণ বয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা (Juvenile delinquency) এবং পরবর্তী স্তরে প্রকৃত অপরাধী (criminal) বা প্রাপ্তবয়স্কদের দুর্নীতি ও দুরাচার। এইসব বিচ্যুতিমূলক প্রক্রিয়াকে সমাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ (anti-social activities) নামেও অভিহিত করা হয়। সামাজিক স্থিতাবস্থা যে কোন উপায় বজায় রাখা আধুনিক যুগে অনেকেই সঠিক বলে মনে করেন না। রক্ষণশীলতার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া সমাজজীবনধারার সুস্থ, স্বাভাবিক দিক বলে গণ্য করা হচ্ছে না। কিন্তু, এ বিষয়ে সকলে একমত যে, পূর্বোক্ত অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপজনিত বিচ্যুতির প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এজন্য সব সমাজেই পুরস্কার ও শাস্তির বন্দোবস্ত (function of reward and punishment) থাকে।

সামাজিক বিচ্যুতির কারণ বা উৎস নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকগণ নানা ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব হাজির করেছেন। অপরাধী ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক গঠন কতটা দায়ী, তার শারীরিক গঠনের সঙ্গে বিচ্যুতিমূলক ক্রিয়াকলাপের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং সর্বোপরি সামাজিক পরিবেশে এর সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার কিরূপ সম্পর্ক— এই সব বিষয় নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকগণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে চলেছেন। এমিল দুরখাইম (Emile Durkhaim)-এর সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি সামাজিক ঘটনা বা সামাজিক বস্তুসত্য (Social fact) হিসেবে অপরাধপ্রবণতার সামাজিক ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করতে হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে সেইসব ব্যাখ্যার বিস্তারিত উপস্থাপনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সামাজিক বিচ্যুতির প্রক্রিয়াগুলো যে নানাবিধ প্রকৃতির সেকথা এখানে বলার প্রয়োজন আছে। চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে গৃহস্বামীকে হত্যার জন্য অভিযুক্ত যে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে, আর স্বাধীনতা আন্দোলনে

যুক্ত হয়ে ইংরেজদের হত্যার জন্য যারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল আনুষ্ঠানিক আইনের দৃষ্টিতে তারা সকলেই একই রূপ অপরাধী। কিন্তু সামাজিক বিচ্যুতির আলোচনায় এদের সমগোত্রীয় অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না। এমন কি স্বাধীনকামী রাজনৈতিক অপরাধীদের (Deviant) বা সামাজিক রীতি লঙ্ঘনকারী বলেও অভিহিত করা হয় না। দেশের ও সমাজের স্বাধীনতা তথা প্রগতি আনার জন্য যারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হলেন তাঁদের কোন কারণেই অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত করা যাবে না।

সামাজিক প্রথা বা সামাজিক রীতিনীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথা ভেঙে বা কোন সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করে নতুন জীবনচর্যার সূত্রপাত ঘটানো, এইসব ক্রিয়াকলাপ উত্তরকালের মানুষদের অনুধাবনায় বৈপ্লবিক ক্রিয়া বলে চিহ্নিত হতে পারে। যেমন, রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিভিন্ন কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বলা যায়। সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি, ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন, 'কালাপানি' পার হয়ে বিলাত-যাত্রা, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, নারী-শিক্ষার আয়োজন ইত্যাদি কার্যকলাপ তৎকালীন বঙ্গদেশে সামাজিক বিচ্যুতিমূলক ক্রিয়া হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছিল। বঙ্গদেশ তথা ভারতীয় সমাজের আধুনিক ধারার এই উদ্বোধকগণ তাঁদের সমকালীন সমাজপ্রধানদের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। রক্ষণশীল শক্তিগুলো এঁদের কাজে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন; এঁদের সামাজিক বিচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু, পরবর্তী প্রজন্ম এঁদের প্রগতিশীল এবং আধুনিকতার অগ্রদূত বলেই চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে একসময় যা সামাজিক বিচ্যুতি বলে মনে হয়েছে অন্য সময় তা সামাজিক প্রগতি বলে অভিহিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, নির্দিষ্ট ক্রিয়াটির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তার প্রকৃতি নির্দ্ধারণে সাহায্য করবে। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্রিয়া বিবেচিত হচ্ছে তাদের আদর্শ-নিষ্ঠার বিষয়টিও মনে রাখতে হবে। একেবারে ব্যক্তিগত স্বার্থে যে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত তাকে যে কোনও দেশে ও কালে খুনী আসামী বলেই চিহ্নিত করা হবে; তাকে কোনমতেই বিপ্লববাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয়-বাদল-দীনেশদের সমগোত্রীয় বলা হবে না।

যে সব বিচ্যুতিমূলক ক্রিয়াকলাপের উৎস সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন সামাজিক মর্যাদামূলক অবস্থান বা সম্মানজনক ক্রিয়াকলাপের সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, যেখানে নির্দিষ্ট ক্রিয়াটির সমর্থনে সমাজের কোন কল্যাণকামী গোষ্ঠী এগিয়ে আসছে না, সেইসব বিচ্যুতিমূলক ক্রিয়া কোনওভাবেই পরবর্তীকালে প্রগতিমূলক বলে চিহ্নিত হ'তে পারে না। তাই প্রত্যেক সমাজেই কিছু ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অভিন্নভাবেই সামাজিক বিচ্যুতি (Diviance) উদাহরণ হিসেবে গণ্য হ'তে পারে। অকারণ ঔদ্ধত্য, অগ্রজ-প্রবীণদের প্রতি অশ্রদ্ধা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগ, নারী-নিগ্রহ, অধস্তনদের উপর নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো উৎকোচ-গ্রহণ নানাপ্রকার দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি-খুন-জখম ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ সকল সমাজেই সামাজিক বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য হবে। বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে এইসব বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালানো হয়

বিচ্যুতির জন্য যেমন শাস্তি, তেমনি আনুগত্য প্রদানের জন্য পুরস্কার। আনুগত্য পুরস্কৃত হয় বলে সমাজে স্থিতাবস্থাই (Status Quo) কাম্য এটা অবশ্য মনে করার কারণ নেই। আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আইনগত সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাঠামো তাদের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে একপ্রকার সামাজিক স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে ঠিকই; কিন্তু তাই বলে সমাজতাত্ত্বিকগণ এরূপ সুপারিশ/প্রস্তাব করতে পারেন না যে সামাজিক মানুষের দায়িত্ব হ'ল সর্বতোভাবে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা কেননা, আপাত ভারসাম্য বিনষ্ট করে মানুষ তো সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকেও শক্তিশালী করে তুলতে পারে সুতরাং আনুগত্য প্রকাশ বা Conformity বলতে এমন সামাজিক প্রক্রিয়াকে বোঝান যাবে না যা বিদ্যমান সমাজকাঠামোগুলোর সনাতন কার্যপ্রক্রিয়াকে অপরিবর্তনীয় ও চরম আদর্শ বলে নির্দেশ করবে। এই প্রসঙ্গে সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক গতিময়তার ধারাগুলো বিচার করা যেতে পারে।

সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রথা ও রীতিনীতির কাঠামোগুলো এবং সামাজিক স্তরভেদগুলো অপরিবর্তিত রেখে মেনে চলার প্রক্রিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে Conformity বা আনুগত্য প্রদান প্রক্রিয়া বলা হয়। কিন্তু এর আরেকটি অর্থ হ'ল আনুগত্য প্রদানকে সামাজিক গতিময়তা-বিরোধী প্রক্রিয়া বলে গণ্য করা। সামাজিক স্তরবিন্যাস অনমনীয় হ'ল সামাজিক গতিময়তা স্তব্ধ হয়ে যায়। সেই নিস্তরঙ্গ সমাজকাঠামো মান্য করার যে প্রক্রিয়া তা সমাজের সুস্থ, স্বাভাবিক, অবস্থার পরিচায়ক নয়। যেমন ভারতীয় জাত-পাত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বহুবিচিত্র প্রথা ও রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ (conformity) কোন স্বাভাবিক, সুস্থ ক্রিয়া বলে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং, যে কোন প্রকার সংস্কারকর্ম বা বিরোধী ক্রিয়াকলাপকে যেমন, সামাজিক বিচ্যুতি (Deviance) বলা যায় না, তেমনি সমাজের বিদ্যমান যে কোন অবস্থা-ব্যবস্থাকে প্রশ্নাতীত মনে করে মেনে চলার (conformity) মধ্যে কোন উন্নত সামাজিকতা প্রকাশ পায় না।

এলবার্ট কোহেন (Albert Cohen) বলেন সামাজিক বিচ্যুতিকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতার সমার্থক প্রক্রিয়া বলা ঠিক নয়। তিনি মনে করেন, বিচ্যুতির প্রক্রিয়াগুলো যেমন সমাজব্যবস্থার পক্ষে কর্মনাশকারী (dysfunctional) প্রবণতা হিসেবে নঞর্থক ভূমিকা নেয়, তেমনি স্থান-কাল ভেদে কোন কোন বিচ্যুতি সদর্থক বা positive ভূমিকা নিতে পারে। আমরা যেমন রামমোহন বা বিদ্যাসাগর-এর সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলোর কথা উল্লেখ করেছি। আনুষ্ঠানিক অর্থে বিচ্যুতি হ'লেও সেইসব ক্রিয়াকলাপ বঙ্গসমাজের পক্ষে dysfunctional না হয়ে বরং Positively functional বা সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে।

বিচ্যুতি (Deviance) কোন না কোন রূপে সর্বত্র বিরাজমান। সামাজিক বিধিব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনি বিধিভঙ্গের প্রবণতাও সর্বজনীন (where there are rules, there is deviance)। আর সেই বিধিভঙ্গকারীদের সামলাবার জন্য সমাজে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাও থাকে। এক্ষণে আমরা সেই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

১৪.৩.৪ মূলপাঠ (৪র্থ অংশ) ঃ সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও গতিময়তা

সমাজের মূলস্রোতগুলো থেকে বিচ্যুত তথা সমাজের মূল জীবনধারাগত মান (Standard) থেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচার-আচরণকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখার যে প্রক্রিয়া তাকে Social Control বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। বিচ্যুতির ঘটনাগুলো অবিরাম ধারা তৈরী করে; তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াও নিরবচ্ছিন্ন। নিয়ন্ত্রণবিহীন সমাজের কথা ভাবাই যায় না। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠান বহির্ভূত, নানা ধরনের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত অবলম্বন করে সমাজ তার অন্তর্গত 'বিপথগামী' শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে যেমন বলপ্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সংস্কৃতিগত চাপ এবং আদর্শ ও মূল্যবোধগত প্রভাব সৃষ্টি করাও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এছাড়া প্রথা, লোকাচার লোকনীতি, ধর্ম ও নৈতিকতার চাপ তো আছেই।

অধিকাংশ মানুষের মূল জীবনধারা অনুসরণ করে চলা এবং সংখ্যালঘু মানুষ ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধী আচরণ প্রকাশের প্রবণতা—এরূপই বোধ করি মানবসমাজের সর্বজনীন চিত্র। সমাজের গতিময়তা যে সব উপাদান শক্তির সাহায্যে বজায় থাকে তার মধ্যে এইসব আচার-আচরণগত ভিন্নতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত। দ্বন্দ্ব-সংঘাত গতি আনে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে সেই গতির ভয়ঙ্কর পরিণতিকে নির্দেশ করে। এই কারণেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপস্থিতি। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অর্থই হ'ল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরোধ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিরোধ জীবনবোধজনিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংযত করার প্রক্রিয়া। তবে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য সামাজিকীকরণের (Socialization) ধারণাটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কেননা,

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে অসম্পূর্ণ বা অপরিণত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে দায়ী করা হয়।

মানুষ স্বভাবজাত প্রবণতায় সংঘবদ্ধ হ'লেও (Gregariousness) স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সামাজিক চরিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহণ করে না। মানুষের সামাজিক চরিত্র যে প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয় তাকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বা Process of Socialization বলা হয়। সামাজিকীকরণ একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া। ব্যক্তি যখন তার চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে থাকে তখন এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। সেই কারণে দেখা যায় শৈশবকাল থেকেই এই প্রক্রিয়া চলছে।

এই অর্থে সামাজিকীকরণ হ'ল ব্যক্তি-মানুষের জীবনে এক আমরণ প্রক্রিয়া। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের প্রতিনিয়ত সমাজজীবনধারার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে নতুন করে শিক্ষিত ও অবহিত হতে হয়। কেতাবী সমাজদার্শনিক না হয়েও রামকৃষ্ণদেব এই সত্যটি নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন—'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'। এই সংক্ষিপ্ত কথাটি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মূল অর্থ প্রকাশ করছে। পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী বিদ্যায়তন, খেলার সাথী, বয়স্কদের গোষ্ঠী প্রভৃতি নানা পর্যায়ে বিভিন্ন সংঘ-সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষ অবিরাম নিজেকে সামাজিকভাবে শিক্ষিত করে তোলে। সমাজের মূল ধারা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সে নির্বাচন করতে শেখে। এই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান যত্নশীল থাকবে এটা আশা করা যায় না। কোনও কোনও স্তরে কোনও কোনও ব্যক্তির মনে মূল ধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'তে পারে। ভিন্ন কোন পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মনে বিদ্রোহী ভাব প্রকট হ'তে পারে। এই ভিন্নতা, এই বিদ্রোহমূলক মানসিকতা, নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে বিদ্যমান সংস্কৃতি-বিরোধী আচরণে উৎসাহিত করবে সমাজ তখন তাদের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা অপরিণত সামাজিকীকরণের ফলস্বরূপ সামাজিক বিচ্যুতি লক্ষ্য করে। আর তখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও গুরুত্ব অনুভূত হয়।

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সামাজিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কোন প্রকার বিচ্যুতি (অর্থাৎ বিদ্যমান সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি-বিরোধ আচার-আচরণ) দেখা দিলে তার উপর বিভিন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপিত হ'তে থাকবে। সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার এই পারস্পরিকতার ভিত্তিতে উভয়কে উভয়ের পরিপূরক হিসেবে নির্দেশ করা যেতে পারে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন প্রথমে সামাজিক সচেতনতার (Social awareness) স্তর-৭/৮ বছর বয়স পর্যন্ত। পরবর্তী স্তরে খেলাধুলা ও আনন্দ প্রকাশের পর্যায়ে লক্ষ্য করা যাবে ১৭/১৮ বছর বয়স পর্যন্ত—একে ইংরাজীতে বলা হয়েছে Social enjoyment-এর স্তর। জীবনের বাকী অংশ হ'ল Social responsibility বা সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্তর। হ্যারী জনসন (Harry Johnson) তাঁ 'Sociology' নামক গ্রন্থে সামাজিকীকরণের নিম্নরূপ চারটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

(১) ওরাল (Oral) স্তর—যখন মানবশিশু সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভরশীল ঃ

(২) এ্যানাল (Anal) স্তর—যখন শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার পর্যায় এবং সে নানাভাবে তা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের চেষ্টা চালিয়ে থাকে।

(৩) ইডিপাল (Aedipal) স্তর—যখন স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নির্ণয়ের মাধ্যমে সে নিজের বিশিষ্ট সামাজিক অব ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়।

(৪) এ্যাডোলোসেন্স (adolescence) স্তর—যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর্যায়; যখন ব্যক্তি তার সামাজি দায়িত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট শিক্ষালাভ করে থাকে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে যেরূপভাবে স্তরবিন্যাস করা হোক্ না কেন, প্রত্যেক স্তরেই দেখা যাবে শিক্ষ

ব্যবস্থা ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থার ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। পরিবার, প্রতিবেশী ও বিদ্যায়তনের মাধ্যমে যখন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তখন ওই মাধ্যমগুলোই আবার প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ও আরোপ করে থাকে। আসলে সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল মাধ্যমগুলো অভিন্ন। বলা যেতে পারে, পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল-এর মত মাধ্যমগুলি দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ উভয় প্রকার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো (formal agencies) হ'ল ঃ (ক) রাষ্ট্রশক্তির অন্তর্গত প্রশাসন, আইন, পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা। (খ) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ—স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

Informal agencies বা পরোক্ষ, অনুষ্ঠান-বহির্ভূত, মাধ্যমের উদাহরণ হিসেবে প্রথা, লোকাচার, লোকনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রচার-মাধ্যম, সভা-সমিতি, সাহিত্য ও সামাজিক চিন্তা-ভাবনা উল্লেখ করা যায়। ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ পরোক্ষ মাধ্যম হিসেবেই গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ভাবেই সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে। বিদ্যায়তনের আনুষ্ঠানিক পাঠগ্রহণকালে বিদ্যার্থীর আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত; আবার বিদ্যায়তনের বাইরে নানা গ্রন্থ পাঠ করে, অভিজ্ঞ ও পণ্ডিতজনের বক্তব্য শুনে এবং সর্বোপরি সামাজিক সম্পর্কজাত অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ নিত্য-নতুন শিক্ষা লাভ করে।

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো যে রকমই হোক্ না কেন, তাদের কার্যকারিতা নির্ভর করে তাদের ভিত্তি বা সমর্থনের উপর। অনেকে মনে করেন শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করতে গেলে দমনপীড়ন বা বলপ্রয়োগের উপর নির্ভর না করে উপায় থাকে না। ম্যাকআইভার ও পেজ (MacIver & Page) এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত বক্তব্য রেখেছেন। তাঁরা বলেন, কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থাকে সুস্থ-স্বাভাবিক রাখা সম্ভব নয়; আবার অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে দমনপীড়নকে যুক্ত না করলেও সেই সমাজব্যবস্থা নিরাপদ হয় না।

সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া একে অপরের পরিপূরক হিসেবে যে ভূমিকা পালন করে তা অনুধাবন করা যায় সামাজিক গতিময়তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া দু'টির ভারসাম্য অবস্থান সামাজিক গতিময়তার অপেক্ষাকৃত উন্নত রূপকেই নির্দেশ করবে। সদা পরিবর্তনশীল সমাজজীবনের সামাজিক হয়ে ওঠার যে শিক্ষা-প্রক্রিয়া (তথা সামাজিকীকরণ) তাতে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। উপরন্তু, অধুনা সেই শিক্ষা-প্রক্রিয়া রক্ষণশীলতা ও আরোপিত মর্যাদার প্রবণতাকে সংযত করে। পরিণতিতে গতিময়তা বৃদ্ধি পায়। অতীতের জাত-পাত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত সমাজজীবনধারা অতিক্রম করে বর্তমান ভারত এরূপই অপেক্ষাকৃত গতিময় সমাজজীবন প্রকাশ করছে। (পরবর্তী এককটিতে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার তাৎপর্য আলোচিত হবে)।

১৪.৪ সারাংশ

১ম অংশ ঃ সামাজিক মানুষের সম্পর্কগুলো ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। উচ্চ-নীচ স্তরভেদ থাকার জন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলো অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট ও সীমিত। ভৌগোলিকভাবে মানুষের গতিপথ উন্মুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিকভাবে সচলতা নিয়ন্ত্রিতা। সম্পূর্ণ অবাধ সমাজ-জীবনের কোন ধারণা আমরা করতে পারি না। আবার সম্পূর্ণ আবদ্ধ সমাজ বলেও কিছু নেই। অপেক্ষাকৃত মুক্ত সমাজে উল্লম্ব সচলতা দেখা যাবে। তবে সব সমাজেই অনুভূমিক সচলতা দেখা যাবে। অর্থাৎ

একইরূপ সামাজিক মর্যাদাগত অবস্থানের মধ্যে আনাগোনা সমাজের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। কালগত বা বিভিন্ন প্রজন্মগত সচলতা বৃদ্ধি পেতে পারে উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ-এর বিস্তার ঘটলে। গতিময়তার স্থানগত মাত্রা বা পরিপ্রেক্ষিতগত মাত্রা সমাজজীবন বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক গতিময়তার প্রকৃতি অনেকটাই নির্ভর করে তার মাধ্যমগুলির উপর—যেমন, নানাবিধ কৃতিত্ব অর্জন, পারিবারিক অবস্থান, বিশিষ্ট পেশা ইত্যাদি গতিময়তার প্রকৃতি বিবেচনায় ব্যক্তির মানসিকতার সঙ্গে সামাজিক দিকটি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

২য় অংশ ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাস-এর নমনীয়তার সঙ্গে সামাজিক গতিময়তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অনমনীয় জাত-পাত কাঠামো যেভাবে ভারতীয় সমাজের গতিময়তা রুদ্ধ করেছে তাতেই সম্পর্কটি নির্দেশিত। সামাজিক স্তরভেদ সামাজিক দূরত্বের ধারণাকে নির্দেশ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ভৌগোলিক দূরত্বের দ্বারাও চিহ্নিত (যেমন, তথাকথিত চণ্ডাল বা অস্পৃশ্যদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষদের ব্যবধান)। তাই সমাজে সচলতা বা গতিময়তা বৃদ্ধির অন্যতম শর্ত হ'ল সামাজিক দূরত্ব কমিয়ে আনা। জ্যামিতিক দূরত্ব শূন্য হ'লেও (যেমন প্রভু ভৃত্য) সামাজিক ব্যবধান দুস্তর হ'তে পারে। অবিরাম মূল্যায়ন ও পৃথকীকরণ-এর মধ্য দিয়ে মানুষে-মানুষে স্তরভেদ বজায় রাখা হয়। এর সঙ্গে রয়েছে ধর্মীয় ও অর্থনীতির অবস্থানগত ভেদাভেদ। জাত-পাত-এর মত শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবধান ও সামাজিক সচলতা-বিরোধী অযৌক্তিক প্রক্রিয়া। পশ্চিমী উন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক শ্রেণী ও মর্যাদাগত শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেইসব স্তরভেদ ব্যবস্থা কিছুমাত্র কম অমানবিক নয়।

৩য় অংশ ঃ সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপকে সামাজিক বিচ্যুতি বলা হয়। তবে কিনা সমাজের বড় অংশই সমাজব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য (conformity) প্রকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। সামাজিক বিচ্যুতির (Deviance) দায়ে অভিযুক্ত কিশোর অপরাধী, তরুণ দুষ্কৃতী, প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সমাজবিরোধীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। আবার কি উদ্দেশ্যে বা কিরূপ লক্ষ্য বা আদর্শ নিয়ে কোন ব্যক্তি সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে সেটা বিচার না করে অপরাধের প্রকৃতি নির্ণয় করা যাবে না। কেননা, যাঁরা সমাজ সংস্কারক তাঁরাও একরকম সমাজব্যবস্থা-বিরোধী মানুষ বলে চিহ্নিত ও সমালোচিত হয়েছে। দেখতে হবে, যিনি বিচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত তিনি মূলত সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করেছেন কিনা। ঔদ্ধত্য, অশ্রদ্ধা, বলপ্রয়োগ, নির্যাতন, চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম ইত্যাদি ক্রিয়া সাধারণভাবে সামাজিক বিচ্যুতির পরিচায়ক ব্যক্তিগত স্বার্থে বিরোধিতা যেমন শাস্তির যোগ্য তেমনি বিনা বাক্যে রক্ষণশীল সমাজের বিধি মেনে চলার মধ্যে কোন মহত্ব থাকতে পারে না। মনে রাখতে হবে সামাজিক ব্যবস্থা অনমনীয় স্তরবিন্যস্ত ও রক্ষণশীল হ'লে তা সামাজিক সচলতার বিরোধী হবে। এক নিশ্চরঙ্গ সমাজ-কাঠামো মেনে চলা সুস্থ আনুগত্যের পরিচায়ক নয়। বরং স্থান-কাল ভেদে এবং সদর্থক পরিণতি লক্ষ্য করে অনেক তথাকথিত বিচ্যুতিমূলক ক্রিয়াকেও সমাজের পক্ষে functional বা কার্যকারী মনে হবে।

৪র্থ অংশ ঃ প্রত্যেক সমাজেই তার সুনির্দিষ্ট জীবনধারাগত মান থেকে সম্ভাব্য বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিস্তারিত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত থাকে। নানান মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রভাব থেকে শুরু করে বলপ্রয়োগ (এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড) পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা হয়। অসম্পূর্ণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োগ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণ একটি শিক্ষণ-প্রক্রিয়া। দেখা যাবে সামাজিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়া আর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমগুলি প্রায় অভিন্ন। নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিকীকরণ পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে ক্রিয়াশীল

সামাজিকীকরণের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। আনুষ্ঠানিক মাধ্যম ছাড়াও অসংখ্য পরোক্ষ মাধ্যমের সাহায্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়। বিদ্যায়তনের শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে যেমন সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ উভয় প্রকার প্রক্রিয়া চালু থাকে, তেমনি বিদ্যায়তনের বাইরে অনুষ্ঠান-বহির্ভূত নানা গ্রন্থ পাঠ করে বা অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞদের বক্তব্য পরামর্শ শুনে এবং সর্বোপরি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া চলতে পারে। সামাজিক গতিময়তার কাম্য মাত্রা প্রকাশ পেতে পারে নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ভারসাম্যাবস্থার মধ্য দিয়ে।

১৪.৫ অনুশীলনী

১। নিচে দেওয়া বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (Ö) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

	ঠিক	ভুল
(ক) সংঘ-সমিতিগুলোর ক্রিয়াকলাপ বিশেষ বিশেষ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।	☐	☐
(খ) সম্পূর্ণ গতিময় সমাজ যেমন রয়েছে তেমনি সম্পূর্ণ আবদ্ধ সমাজেরও উদাহরণ আছে।	☐	☐
(গ) সামাজিক গতিময়তা অর্জনের ক্ষেত্রে পারিবারিক অবস্থানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।	☐	☐
(ঘ) সামাজিক স্তরবিন্যাস অনমনীয় হ'লে সামাজিক গতিময়তা হ্রাস পাবে।	☐	☐
(ঙ) তত্ত্বগতভাবে বর্ণভেদ প্রথা গতিময়তা বিরোধী নয়।	☐	☐
(চ) উন্নত দেশগুলোতে স্তরবিন্যাস কোনভাবে সামাজিক সচলতার প্রতিবন্ধক হয় না।	☐	☐
(ছ) সামাজিক অনুশাসন বিনা প্রতিবাদে মেনে চলাটাই সুস্থ জীবনের লক্ষণ।	☐	☐
(জ) একসময় যা সামাজিক বিচ্যুতি বলে নির্দেশিত পরবর্তীকালে তা সামাজিক প্রগতি বলেও চিহ্নিত হতে পরে।	☐	☐
(ঝ) সামাজিকীকরণকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পরিপূরক হিসেবে গণ্য করতে হয়।	☐	☐

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন ঃ

(ক) সামাজিক গতিময়তা বলতে কি বোঝায়?

(খ) সামাজিক গতিময়তার বিভিন্ন রূপ বা ধরনগুলি নির্দেশ করুন।

(গ) সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সামাজিক গতিময়তার সম্পর্ক নির্দেশ করুন।

(ঘ) সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক নির্দেশ করুন।

(চ) 'সামাজিক বিচ্যুতি' বলতে কি বোঝায়? 'বিচ্যুতি'র সঙ্গে অনুগত্য প্রকাশের সম্পর্ক দেখান।

(ছ) সামাজিকীকরণে স্তরগুলি নির্দেশ করুন।

১৪.৬ উত্তরমালা

(১) (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (ক) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ভুল, (জ) ঠিক, (ঝ) ঠিক

১৪.৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

1. Alex Inkeles : What is Sociology? Prentice-Hall of India Ltd.
2. Melvin M. Tumin : Social Stratification, Prentice-Hall of India Ltd.
3. Albert K. Cohen : Deviance and control, prentice-Hall of India Ltd.
4. Harry M. Johnson : Sociology a Systematic introduction, Harcourt, Brace and world New York.

একক ১৫ □ সামাজিক পরিবর্তন

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ মূলপাঠ

১৫.৩.১ সামাজিক পরিবর্তন এর অর্থ

১৫.৩.২ সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক বিকাশ

১৫.৩.৩ সামাজিক প্রগতি

১৫.৩.৪ পরিবর্তনের ব্যাখ্যাসমূহ

১৫.৪ অনুশীলনী

১৫.৫ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১৫.১ উদ্দেশ্য

সমাজ বলতে যা বোঝায় তার একটি প্রধান অংশ হ'ল পরিবর্তনশীলতা। সামাজিক সম্পর্কের যে অবিরাম ধারার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রকাশ ঘটে তাতে পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি প্রকট হয়। বর্তমান এককটি সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ নিরুপম করে সমাজ প্রবাহ এর মূল প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়। পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিবর্তন ও প্রগতি-প্রক্রিয়ার কিরূপ সম্পর্ক সেটাও নির্দেশিত হবে।

১৫.২ প্রস্তাবনা

আন্তঃমনবিক সম্পর্কের এক জটিল বিন্যাস হিসেবে মানবসমাজকে বুঝতে হয়। এই জটিল গঠনটি অবশ্যই স্থির, নিশ্চল, কোন ব্যাপার নয়। এই গঠন, এই সম্পর্কের বিন্যাস সদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ 'সমাজ' কথাটি উচ্চারিত হ'লেই আমরা মানবিক সম্পর্কের এই অবিরাম ধারার কথা ভাবব। কিন্তু সমাজকে প্রবাহ (Process) হিসেবে গণ্য করার অর্থ এই নয় যে সেই প্রবাহের অন্তর্গত সম্পর্কের বিন্যাসগুলো প্রতি মুহূর্তে হারিয়ে যাচ্ছে মনে করা। এখানে বিরামহীনতাকে আপেক্ষিক অর্থে বুঝতে হবে। সম্পর্কের যে সব বন্ধন বা বিন্যাস তৈরী হচ্ছে তাদের সুনির্দিষ্ট কাজ (function) রয়েছে। সুতরাং বিন্যাসগুলো বাস্তব, যেমন তার পরিবর্তনশীলতাও বাস্তব। উদাহরণ হিসেবে পরিবার কাঠামোর কথা বলা যায়। আদিম সমাজে পরিবার কাঠামো যেমন ছিল, এখন তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবুও এটাও ঠিক যে, কোন না কোন রকমের পারিবারিক কাঠামো বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান। জানা প্রয়োজন, পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝব, কেনই বা পরিবর্তন ঘটছে। বোঝা প্রয়োজন পরিবর্তনের সঙ্গে প্রগতির সম্পর্ক কিভাবে নির্দ্ধারিত হবে। বর্তমান এককের বিভিন্ন অংশে এই সব বিষয়েরই অবতারণা হবে।

১৫.৩.১ মূলপাঠ (১ম অংশ) ঃ সামাজিক পরিবর্তন এর অর্থ

'সমাজ'কে প্রবাহ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিকগণ 'বিবর্তন', 'পরিবর্তন', 'বিকাশ', 'প্রগতি' ইত্যাদি শব্দ ঘন ঘন প্রয়োগ করে থাকেন কোন কোন লেখক এই শব্দগুলোকে প্রায় সমার্থক মনে করে ব্যবহার করেন। এবং তা অবশ্যই খুব সরলীকৃত ব্যবহার। তবে সমাজ ও সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে আমরা এটা লক্ষ্য করব যে ঐ শব্দগুলো যে ধরনের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করছে সেই সব প্রক্রিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবেই সম্পর্কিত।

সমাজজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক তার পরিবর্তনশীলতা। ব্যক্তি মানুষ বা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী তাদের অনেক কিছুই অপরিবর্তিত রাখতে চায়—যে সম্মান বা অবস্থান সে অর্জন করেছে, যে ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ সে ব্যবহার করছে, যে সব আচার-ব্যবস্থা সে অনুসরণ করে ইত্যাদি। কিন্তু ঘটনা হ'ল এসবের কোনটাই অপরিবর্তিত থাকে না। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীও কালক্রমে পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

পরিবর্তন প্রক্রিয়ার এই অনিবার্যতার ও সর্বজনীনতার কথা মনে রেখেই আমরা সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ নির্ণয় করব। আমরা যে অতীতের বিভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতি এখন 'অদ্ভুত' ও 'সেকেলে' বলে ঘোষণা করি, পুরানো দিনের কোন ইতিহাস পড়ে বিস্ময় প্রকাশ করি, আগেকার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে মুগ্ধ হই—আমাদের এই সব প্রতিক্রিয়া পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ফল। প্রশ্ন হ'ল যে কোন অবস্থার এবং যে কোন ধরনের পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা যাবে কিনা। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক কিংস্‌লে ডেবিস্ তাঁর 'Human Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের পার্থক্য নির্দেশ করে পরিবর্তনের বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। তাঁর মতে কেবলমাত্র সামাজিক সংগঠনে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলা শ্রেয়। তিনি সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অংশ বলে অভিহিত করতে চান। শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রযুক্তি ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানবজীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায় তার সবকিছু সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে গণ্য হতে পারে না। অবশ্য ডেভিস্ কিভবে সাংস্কৃতিক জীবনধারা ও উপাদানকে সামাজিক সংগঠন থেকে আলাদা করে দেখাবেন সেটা তাঁর গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারছি না। বস্তুতঃ অনুরূপ সামাজিক সাংস্কৃতিক দ্বিত্বভাবের উপর জোর না দিয়েই আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি সামাজিক পরিবর্তন হ'ল সমাজের কাঠামোগত এবং কার্যধারাগত পরিবর্তন, যে কোন প্রকার অস্থিরতা, যে কোন মাত্রার অনবস্থতা, যে কোন নতুন ঘটনা বা প্রক্রিয়াকে সামাজিক পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যাবে না। তবে এই সব কিছুই কালক্রমে বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হয়ে সামাজিক পরিবর্তন সংগঠনে সহায়তা করতে পারে। যেমন, কিছু মানুষের ভাষাগত পরিবর্তন সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার অঙ্গ হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে না হ'লেও কালক্রমে সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা কলকাতায় বসবাস করে ক্রমে একটি নির্দিষ্ট কলকাতার ভাষা আয়ত্ত করে বাংলার সমাজজীবন ও সংস্কৃতির এক ব্যাপক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভাষাগত পরিবর্তন সেই সব মানুষের ব্যাপক জীবনধারার পরিবর্তনের অঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলো সামাজিক পরিবর্তনের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু মিথস্ক্রিয়া আর পরিবর্তন সমার্থক নয়। সমাজের বিদ্যমান কাঠামোগুলোর মধ্যে ব্যক্তি-মানুষেরা নিত্য মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত। সেই সব মিথস্ক্রিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান রূপ পরবর্তী কোন এক স্তরে পরিবর্তন সংঘটিত করতেই পারে। কিন্তু কেবল মিথস্ক্রিয়া হিসেবে কোন পারস্পরিক সম্পর্কের ধারাকে পরিবর্তনের সূচক বলা যাবে না। শ্রমজীবীদের সঙ্গে মালিকগোষ্ঠীর নানা কারণে নানা সময়ে মিথস্ক্রিয়া চলছে। সেই সব মিথস্ক্রিয়া দীর্ঘকাল চলার পরও কোনও সামাজিক পরিবর্তন বলে গণ্য হবে না, দু'একজন শ্রমিকের বরখাস্ত হওয়া, দু'এক জনের মৃত্যু, মালিকগোষ্ঠীর দু'একজনের পরিবর্তন,

কিছু মজুরী বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা ঘটনা ঐ সব মিথস্ক্রিয়ার ফল হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি কখনও শ্রমিক-মালিক এর সম্পর্কে প্রথমে কারখানার সামগ্রিক গঠনে এবং পরে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করে তবেই তা সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার রূপ বলে নির্দেশিত হতে পারে।

ডেভিস সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে আরও দু একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন। কোন ঘটনার আকস্মিকতায় মনে হতে পারে যে, তা ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী কোন পরিবর্তন আনবে। কিন্তু দেখা যাবে হয়ত বিশেষ কোন আলোড়ন সৃষ্টি না করেই তা অল্পকালের মধ্যেই মানুষের স্মৃতির আড়ালে চলে গেল। যেমন, বলা যায়, ১৯৯৮ সালে জুন মাসে ভারত ও পাকিস্তানে উভয় সরকারের তরফে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

পরিবর্তন আংশিক হতে পারে, আবার সামগ্রিক বা ব্যাপক আয়তনের হতে পারে, যেমন বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া (Globalisation) ভারতবর্ষের মত বিকাশশীল সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। আবার যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতি-গোষ্ঠীর দাঙ্গা (Ethnic riots) পূর্ব-ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতিতে আংশিক পরিবর্তন এনেছে বলা যাবে।

সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ ও প্রকৃতি আলোচনায় বিভিন্ন ধরনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হতে পারে। যেমন, পরিবর্তনের গতি (Speed) সংক্রান্ত প্রসঙ্গ কিংবা পরিবর্তনের দিক্ নির্দেশ সংক্রান্ত প্রসঙ্গ। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য অভিমুখে পরিবর্তন হতে পারে; আবার পরিবর্তনের ধারা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের উৎস বা উপাদানের প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার কথা বলেন। কোন পরিবর্তন প্রক্রিয়া সমাজজীবনে বিরূপ বা ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হলে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রসঙ্গও উঠতে পারে। এক কথায় সামাজিক পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক ও নিয়মিত প্রক্রিয়া হ'লেও তা সব স্তরেই আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম এবং তার প্রভাব ও ফলাফল যে কোন অবস্থাতেই চমকপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা।

১৫.৩.২ মূলপাঠ (২য় অংশ) ঃ সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক বিকাশ

সামাজিক পরিবর্তন এর ধারণার সঙ্গে বিবর্তন প্রক্রিয়া ও বিকাশ-প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অনেকে পরিবর্তনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্যই বিবর্তন ও বিকাশ প্রক্রিয়ার ধারণাগুলো ব্যবহার করেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিবর্তন, বিকাশ, বিপ্লব ইত্যাদি কোন কথাটাই পৃথকভাবে সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করছে না। আবার এই কথাগুলো, এই ধারাগুলো, উপেক্ষা করে সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ ও তাৎপর্য ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না।

সামাজিক বিবর্তন (Social Evolution) এর ধারণাটি জৈবিক বিবর্তন (biological evolution) এর ধারণা থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর Principles of Sociology নামক গ্রন্থে 'সমাজ' এর সঙ্গে 'জীব'কেই এর এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জৈবিক উন্নতির কিছু সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে নৃতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড টাইলর (E.B. Tylor) তাঁর 'Primitive Culture' নামক গ্রন্থে 'বিবর্তন' ও 'বিকাশ'কে সমার্থক জ্ঞান করেছেন। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন বিবর্তন-এর ধারণাকে জৈবিক তত্ত্বের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন না করতে পারলে সমাজজীবন ব্যাখ্যায় তার বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বলা প্রয়োজন বংশগতি (heredity) সংক্রান্ত বিধিগুলো সামাজিক ব্যবস্থাগুলোর বিবর্তনের প্রসঙ্গে ব্যবহার না করাই সঙ্গত। ঐতিহাসিক প্রগতির সঙ্গে জৈবিক বিবর্তন-এর পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন। এটা বলা প্রয়োজন যে, মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা বংশগতি মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় না।

বিবর্তন বলতে যে ধরনের পরিবর্তনকে বোঝানো হয় তাতে ক্রমিক গতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কোন বস্তু, বিষয় বা ঘটনার স্বাভাবিক বা ক্রমিক গতিতে বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়াকেই বিবর্তন বলা যায়। এই স্বাভাবিক বিকাশ (natural unfolding)-এর ধারণার জন্যই বিবর্তন-এর আর এক নাম হ'ল ক্রমবিকাশ। সামাজিক বিবর্তন এর ধারণায় এই ধীর, ক্রমিক গতির বিষয়টা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ও ঐতিহাসিকতার গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়তা করবে।

যাঁরা সামাজিক বিবর্তন-এর ধারণায় জৈবিক তত্ত্বের প্রভাব অনিবার্য মনে করেন তাঁরা মানবসমাজের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় সামাজিক বিকাশ বা সামাজিক উন্নয়ন (Social Development) এর ধারণাটি প্রয়োগ করতে আগ্রহী। সমাজতাত্ত্বিক এল. টি. হবহাউস (L.T. Hobhouse) এই ধারণাটির অন্যতম প্রবক্তা। তিনি তাঁর Social Development নামক গ্রন্থে বিকাশ বা উন্নয়নের চারটি লক্ষণের কথাও নির্দেশ করেছেন। এগুলি হ'ল ঃ মাত্রা (Scale), দক্ষতা (efficiency), পারস্পরিকতা (mutuality) এবং স্বাধীনতা (freedom)। তবে অধ্যাপক টম বটমোর (Tom Bottomore) সঠিকই বলেছেন, সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণে সামাজিক বিকাশ (উন্নয়ন)-এর ধারণাটি কোনভাবেই সামাজিক বিবর্তন-এর ধারণার তুলনায় উৎকৃষ্ট বলা যাচ্ছে না। আমরা যে ভাবে একটি শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠনের বিকাশ বা উন্নতির কথা বলি, যেভাবে কোন রোগ-এর বিকাশ বা development-এর কথা বোঝান যায়, সে ভাবে নিশ্চয় সমাজের বিকাশ বা প্রক্রিয়া নির্দেশ করা যায় না। একমাত্র যে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে এরূপ উন্নয়ন বা বিকাশ প্রক্রিয়া নির্দেশ করা সম্ভব তা হ'ল মানুষের জ্ঞান-এর বিকাশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাহায্যে। তাই মানবসমাজের উন্নয়ন ও বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির প্রসঙ্গ টি বার বার বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকে।

১৫.৩.৩ মূলপাঠ (৩য় অংশ) ঃ সামাজিক প্রগতি

আধুনিক ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত ধারায় (Enlightenment) যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানবাদী প্রত্যয়ের পাশাপাশি অন্য যে প্রত্যয়টি জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তা হ'ল সমাজ ও সভ্যতার প্রগতি সংক্রান্ত প্রত্যয়। অতি সম্প্রতি অবশ্য উত্তর-আধুনিক (Post-medern) তত্ত্বের প্রবক্তাগণ আধুনিকতার বিভিন্ন প্রত্যয়ের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রগতির ধারণা (concept of progress) নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বস্তুতঃ প্রগতি বলতে ঠিক কি বোঝায়, সমাজে প্রগতি নির্ণায়ক কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, প্রগতি সম্ভব কিনা, এই সব নানা প্রশ্ন ধারণাটির সূত্রপাত থেকেই বহু বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে বোধ করি মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীরা ছাড়া আর কোন সমাজদার্শনিক বা সমাজতাত্ত্বিক গোষ্ঠী 'প্রগতির' ধারণার প্রতি নিজেদের কোনওভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ বলে মনে করেন না।

প্রগতির ধারণা হ'ল অগ্রগতির ধারণা। সমাজ ও সভ্যতা নানা দিক থেকে অনিবার্যভাবে উন্নতির পথে চলেছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, উৎপাদন সব দিক থেকেই সমাজের অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা প্রকট। এরূপই প্রগতির ধারণা। যাঁরা এই ধারণায় সন্দিহান তাঁরা প্রগতির মাপকাঠি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এঁদের প্রধান বক্তব্য হ'ল এই যে, উৎপাদন, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাণগত বিস্তার স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে। একে 'প্রগতি' বলার কোন অর্থ নেই। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, সামাজিক দায়-দায়িত্ববোধ ইত্যাদির উন্নতি/অগ্রগতি কিভাবে নির্দেশ করা যায় তা প্রগতির প্রবক্তাগণ জানাতে পারেন নি বলে অভিযোগ উঠেছে। যদি সহযোগিতা, বন্ধুত্ব যৌথ ক্রিয়াকলাপ, সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতা, মমতা ইত্যাদি আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো প্রগতির পরিচায়ক হয় তবে মানবসমাজের প্রগতি নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। কেননা, এই শতাব্দীতে যেভাবে পর পর দু'টি মহাযুদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে

এবং অসংখ্য মানুষের সহায়-সম্বল বিনষ্টের কারণ হয়েছে এবং পরবর্তীকালেও মানুষ যেভাবে আঞ্চলিক যুদ্ধে ও নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক ও জাতিগোষ্ঠীর দাঙ্গায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে তাতে সমাজপ্রগতি কতটা হ'ল তা নিয়ে সন্দেহ আসবেই।

প্রগতি ধারণার সঙ্গে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারণা যুক্ত থাকে। কোন আদর্শ, যেমন সাম্য বা সমাজবাদ অনুরূপ লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশিত হতে পারে। মার্কসবাদীরা ঐরূপ আদর্শ অনুসরণ করে চলেন বলেই তাদের দর্শনে, তাদের সমাজতত্ত্বে, প্রগতির ধারণা গুরুত্ব পাচ্ছে। অবশ্য বাস্তবে তাদের সমাজতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মোটেই আশাপ্রদ হয় নি। তাই তাদের তরফেও প্রগতির ধারণা সপক্ষে সওয়াল করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

সমাজতত্ত্বের সূত্রপাতে কিন্তু প্রগতির ধারণাটি খুবই গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ফরাসী জ্ঞানদীপ্ত আন্দোলনের প্রভাবে কোঁত্ (Comte) বা টকভিল (Toequeville) যেমন, তেমনি বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী স্পেনসার (Spencer) এবং আরও পরে হবহাউস (Hobhouse) প্রগতির ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। হবহাউস বির্তন ও প্রগতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, সামাজিক বিবর্তন হ'ল যে কোন প্রকার বিকাশ বা উন্নতি; সামাজিক প্রগতি হ'ল সমাজজীবনের সেই ধরনের উন্নতি যেখানে নিশ্চিতভাবে কোন উচ্চ মূল্যবোধ বা আদর্শ বিকশিত হয়ে বলা যাবে।

প্রগতির কোন বিধি নেই। বিজ্ঞানের নিয়ম বা বৈজ্ঞানিক বিধিগুলোর মত এটা বলা যাবে না যে, সমাজ নির্দিষ্ট কোন নিয়ম অনুযায়ী প্রগতি অভিমুখে পরিচালিত হচ্ছে বা হবে। পৃথিবীর মানুষেরা প্রগতির কোন নিরিখ নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছায়নি। কি প্রকারের পরিবর্তনকে প্রগতি বলা হবে তা নিয়ে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত নেই। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পরিবর্তনগুলো অবিমিশ্র আশীর্বাদ বর্ষণ করছে না কোনও পরিবর্তন প্রক্রিয়া (যেমন কোন স্বাধীনতা আন্দোলন বা বিপ্লব) সমাজের কল্যাণ সৃষ্টিতে যেরূপ সহায়তা করল, দেখা যাবে সঙ্গে কিছু অমঙ্গলজনক বা ক্ষতিকারক প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, কোন বিশেষ স্থান ও কালে যে অবস্থাটি প্রগতিশীল মনে হ'ল ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন এলাকায় তা প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হ'তে পারে। কার্ল মার্কস যেমন বুর্জোয়া পুঁজিপতি শ্রেণীকে একসময়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের হোতা বলে নির্দেশ করেছেন; সেই পুঁজিপতি শ্রেণীই আবার পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে রূপান্তরিত এবং তখন মার্কস নিজেই সেই শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনে বৈপ্লবিক তত্ত্ব নির্মাণে রত।

এতদ্‌সত্ত্বেও প্রগতির ধারণাটি সমাজতত্ত্বের সম্পূর্ণ তাৎপর্যবিহীন বিষয় বলে ঘোষিত হবে না। আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রসঙ্গগুলোর বিচার প্রধানতঃ বিষয়ীভূত (subjective) বলেই যত সমস্যা। তবুও বলা যায়, মানবসমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কোন অর্থই থাকবে না, সমাজজীবনে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার বা উন্নয়ন কর্মসূচীগুলোর কোন তাৎপর্যই থাকবে না যদি কোন না কোন ভাবে মানুষ সামাজিক অগ্রগতির তথা সামাজিক প্রগতির ধারণার প্রতি আস্থাশীল না থাকে।

১৫.৩.৪ মূলপাঠ (৪র্থ অংশ) ঃ পরিবর্তনের ব্যাখ্যাসমূহ

সমাজ হ'ল এক বিরামহীন বহমানতা (continuous process)। মানবসভ্যতা মানেই যা সবসময় বিকাশলাভ করেছে (a process of development) মানুষের বহুবিচিত্র কর্মধারার বিকাশ। এছাড়া মানুষের পরিচয় নিহিত রয়েছে তার নানাবিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। সংস্কৃতি হ'ল মানবিক চরিত্রের প্রকাশমানতা (Expresion)। সামাজিক সম্পর্কে বহুবিধ বিকাশ এবং সংস্কৃতি তথা ভাবগত ধারার নানা প্রকাশ— এই দু'য়ে মিলে সামাজিক পরিবর্তনের নিরন্তর প্রক্রিয়া। জানা প্রয়োজন, কি ধরনের উপাদানের সম্মিলনে, কিরূপ শক্তির সমাবেশে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

সমাজতাত্ত্বিকগণ সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত সুসংহত, পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব উপস্থাপনে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এ যাবৎ যে সব ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব আমাদের কাছে হাজির হয়েছে সেগুলি নিয়ন্ত্রণবাদী (determinestic) ব্যাখ্যা হিসেবেই সমালোচিত। যেমন, ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Geographical determinism)। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান-এর পরিবর্তন অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তন ঘটে। সমুদ্র নদী, পাহাড়, পর্বত, সমতলভূমি, অরণ্যাঞ্চল, মরুভূমি, বন্যার প্রকোপ, খরার প্রকোপ ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক উপাদানের উপর নির্ভর করে যা সেই সব উপাদানের প্রভাবে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। বলা বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত আদিম বা অনুন্নত মানুষের জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের ভূমিকা যাই থাক না কেন, অধুনা মানুষ যেভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সমর্থ হচ্ছে তাতে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যা আর গুরুত্ব পেতে পারে না।

আমেরিকার বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ভেবলেন (Thorsteir Veblen) আর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। একে বলা যায় কারিগরীবিদ্যাজাত বা প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণবাদ (Technological determinism)। ভেবলেন-এর মূল্য বক্তব্য হ'ল এই যে, মানুষের সমাজে নানাবিধ উৎপাদন ক্রিয়ায় নিয়োজিত কারিগরীবিদ্যা ও কলা-কৌশলের উন্নতি ও পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়ে থাকে। কারিগরীবিদ্যার বিকাশ ও উন্নতির ফলে যে পরিবর্তন সংগঠিত হয় তার মাধ্যম বা প্রণালী হিসেবে ভেবলেন মানুষের অভ্যাস ও কর্মপদ্ধতির কথা বলেছেন। ওই অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটি বজায় থাকে। উৎপাদন-সংক্রান্ত কলা-কৌশলগুলো মানুষের চিন্তা ও মনন প্রক্রিয়াকে এবং তার নানাবিধ মানসিক বৃত্তিগুলোকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। এরূপ আন্দোলনের ফলে ক্রমশই মানুষের অভ্যাস মানসিকতা ও কর্মপ্রক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে সেটাই সামগ্রিকভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

ভেবলেন মনে করতেন মানুষের চিন্তাকর্মে অভ্যস্তকরণ (habituation) প্রক্রিয়াটি সমাজজীবন বিকাশের প্রধান শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। অভ্যাস, চিন্তা কর্ম এসবই একসূত্রে বাঁধা তাই ভেবলেন বলেন, 'The way of habit is the way of thought'। অর্থাৎ চিন্তার ধারাটাই অভ্যাসের ধারা। মানুষ কি তা মানুষ যা করে তার মাধ্যমেই বুঝতে হবে। ভেবলেন আরও বলেন 'As the man acts, so he feels and thinks', অর্থাৎ মানুষ যেভাবে তার কর্ম সম্পাদন করে সেভাবে তার অনুভূতি ও চিন্তাধারা বিকাশলাভ করে।

অনেকে মনে করেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তারই পটভূমিতে ভেবলেন-এর তত্ত্বটি গড়ে ওঠে। ভেবলেন লক্ষ্য করেছিলেন, কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত কিছু মানুষ আধুনিকতার প্রক্রিয়াটিকে স্বাগত জানাতে পারেনি। উপরন্তু, গ্রামীণ ভূ-সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে যে একটি অবসরভোগী শ্রেণী (Leisure Class) বিদ্যমান ছিল তদের অনুকরণে নতুন শিল্প সমাজের মধ্যেও অনুরূপ অলস গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। ভেবলেন বলেন, সামাজিক পরিবর্তন যেমন কলা-কৌশল-প্রযুক্তি বিকাশের সঙ্গে যুক্ত একটি শক্তিশালী মানবগোষ্ঠীর কর্ম প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে তেমনি ঐ পরিবর্তনের পথে যে অবসরভোগী, অলস, মানুষগুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেটাও প্রকাশ পায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অধিক সংখ্যক মানুষের তরফে Habituation বা অভ্যাস প্রক্রিয়া ঐ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখে। সুতরাং, ভেবলেন-এর তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজবিকাশ ও সমাজ পরিবর্তনের মূল নির্দ্ধারণকারী শক্তি হ'ল নিত্যনতুন প্রযুক্তি-ভিত্তিক মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি যুগের চিন্তা ও ভাবপ্রকাশ সেই যুগের কলা-কৌশল ও কারিগরী বিদ্যার ধরন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বলা বাহুল্য, একই দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রযুক্তি প্রয়োগ-ভেদে দু'ধরনের সংস্কৃতি বা জীবনযাত্রা পরিদৃষ্ট হতে পারে। ভেবলেনের তত্ত্বে একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর ধারণা রয়েছে—অধিকাংশ মানুষের

অভ্যস্তকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবসরভোগী মানুষদের পুরানো অভ্যাস আঁকড়ে ধরার প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব। মার্কসীয় তত্ত্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে উপরি-কাঠামোগত চিন্তাদর্শের যে সংঘাতে কথা বলা হয় তার পরিবর্তে ভেবলেন কেবল নতুন প্রযুক্তি জীবন যাত্রার সঙ্গে পুরানো কায়েমী স্বার্থের জীবনযাত্রার সংঘাতের কথা বলেছেন। বুঝতে পারা যায়, ভেবলেনের চিন্তা মার্কসীয় তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এখন আমরা সংক্ষেপে সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্বটি উপস্থাপিত করব। নিঃসন্দেহে বলা যাবে, নিয়ন্ত্রণবাদী (deterministic) বলে সমালোচিত হ'লেও কার্ল মার্কস-এর তত্ত্বেই সামাজিক পরিবর্তন (বিশেষতঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন) সংক্রান্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ-ভিত্তিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে যে মার্কসীয় তত্ত্ব তার বক্তব্য অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করতে হবে প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট বস্তুগত পরিবেশ অনুধান করার মাধ্যমে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বা দ্বান্দ্বিকতা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের অন্তর্গত বিরোধী শক্তি বা অংশগুলোর নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত ও মিলনের প্রক্রিয়া (struggle and unity of opposite forces)। দ্বন্দ্বই গতি নির্দ্ধারণ করে। প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর মধ্য দিয়েই পরিবর্তন প্রক্রিয়া চালু থাকে।

মার্কস মানব ইতিহাসের বিবর্তন ও পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ঠিকমত অনুধাবন করার জন্য কয়েকটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আদি সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে মানবসমাজের বিকাশ ঘটেছে। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি পর্যায়ের বস্তুগত অবস্থা বিশ্লেষণ করলে যে সাধারণ সত্যটি খুঁজে পাওয়া যায় তা হ'ল এই যে মানুষ তার সামাজিক জীবনে যে প্রাথমিক উৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে সেই উৎপাদন প্রক্রিয়াজাত মৌলিক দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসেবে প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায় তার পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত হয়।

প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়কে এক একটি উৎপাদন-ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই ব্যবস্থার অন্তর্গত সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-এর প্রকাশ ঘটে তাই হ'ল সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ। উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত মৌলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে মার্কস শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত করেছেন। এই হিসেবে বলা যায়, সমাজের পরিবর্তন ঘটে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে। বাস্তবিক মার্কস ও মার্কসবাদীরা শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বা শ্রেণী-সংগ্রামকেই ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

সমাজের মৌল অর্থনৈতিক উৎপাদন-কাঠামোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান তারই বাহ্যিক প্রকাশ যে শ্রেণী দ্বন্দ্বতা সমাজ পরিবর্তনের মূল নির্দ্ধারক হিসেব ক্রিয়াশীল। এটাই মার্কসীয় তত্ত্বের সারকথা। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী আর্থনীতিক উৎপাদন ব্যবস্থাটি যেমন সমাজের মৌল কাঠামো হিসাবে পরিচিত, তেমনি সমাজস্থ রাজনৈতিক-আইনগত-সাংস্কৃতিক বা ধর্মগত ব্যবস্থাগুলো উপরি কাঠামো হিসেবে গণ্য। ইংরাজীতে মৌল কাঠামোকে base বা basic structure এবং উপরি-কাঠামোকে superstructure বলা হয়ে থাকে। এই base-superstructure বা মূল কাঠামোর সঙ্গে উপরিকাঠামোর অবিরাম দ্বন্দ্ব পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রধান মাত্রাকে নির্দেশ করবে।

মার্কসীয় তত্ত্বকে সমালোচকগণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ নামে অভিহিত করেছেন। কোন সন্দেহ নেই যে, মার্কস ও মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক উৎপাদন কর্মজাত দ্বন্দ্ব সংঘাতকেই পরিবর্তনের প্রধান সূত্র বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁরা উপরিকাঠামোর শক্তিগুলো অবহেলা করেন নি। রাজনৈতিক বা আদর্শগত শক্তিগুলো মূল কাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং সেই মত সমাজ পরিবর্তনে বড় ভূমিকা নিতে পারে। বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিপ্লবী আদর্শের ভূমিকা যেমন; সুতরাং অর্থনৈতিক উপাদানের সাথে সাথে অর্থনীতি বহির্ভূত অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর ভূমিকা মার্কসীয় তত্ত্বে গুরুত্ব পেয়েছে বলা যাবে।

১৫.৪ অনুশীলনী

প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন ঃ

(ক) সামাজিক পরিবর্তন-এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

(খ) 'বিবর্তন'-এর সংজ্ঞা দিন। সামাজিক বিবর্তন-এর সঙ্গে সামাজিক বিকাশ-এর সম্পর্ক নির্দেশ করুন।

(গ) 'প্রগতি' বলতে কি বোঝায়? সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সামাজিক বিবর্তন-এর সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(ঘ) সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত মার্কস ও ভেবলেন-এর তত্ত্বগুলো আলোচনা করুন।

১৫.৫ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

1. Tom Bottomore : Sociology, Blackie & Pon Ltd.
2. MacIver & Page : Society, MacMillan.
3. Kingsley Davis : Human Society, MacMillan.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064
and Printed at : SEVA MUDRAN, 43, Kailash Bose Street, Kolkata-700 006